দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে

হরপ্রসাদ মিত্র

বর্ণালী

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :

শিবরাত্রি, ১৩৬৭

২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬০

প্রকাশক :

কান্তিরঞ্জন ঘোষ

প্রচ্ছদ :

পঞ্চানন মালাকার

মুদ্রক :

শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী

ভগবতী প্রেস

১৪/১, ছিদাম মুদি লেন

কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

আমার মায়ের নামে

ধম্মপদের মধ্যে কল্যাণ ও কবিত্বের পরমান্বয় কে না দেখেছেন ? বিবেকানন্দেরও প্রিয় ছিল সেসব, পণ্ডিচেরির অরবিন্দের এবং শ্রীমা-রও।

উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণায়ণ' এর 'শক্তি-তত্ত্ব'সম্পর্কিত অধ্যায়ে ছাপা পরমহংসদেবের এই উক্তিটি মনে পড়ে : "যতক্ষণ 'আমি' জলে সূর্যকে দেখতে হয়, সূর্যকে দেখবার আর কোনরূপ উপায় নাই, আর যতক্ষণ প্রতিবিম্ব-সূর্য বই সত্যসূর্যকে দেখবার উপায় নাই, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্যই ষোলআনা সত্য !" ঐ বইয়ের জ্ঞান ও 'ভক্তি' অধ্যায়ের এই কথাগুলিও চির জাগরূক : "৪।৫ জনের জ্ঞান হয় না—যার বিদ্যার অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার। তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার। কুম্ভকর্ণের তমোগুণ। রাবণের রজোগুণ। বিভীষণের সত্ত্বগুণ, তাই তিনি রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন।" 'জীবাত্মা ও পরমাত্মা' অধ্যায়ে আছে : "এ মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না, আত্মা দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়। শুদ্ধ মন, শুদ্ধা বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা একই।" 'মুক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান'—অধ্যায়ে রামকৃষ্ণের এই উক্তিটিও পাই : "নিজের ছায়াকে ধরা বড় শক্ত, তবে সূর্য মাথার উপর এলে ছায়া আধ হাতের মধ্যে থাকে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মধ্যেও এরকম অজস্র কথা ছড়িয়ে আছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ থেকে আগে পরে রামমোহন থেকে অরবিন্দ ও তাঁর সময় পর্যন্ত মন নানা ব্যাপারে নানা অভিজ্ঞতার শরণার্থী হয়ে আছে। তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে আমি আমি করি। এই পরিস্থিতিতে স্নেহাস্পদ গুণী লেখক ও অধ্যাপক শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'বর্ণালী'-র শ্রীযুক্ত কান্তিরঞ্জন ঘোষের কাছে গিয়েছিলুম। অধ্যাপক পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মানিক মিত্র তার আগেই যথা-ক্রমে শ্রীঅরবিন্দ-পাঠমন্দিরে ও শ্রীঅরবিন্দ-ভবনে আমাকে শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে আলোচনার সুযোগ দেন। রিজেন্ট

পার্কের লক্ষ্মী-হাউসের শ্রীমতী জয়া মিত্রের আহ্বানে সেখানেও আর একটি আসর পাওয়া গেল। পণ্ডিচেরিতে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে তারও আগে। তাঁর আশীর্বাদও পেয়েছি। শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কিত এই গ্রন্থপর্যায়ের নামটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে নেওয়া। এই প্রথম খণ্ডটি গতানুগতিক অধ্যায়ক্রমে বা পৃথক পৃথক শিরোনামে সজ্জিত প্রবন্ধ-সংগ্রহ নয়। এটিকে অরবিন্দ-ভাবনার ভূমিকা বলাই ভালো।

কান্তিবাবু বড়ো আয়তনের বই ছাপতে আপত্তি তো জানানই নি; তাঁর আগ্রহের কথা ভোলবার নয়। চার খণ্ডে এই আলোচনা ছাপতে রাজী হয়েছেন তিনি। সেজন্যে কাকে ধন্যবাদ জানাবো? এও জগন্নাথের রথ! যাঁরা আমার শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা সম্পর্কিত বিভিন্ন ভাষণ শুনেছেন এবং রচনা পড়ছেন তাঁদের সকলকেই নমস্কার। কান্তিরঞ্জন ভাইটিকে এবং তাঁব অনুচর শ্রীকার্তিক বিশ্বাস-কে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

ভগবতী প্রেসের যাঁরা কর্মী, তাঁদের অনেক যত্ন সত্ত্বেও কয়েকটি ছাপার ভুল ঘটেছে: গুরুতর কয়েকটির কথাই এখানে দেখিয়ে দিতে চাই—পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রথম লাইনে তপোবলের পড়তে হবে, তপোবনের নয়; অষ্টম পৃষ্ঠার এগারোর লাইনের দ্বিতীয় শব্দ হবে—নিবন্ধের, চোদ্দর পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের তৃতীয় পংক্তিতে 'নরনারীর' বদলে নদনদীর পড়তে হবে। ১৪৫ পৃষ্ঠায় শেষ অনুচ্ছেদের আগেই স্থূলাক্ষর ২৯ সংখ্যাটি অধ্যায়-নির্দেশক হিশেবে বসিয়ে নিতে হবে। তাড়াতাড়িতে এটি ছাপা হয়নি।

দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃতভাবে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক ভাব-ভাবনা ও তাঁর রাজনীতি ত্যাগের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এখানে যা আছে, তার পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়।

হরপ্রসাদ মিত্র

১

জগন্নাথের রথ।

শ্রীঅরবিন্দের সেই বাংলা লেখাটির কথা মনে আসে। এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' বা 'কালের যাত্রা'। জগন্নাথের রথ চলছে। কোনো একজন মাত্র মানুষের হাতে সেই রথের দড়ি বাঁধা নেই। সবাই টানছে। তবেই চলে সে রথ। শ্রীঅরবিন্দের কথায়—"জগন্নাথের রথের প্রকৃত আকৃতি বা নমুনা কেহ জানে না"; "সেই ছবি বিশ্বপুরুষের হৃদয়ে প্রস্তুত, নানা আবরণে আবৃত।" ভাগবত জ্ঞানের ঐক্যমুখী শক্তির রূপক সেটি!

এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকা নয়। আমরা আকাশ, সমুদ্র, গিরিশীর্ষ দেখতে দেখতে স্থৈর্যকেই প্রণাম করি—সে স্থিরতা স্থবিরতা নয়। সমুদ্র চঞ্চল, চির-উচ্ছ্বসিত! আকাশ সেই আশ্চর্য পট যাতে মেঘের রঙেরা আসছে যাচ্ছে কেবলি।

পাহাড়ের রাস্তায় চড়াইয়ের বাঁ দিক ঘেঁষে এক জালের আড়াল মনে পড়ে। না, আড়াল নয়। ওপারে সবই দেখা যায়—দূরের পাহাড়গুলোও এবং ঢালু জায়গাটাও। আর রাস্তাটার ডাইনে কোনো জাল ছিল না। শুধু পথই। পথের পাশে এক চিলতে জমিতে ফুল ফুটেছিল—কার্নেশন, সুইটপী, ক্যালেণ্ডুলা,—রঙের রামধনু যেন। আরো ওপরে উঠে ডানদিকেও জাল—জাল নয়, রীতিমতো লোহার গরাদ সব। জালের মধ্য দিয়ে বাঘকে তার ঘরে জোরে জোরে পায়চারি করতে দেখা গিয়েছিল। বড়ো বড়ো কালো ডোরাগুলো দেখা গিয়েছিল তার সারা গায়ে। প্রকাণ্ড চেহারা। চাকার মতো মস্তো মুখে পাঁশুটে দুই চোখের তারা। জালের মধ্য দিয়ে সবটা দেখা যায় না। ঘরটা অন্ধকার। সেই খাঁচার দুর্গন্ধ সিঁড়ি পর্যন্ত নেমে এসেছিল।

অন্য এক জালের মধ্য দিয়ে ইয়াক-পরিবারটিও চোখে পড়েছিল। বড়ো মোষের মতো মুখ। বাঁকা সিং একজোড়া। বেঁটে ছোট-ছোট পাগুলো। ঘন রোমশ শরীরের নিচে পাগুলো কেমন যেন দুর্বল মনে হয়। ভুট্টার দানা ছিল

লোহার গামলাতে। একটা প্রকাণ্ড গাছের কাটা গুঁড়ির ওপর সেই গামলার মধ্যেই একটা পা দিয়ে অন্য তিনটি পা সেই গুঁড়িতেই রেখে, জালের ওপর লম্বা মুখ ঠেকিয়ে পাশের ঘেরা জায়গাতে তার সঙ্গীদের দেখছিল সে। বৃহৎ বলশালী বাঘও পারেনা খাঁচার গরাদগুলো চুরমার করে দিতে। তেমনি মানুষও। মানুষ বড়োই আবদ্ধ।

এই অভিজ্ঞতাটা দার্জিলিঙের। শ্রীঅরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' (১৯০৫)-এর প্রেরণা যেখানে, বঙ্কিমচন্দ্রের সেই 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) মনে আসে। এবং সেই সূত্রেই অরবিন্দের 'দি লাইফ ডিভাইন'-এর, বাংলায় যার নাম—'দিব্যজীবন', সেই বইয়ের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের সেই কথাটা—'দি হিউম্যান অ্যাসপিরেশন'! অন্তহীন অসামর্থ্যের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মানুষ খুঁজছে, কেবলি খুঁজছে। বুকের মধ্যে নিহিত সেই সন্ধান। নিজের দেহ-মনের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে খাঁটি সত্য আর অবিমিশ্র আনন্দে পৌঁছোতে চায় মানুষ। তার আদিম জান্তবতা পেরিয়ে, তার সাম্প্রতিকতম সভ্যতার সংগঠনী মেধাও পেরিয়ে,—আরো এক ভিন্ন মানসিকতায় এগিয়ে যেতে চায়—প্রজ্ঞার আকাঙ্ক্ষাও তাই-ই—ঈশ্বর, আলো, স্বাধীনতা, অমরত্ব!

শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য ও সাধনা সেই দিব্যতা লাভেরই ইঙ্গিত। মানুষের বিষাদযোগ নয়,—পূর্ণযোগের পথ দেখিয়ে গেছেন তিনি। 'দিব্য জীবনের সন্ধানে' [ফাল্গুন, ১৩৬৪] নামে বইটির ৪৯ পৃষ্ঠায় পশুপতি ভট্টাচার্য তাঁর সেই বিশেষ যোগ-এর কথাপ্রসঙ্গে লেখেন—"শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে জীবনকে সমগ্র-ভাবে নিয়েই যোগ হওয়া চাই, এর সমস্তটাই যোগের ক্ষেত্র।" —"যেখানে তিনি নিশ্চল নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্ম সেখানেও তাঁর সঙ্গে মিলতে হবে, আবার যেখানে তিনি রূপে রূপে রূপায়িত, যেখানে তিনি লীলাময়, যেখানে তিনি বিশ্বমাতা বিশ্বধাত্রী, সেখানেও তাঁর সঙ্গে মিলতে হবে।" পূর্ণযোগে সাধক তাঁর দেহ-প্রাণ-মনের স্তর ছুঁয়েই ব্রহ্মের দিকে ঊর্ধ্বগামী এবং ব্রহ্ম এই পার্থিব সত্তার তৎসাধনার প্রতি সংশয়াতীত ভাবে অনুকূল।

ভারতের আত্মপ্রতিষ্ঠার অনিবার্য নিয়তির সঙ্গে সারা জীবনের যোগ ছিল শ্রীঅরবিন্দের। তাঁর জন্মের (১৫ই অগস্ট, ১৮৭২) ঠিক পঁচাত্তর বছর পরে (১৫ই অগস্ট, ১৯৪৭) ভারত স্বাধীনতা পায়। তবু শ্রীযুক্ত কে. আর. শ্রীনিবাস-

আয়েঙ্গার তাঁর ইংরেজিতে লেখা দুই খণ্ডের শ্রীঅরবিন্দ-জীবনীর প্রথম খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে ২৯৫ পৃষ্ঠায় ঠিকই লিখেছেন যে, সংকীর্ণ অর্থে, কলকাতার জাতীয় কলেজের (যাদবপুর) অধ্যক্ষ-পদে ১৯০৬-এর অগস্টে তিনি যখন যোগ দেন, তখন থেকে ১৯১০-এর ফেব্রুয়ারিতে তিনি যখন ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগরে চলে গেলেন—ইতিমধ্যে সেই পর্বেই ১৯০৮-এর মে মাস থেকে ১৯০৯-এর মে, এই পুরো একটি বছর মানিকতলা বোমার মামলায় বিচারাধীন কয়েদী হিসাবে তাঁকে আলিপুর জেলে কাটাতে হয়,—বড়ো জোর সেই তিরিশ মাসের সক্রিয় প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবন ছিল তাঁর। তিনি যখন বিলেতে ছিলেন কেমব্রিজে, দেশ থেকে তখন তাঁর পিতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ তাঁর কাছে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা পাঠাতেন নিয়মিত। দেশের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল অব্যাহত। খাঁচায় বন্দী বাঘের মতোই মুক্তির পথ খুঁজেছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা'-র 'কবি' বলেছিলেন—রথ চলে "গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে। আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে।" শ্রীঅরবিন্দ বারবার সেই সামঞ্জস্য বা 'হার্মনি'-র কথা বলেছেন।

•

'ধর্ম ও জাতীয়তা' [প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র, ১৩২৭] বইয়ের প্রথম নিবন্ধ —'আমাদের ধর্ম'তে তিনি লেখেন—"আমাদের ধর্ম সনাতন ধর্ম। এই ধর্ম ত্রিবিধ, ত্রিমার্গগামী, ত্রিকর্মরত।" —"ভগবান অন্তরাত্মায়, মানসিক জগতে, স্থূল জগতে—এই ত্রিধামে প্রকৃতিসৃষ্ট মহাশক্তিচালিত বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন!" জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম—এই তিনের যে-কোনো পথে অথবা মিলিত এই ত্রিপথে,—সত্য, প্রেম ও শক্তি এই তিন বলে ভারতের মানুষকে নিজস্ব আর্যজাতিধর্ম ও কুলধর্ম অর্জন করতে হবে। বন্ধনের যন্ত্রণা জীবজন্তু মাত্রেই পেয়ে থাকে। মানুষকেও মানুষের মতন করেই তা পেতে হয়। 'মানব সমাজের তিন ক্রম' নামে ছোটো একটি নিবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ মানুষের জ্ঞান ও শক্তির তিনটি ক্রম দেখিয়েছিলেন এইভাবে—"শরীর-প্রধান প্রাণনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃত অবস্থা, বুদ্ধি-প্রধান উন্নত মধ্য অবস্থা—এবং পরিশেষে আত্মপ্রধান শ্রেষ্ঠ পরিণতি।"

শ্রীঅরবিন্দকে গভীরভাবে জানবার সৌভাগ্য তাঁর কাছাকাছি ছিলেন যাঁরা, তাঁদেরই মধ্যে সীমিত থাকা স্বাভাবিক। তাঁর তিরোধানের পরে এখন প্রধানত তাঁর নিজের রচনা এবং তাঁর বিষয়ে লেখা অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ থেকেই পেতে হবে। তাঁর একজন কাছের-মানুষ ছিলেন চারুচন্দ্র দত্ত আই. সি. এস্। চারুচন্দ্রের মৃত্যুর পরে (১৯৫২), ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে তাঁর 'পুরানো কথা, উপসংহার' বেরোয়। ১৯৪৯-এ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় তিনি এক ইংরেজি নিবন্ধে শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবী-জীবনের কথা লেখেন। 'নর্মদা তীরে তীর্থযাত্রা' ও পূর্বোক্ত লেখা—দুটিই শ্রীঅরবিন্দকে শোনানো হয়। চারুবাবুর জন্মের বিশ বছর আগে সিপাহী যুদ্ধ (১৮৫৭) ঘটে গেছে। তার অনেকদিন পরে—"ওহাবীরা বড়লাট মেয়োকে ও বড় জজ নর্মানকে খুন করে নিজেদের সম্প্রদায়ের বেশ সুবিধা করে নিয়েছিল" [ঐ বই, পৃষ্ঠা ২]। তিনি লিখেছেন—"এই ঝোঁক আবার খুব জোর পেল ১৮৯০-৯১ সালে, যখন মণিপুরে যুদ্ধ বাধল।" পাঁচজন ইংরেজ হাকিমকে কেটে ফেলে, মণিপুরের কুমার টিকেন্দ্রজিৎ রাজ্যের প্রধান সেনাপতি টঙ্গাল-এর সহায়তায় যুদ্ধ ঘোষণা করেন, কিন্তু পরাস্ত হয়ে দুজনেই ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন। চারুচন্দ্র—এবং তাঁর গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই এসব জানতেন।

শ্রীঅরবিন্দের সারা জীবনের স্বপ্ন ও সাধনার প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ হরিদাস চৌধুরীর "শ্রীঅরবিন্দের সাধনা' [প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৪৮; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৯] বইটির বেশ কয়েকটি অধ্যায় পড়ে দেখলে সুবিধা হয়—যেমন, তৃতীয় নিবন্ধে ['স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন'], —চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'পূর্ণযোগের তাৎপর্য,' 'পূর্ণযোগের দার্শনিক ভিত্তি' ও 'পূর্ণযোগের সাধন-প্রণালী'-তে, —অষ্টম অধ্যায়ে 'মানস, অধিমানস ও অতিমানস'—এই বিষয়গুলি। প্রথম নিবন্ধের নাম 'দেশসেবা ও যোগ'। এই লেখাটিতে ডঃ চৌধুরী শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন থেকে তথাকথিত বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে লেখেন—"শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন যে মানবজাতির ঐক্যসাধন রাজনৈতিক সংগ্রাম ও চুক্তি দ্বারা অথবা দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিয়া অসম্ভব। বিশ্ব-মানবের ভ্রাতৃত্ব লাভের পথ দেখাইতে পারে শুধু ভারত তাহার যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত

তপোবনের দ্বারা।" অর্থাৎ মানুষের বর্তমান চেতনার কেন্দ্র অতিক্রম করে অতিমানস বা বিজ্ঞানলোকে অধিষ্ঠিত হতে হবে। যোগ সাধনার দ্বারাই তা সম্ভব।

তাঁর যোগ ব্যক্তিগত মোক্ষের পথ নয়। আমাদের যোগশাস্ত্রের শাস্ত্রকার ও সাধক পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তির সম্যক নিরোধকেই যোগের লক্ষ্য ও লক্ষণ বলে গেছেন। আসক্তি ইত্যাদিই চিত্তবৃত্তি এবং এগুলি হোলো প্রকৃতির বিকার। এই বিকার থেকে আত্মরক্ষার উপায়ই যোগ। সাংখ্য শাস্ত্রের মতে 'পুরুষ' হলেন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বরূপে অবস্থান। সাংখ্য এই অবস্থাকেই মোক্ষ বা কৈবল্য বলেন। কর্ম নয়, সৃষ্টি নয়, জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ নয়,—এই মোক্ষ অবিচল প্রশান্তি মাত্র। শঙ্করাচার্যের মায়াবাদও কতকটা প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই রকম আত্মরক্ষার নির্দেশবাহী। ডঃ চৌধুরীর কথায়—"সাংখ্য ও মায়াবাদের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে তাহারা প্রায় একমত—সমস্ত দ্বন্দ্ব ও কর্ম, জীবন ও সৃষ্টি অতিক্রম করিয়া এক ভূমা চৈতন্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, সাংখ্যের অক্ষর পুরুষ এবং মায়াবাদীর নির্গুণ ব্রহ্মেরও পিছনে এক বিরাট সত্তা আছে, গীতা যাহাকে বলিয়াছেন পুরুষোত্তম। এই পরাৎপর পুরুষোত্তম নির্গুণ হইয়াও গুণী, এক হইয়াও বহু, আবার নির্গুণ ও গুণী, এক ও বহু, এ সমস্ত অবস্থাই অতিক্রম করিয়া অনির্বচনীয়, অবাঙ্‌মনসোগোচর। আর শঙ্করপন্থী যাহাকে সদসদ্-বিলক্ষণা মায়া বলিয়াছেন শ্রীঅরবিন্দের মতে, তাহা সৃষ্টির আদি কারণ নহে, সৃষ্টিপ্রবাহের চরম উৎস হইতেছে পুরুষোত্তমেরই সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি। এই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিই নামিয়া আসেন ত্রিগুণাত্মিকা জড় প্রকৃতির মধ্যে।"

তাঁর যোগ এই ভাগবতী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ। তাকে 'পূর্ণযোগ' বলা হয় কেন? 'পূর্ণযোগ' মানে হঠযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, তান্ত্রিক যোগ ইত্যাদি প্রাচীন প্রত্যেক যোগের মূলীভূত সত্যের সমন্বয়। তাঁর ইংরেজি বই 'দি সিন্থিসিস অফ যোগ'-এর বাংলা নাম হওয়া উচিত যোগসমন্বয়। এতে সর্বকর্ম পরিহারের বদলে দেহ-মন-প্রাণের সার্বিক আধ্যাত্মিক উজ্জীবনই লক্ষ্য।

১৩৫৬ বঙ্গাব্দের 'গল্পভারতী' পত্রিকায় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'অরবিন্দ' নামে ধারাবাহিক নিবন্ধটি ছাপা হয়। তার টুক্‌রো টুক্‌রো স্মৃতি ভেসে উঠছে। অরবিন্দ প্রভৃতির গ্রেপ্তারের পরেই 'যুগান্তর'-এর যে-সংখ্যা প্রকাশিত হয় তাতে

পূর্বযুগের কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভঙ্গিতে লেখা এই কয়েকছত্র পদ্য দেখা দেয়—

না হইতে মাতঃ বোধন তোমার
ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গল ঘট !
জাগ রণচণ্ডি, জাগ মা আমার—
আবার পূজিব চরণ-তট।

বোমার মামলার অন্যতম আসামী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী রাজসাক্ষী হয়। ইতিমধ্যে রাজদ্রোহের অভিযোগে বোম্বাইয়ে বালগঙ্গাধর তিলক গ্রেপ্তার হয়েছেন। ১১ই অগস্ট ১৯০৮ মানিকতলার পূর্বোক্ত মামলার আসামী কানাইলাল দত্ত আর সত্যেন্দ্রনাথ বসু জেলের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথকে গুলি করে মারেন। কানাইলাল আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনে আপত্তি জানান। তাঁর মৃতদেহের ওপর পুরাঙ্গনারা পুষ্পবর্ষণ করেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদের ভাষায়—তাঁরা বলেছিলেন—"যদি অক্ষয় স্বর্গ থাকে, তবে তাহাই কানাই পাইয়াছে।" —এবং সেকালে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—যাঁর ছদ্মনাম 'পঞ্চানন্দ', তিনি সন্ত্রাসবাদীদের কর্মকেন্দ্রকে বৃন্দাবনের সঙ্গে ও কানাইলালকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করে লেখেন—

দ্বাপরে কানাই ছিল নন্দের নন্দন
কলিতে তাঁতীর কুলে দিল দরশন।
তাহারে ছলিয়াছিল অক্রুর গোঁসাই—
গোঁসাইকে কানাই দিল বৃন্দাবনে ঠাঁই।
গোঁসাই হ'ল গুলীখোর কানাই নিল ফাঁসী—
কোন্ চোখে বা কাঁদি, বল কোন্ চোখে বা হাসি॥

"দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে"—এই কথাটি রবীন্দ্রনাথের। শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে ১৩১৪ সালে শান্তিনিকেতনে 'নমস্কার' নামে তিনি যে কবিতাটি লেখেন, তাতেই ওই ছত্রটি ছিল। সে অংশটি হোলো—

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন শৃঙ্খল তার

চরণবন্দনা করি করে নমস্কার—

কারাগার করে অভ্যর্থনা।

'ধর্ম' পত্রিকার ২৬এ পৌষ, ১৩১৬ সংখ্যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবিষ্যৎ ভারত' সম্পর্কিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে অরবিন্দ নিজে লেখেন যে, ভবিষ্যৎ ভারত সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব—"যাহা তিনি মুখে বলেন নাই, তাহা তিনি কার্যে করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ।" বিবেকানন্দের স্বদেশপূজা তাঁর গুরুর দান—এই ছিল অরবিন্দের বিশ্বাস।

কৃষ্ণকুমার মিত্রও একজন প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক মানুষ ছিলেন। নির্বাসিত অবস্থায় আগ্রা জেলে তিনি ভগবানের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি লাভ করেন। উত্তরপাড়া ভষেণে অরবিন্দও তাঁর নিজের জীবনের অনুরূপ উপলব্ধির কথা বলেন। ব্রাহ্মসমাজের কৃষ্ণকুমার এবং বিশেষ সম্প্রদায়ের বাইরে রাজনৈতিক বিপ্লবী নেতা অরবিন্দ উভয়েই একরকম অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মানুষ ছিলেন। এই সূত্রে সেই 'ধর্ম' পত্রিকারই আর-এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে যীশু খ্রীষ্টের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা হয় যে, দীনদরিদ্র নিপীড়িত জীবের জন্যে যিনি জীবন উৎসর্গ করেন, তিনিই ভগবানকে পান।

মানুষে, নিম্নতর জীবে, উদ্ভিদে, জড়ে—সর্বত্রই ঈশ্বরের বিভা। কিন্তু ঐহিক ভোগসুখকামনাই মানুষকে অন্ধ করে রাখে। আমাদের গতিপথে অনেক বাধাবিঘ্ন আছে, বাধা থাকাটাই স্বাভাবিক। অরবিন্দ তাঁর 'পত্রাবলী'র মধ্যে লিখে গেছেন—"ঊর্ধ্বের অনুভূতি চাই, নিম্নপ্রকৃতির রূপান্তর চাই। হর্ষ বিষাদ হতাশা নিরানন্দ সাধারণ প্রাণের খেলা, উন্নতির অন্তরায়"—এসব অতিক্রম করে ঊর্ধ্বের বিশাল ঐক্য ও সমতা প্রাণে ও সর্বত্র নামাতে হয়।

তিনি মায়ের ওপর নির্ভর করতে বলে গেছেন। কে এই মা? মা-ই বিশ্বজননী—তিনিই মহাকালী,—তিনিই মহালক্ষ্মী। আমাদের শাস্ত, সংশয়রহিত সমর্পণই যথার্থ বীরত্ব। রামকৃষ্ণ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে অরবিন্দ পর্যন্ত সেই একই দিব্যপথ এগিয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিদৃষ্টির গুণে নিজেও সেই দেবতার দীপ অনুভব করে গেছেন। সেই বীরত্বের সাধনাই যথার্থ দিব্য তপস্যা।

এই তপস্যা-ই শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের মর্মার্থ। শুধু জ্ঞানের পথ, শুধু কর্মের পথ, শুধু ভক্তির পথ—এইভাবে আলাদা-আলাদা পথের খণ্ডতা নয়; পরিহার ও শুষ্কতা নয়; পূর্ণতা মানে সর্বৈব চৈতন্যবিভা। ব্যক্তিমনে—বড়ো

জোর পারিবারিক মনেই অধিকংশ লোক আবদ্ধ। যাঁরা সত্যিই আরো কিছুদূর এগিয়ে যেতে পারেন, তাঁরা সমাজের দিকটা খুবই বড়ো করে দেখাতে চান। কিন্তু 'মানুষ' আর 'সমাজ' দুটি পৃথক শব্দের অর্থসম্পর্কটা কী?

'সমাজের কথা' নামে এক নিবন্ধে অরবিন্দ লেখেন—"মানুষের জন্ম সমাজের জন্য নয়, সমাজ মানুষের জন্য সৃষ্ট। যাঁহারা মানুষের অন্তঃস্থ ভগবানকে ভুলিয়া সমাজকে বড় করিয়া তোলেন, তাঁহারা অপদেবতার পূজা করেন।" এই প্রবন্ধেই ঠিক এর পরের অনুচ্ছেদে তিনি প্রথম বাক্যেই লেখেন—"মানুষ সমাজের নয়, মানুষ ভগবানের!" এইভাবে আমাদের সকল কর্মের আকাঙ্ক্ষায় ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই অনিবার্য গতি পূর্ণযোগের দিকে প্রধাবিত। দিব্যদৃষ্টি না জাগলে এই সত্য কি মানুষের বোধে দেখা দিতে পারে? 'গীতার ভূমিকা' নামে নিবন্ধেয শেষাংশ অরবিন্দ লেখেন—"অর্জুন দিব্যচক্ষু প্রভাবে জাগ্রদবস্থায় ভগবানের কারণান্তর্গত বিশ্বরূপ দেখিয়া সন্দেহমুক্ত হইলেন।" ঈশোপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে তিনিই আবার শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ ও নিবৃত্তিমার্গ সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে পুরুষ ও প্রকৃতির অচ্ছেদ্য পারস্পরিকতার দিকটি দেখিয়ে দেন। তাঁর নিজের কথায়—"এই পুরুষ শুধু সাক্ষী ও অনুমন্তা নয়, জ্ঞাতা ঈশ্বর, কর্মের নিয়ন্তা; প্রকৃতি কর্মের নিয়ন্ত্রী নহে, নিয়তি মাত্র, কর্ত্রী বটে কিন্তু কর্তার অধীনে, পুরুষের আজ্ঞাধীন হইয়া তাঁহার কার্যকারিণী শক্তি।" অর্থাৎ, বিরোধ নয়,—এঁদের সকর্মক, সক্রিয় ঐক্যই ঈশোপনিষদের ইঙ্গিত।

অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দ মহামায়ার সন্তান ছিলেন। তিনি মায়াবাদী বেদান্তী নন। তাঁর দিব্যতা বিশ্লেষণের বিষয় নয়; সাধকের অন্তর্দৃষ্টি না জাগলে সেটিও হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

শ্রীঅরবিন্দের অভ্যুদয় ও জীবনকথা সম্বন্ধে লিখতে গেলে কঠিন সংকট অনুভব করতেই হয়, তিনি তো স্বয়ম্ভু নন। সুদীর্ঘ ইতিহাস তাঁর পিছনে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ,—বৌদ্ধ, জৈন, শাক্ত, বৈষ্ণব, খ্রীষ্টীয়, মরমীয়া—প্রভৃতি নানা সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত তিনি। তাঁর যখন চোদ্দ বছর বয়স, ঠাকুর রামকৃষ্ণ তখন দেহরক্ষা করেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সমকালীন, কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ। নিবেদিতা তাঁর কর্মসঙ্গিনী ছিলেন বেশ কিছুদিন।

'ধম্মপদের' একটি শ্লোকে আছে—দণ্ড বা শাস্তি সকলেরই ত্রাসের কারণ,

জীবজীবন সকলেরই প্রিয়। দুনিয়ায় সকলকেই নিজের মতন ভেবে কারও প্রাণহানির হেতু হোয়ো না। আর একটি শ্লোকে আছে—রাখাল যেমন লাঠি হাতে গোরুদের চরাতে নিয়ে যায়,—পাঁচনবাড়ির ভয়ে যেমন গোরুর পাল গোচারণভূমির দিকে এগোয়, জরা ও মৃত্যুও তেমনি জীবের আয়ুর চালক,—অর্থাৎ জরা-মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায় কে? দেহ স্থবির হবার আগেই পূর্ণক্ষম অবস্থায় অনেকেরই প্রাণান্ত হয় বটে। অনেক শারীরিক অনাচার সত্ত্বেও একালের ভেজালের যুগেও ভাল ভাল ওষুধ বেরিয়েছে অনেক—যার ফলে মানুষের আয়ুবৃদ্ধি ঘটেছে বই কি। কিন্তু নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ ইত্যাদি যন্ত্রণার অন্ত নেই। শঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত 'ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা'র প্রথম শ্লোকেই দেখা যায়—যে-ব্রহ্ম-নাম একবার মাত্র শুনলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়,—সকলের মুক্তির জন্যে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলা হোলো। তারপর—

অসঙ্গোঽহমসঙ্গোঽহমসঙ্গোঽহং পুনঃ পুনঃ।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽহমহবেবাহমব্যয়ঃ॥

অর্থাৎ—আমি অসঙ্গ বা সঙ্গহীন,—আমি অসঙ্গ,—সর্বদা এবং বারবারই আমি অসঙ্গ,—অবিনাশী সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমি। সেই 'আমি' কি এই আমরাই? শঙ্করাচার্যের কথাটা ধম্মপদের পূর্বোক্ত দুটি শ্লোকের চেয়ে কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হয়! তিনি বলে গেছেন—আমি বিশুদ্ধ চৈতন্য, আমি আত্মাতেই সুখী,—তাই আমি 'আত্মারাম'। বস্তুর বিলয় আছে, কিন্তু আত্মা অব্যয়! নামে নয়, রূপে নয়, আমিই প্রকাশস্বরূপ! আধ্যাত্মিক, অধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপের যন্ত্রণা নেই আমার,—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণশরীর, কোনটিরই বন্ধনে আবদ্ধ নই আমি,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থারই সাক্ষী আমি। ঘটেও যেমন মাটিই উপাদান, বাড়ির ভিত্তিতেও যেমন সেই মাটিই বিদ্যমান,—'তদ্বদ্ ব্রহ্ম জগৎ সর্বমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ'—তেমনি নিখিলবিশ্বই ব্রহ্মময়, বেদান্তের এই ঘোষণা শোনো।

সেই ডিণ্ডিমধ্বনি ভারতের চিদাকাশে রণিত হচ্ছে। শ্রীঅরবিন্দের আগে স্বামী বিবেকানন্দ এসেছেন—তারও আগে ঠাকুর-রামকৃষ্ণ। রামমোহনও পথ খুঁজতে খুঁজতে নিজের ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের নানা স্তরের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত পেরোতে পেরোতে রংপুর থেকে কলকাতায় এসে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দেই বাংলায় বেদান্ত বিষয়ে বই লিখে প্রকাশ করেন। এঁরা প্রত্যেকে একই মনোভাবের ব্যক্তি নন। বেদান্তের বহুতা ভাবধারার মধ্যে হয় মননের প্রবাহে

নাহয় রসের মগ্নতায় বা কর্মের তাড়নায় এঁরা সার্থকতার স্বাদ রেখে গেছেন। আঠারোর শতকে শাক্ত-বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সত্ত্বেও পথ সন্ধান চলেইছে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যদেব আসেন। অদ্বৈতআচার্য ছিলেন তাঁর গুরু। বৈদিক ব্রহ্মভাবনা আর বৈষ্ণবী ভক্তিধারা এক ভাবসমুদ্রে এসে মিশেছিল। শ্রীঅরবিন্দের কথা একদিকে যেমন এই সব ভাবনার সঙ্গে জড়িত, অন্যদিকে তেমনি বিদ্যাসাগরের মানবসেবা, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র, ঠাকুর-রামকৃষ্ণের শিষ্য বিবেকানন্দের জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিতে আত্মোৎসর্গ, ভগিনী নিবেদিতার সর্বস্ব-নিবেদনের প্রেরণা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত। সন্ত্রাসবাদী, বিপ্লবী, জাতীয়তাবাদী, বিশ্বমানবতাবাদী যোগসাধক তিনি।

সাহিত্য-আকাদামীর তদানীন্তন সহ-সভাপতি ডঃ শ্রীনিবাস-আয়েঙ্গার শ্রীঅরবিন্দের একখানি চমৎকার জীবনী লেখেন। সে বই প্রথম প্রকাশিত হয় ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। ১৯৪২-এর শেষদিকে সে বই লেখা শুরু হয়। ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারিতে তার দ্বিতীয় সংস্করণ ও ১৯৭২-এর মার্চে তার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হয়। দুই খণ্ডে প্রকাশিত এই তৃতীয় সংস্করণের মুখবন্ধেই তিনি লেখেন যে, ১৯৪২-এ কাজ শুরু করেই তিনি অনুভব করেন যে শ্রীঅরবিন্দের জীবনী লেখা কঠিন কাজ। যিনি তা লিখবেন তাঁকে নিজেকেও কবিত্বের এবং ভবিষ্যৎদর্শিতার কতকটা অধিকারী হতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ নিজে ১৯৪৩-এ শ্রীনিবাস-আয়েঙ্গারের পাণ্ডুলিপি দেখে দেন। শ্রীঅরবিন্দ নিজে বলে গেছেন যে, তাঁর জীবনী বাইরে থেকে দেখবার নয়। তাঁর নিজের গভীরে তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কে-ই বা নামতে পারেন?

শ্রীআম্বালাল বি. পুরানি এই ক্ষেত্রে এক প্রসিদ্ধ নাম। তাঁর নিজস্ব গবেষণার মূল্য অপরিসীম! নীরদবরণ আর-একটি অবিস্মরণীয় নাম। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁদের এবং ভেলুরি চিদাম্বরমের আলাপ আলোচনাও স্মরণযোগ্য। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, কে. ডি. শেঠনা, কিশোর গান্ধী প্রভৃতি সুপরিচিত প্রাজ্ঞজনের রচনা থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। ইংরেজিতে লেখা শ্রীযুক্ত পুরানির শ্রীঅরবিন্দ-জীবনীরও অনেকগুলি সংস্করণ হয়েছে। যাঁরাই শ্রীঅরবিন্দের জীবনকথা লেখবার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই ভাবতে হয়েছে অনেক। দেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিচিত্র ঘটনার সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে জড়িত। এখানে 'দেশের' কথাটির ইঙ্গিত শুধু বাংলার বা ভারতের নয়,—বিশ্বমানবতায় বহতা অস্তিত্বধারার সমকালীন ভাবনেতা ছিলেন

তিনি। তিনি নিজেই বলে গেছেন যে, বহির্জগতের ঘটনা-ধারার মধ্য দিয়েই যাঁরা তাঁর জীবন-কাহিনী ধরবার চেষ্টা করবেন, তাঁরা তাঁকে ঠিক ঠিক বুঝবেন কি? তাই আবার বলা দরকার, তিনি নিজে জানিয়ে গেছেন—আমার জীবন তো দৃশ্যমান ঘটনাবৈচিত্র্যে লক্ষণীয় নয়। তিনি ছিলেন অন্তর্জগৎবিহারী! এই শব্দটি রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা থেকে নেওয়া গেল। বড়ো বড়ো ভাবসাধককে তাঁদের নিজেদের উক্তি ও স্তব্ধতার মধ্য দিয়েই দেখতে হয়। যেমন ঠাকুর-রামকৃষ্ণ, যেমন মহর্ষি রমণ।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনকথা দুটি নির্দিষ্ট অংশে আলোচনা করা যায়—১৮৭২ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ,—এবং ১৯১০ থেকে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ। ১৯১০-এ তিনি চিরকালের মতন পণ্ডিচেরিতে চলে যান। জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি সেখানেই ছিলেন। ১৯০৭-এ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'ভারতাত্মার বাণী' নামে অভিহিত করেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে, প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তার বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার সামনে দেখেছিলুম, সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।" আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়, আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—"অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"। তিনি বলেন—বেদের ভাষায় যিনি জগৎস্রষ্টা ও ঋষি তিনি কবি,—এ বিশ্ব তাঁরই কাব্য 'পশ্য দেবস্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি'। এ বিশ্ব পরম দেবতারই এক কাব্য যা কখনো জীর্ণ হয়না, যা কখনো মরেনি।

অরবিন্দের পিতা কোন্নগরের ঘোষ-পরিবারের কৃষ্ণধনঘোষ (১৮৪৫-৯৩),—জননী স্বর্ণলতা—তিনি ছিলেন ভারতের জাতীয়তাবোধের নেতা রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-৯৯) বড়ো মেয়ে। অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) এই জনক-জননীর সন্তান। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অগস্ট কলকাতায় তাঁর জন্ম হয়। স্কটল্যাণ্ডের অ্যাবারডীন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ডি. ডিগ্রী পান কৃষ্ণধন। তাঁর ঝোঁক ছিল সাহেবী ব্যক্তিত্বের দিকে। বিনয়ভূষণ, মনোমোহন আর অরবিন্দ তিন ছেলেকেই তিনি ১৮৭৯তে ইংলণ্ডে নিয়ে যান—দেশী আবহাওয়ার বাইরে তাদের লেখাপড়ার সুব্যবস্থার অভিপ্রায়ে। পুরোপুরি ইউরোপীয় রীতিতে ছেলেরা শিক্ষিত হয়ে উঠুক, এই ছিল তাঁর বাসনা। তখন অরবিন্দের বয়স

মাত্র সাত বছর। তার আগে দার্জিলিঙে আইরিশ যাজিকাদের ইস্কুলে পড়েছেন। চতুর্থ পুত্র বারীন্দ্রকুমারের (১৮৮০-১৯৫৯) জন্ম হয় লণ্ডনের নরউড অঞ্চলে।

লণ্ডনে প্রথমে এক ইংরেজ পরিবারে বাস করেন অরবিন্দ। তারপর সেণ্টপলস স্কুলে যখন ভর্তি হন, আর আগেই লাটিন শিখেছেন। অল্প বয়সেই শেক্‌স্‌পীয়র প্রভৃতির লেখা পড়ে আনন্দ পেতেন। ফরাসী, জার্মান, স্পেনীয়, ইতালীয় ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে এই সব ভাষায় বড়ো বড়ো লেখকের মূল রচনাও পড়েছেন কিছুকিছু। মাত্র এগারো বছর বয়সে গ্রীক, লাটিন ও ইংরেজি ভাষার কবিতাও লিখতে আরম্ভ করেন।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসিকাল ট্রাইপোস (প্রথম ভাগ) পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন ; সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে—কেমব্রিজ মজলিসের সম্পাদকও হন। ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দিয়ে সেই মজলিসে তিনি কিছু বক্তৃতাও দিয়েছেন। যথাকালে আই. সি. এস. পরীক্ষা দিয়ে তিনি ইচ্ছা করেই অশ্বারোহণে অনুত্তীর্ণ হন, গ্রীক ও লাটিন ভাষায় রেকর্ড-নম্বর পান। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে—স্বামী বিবেকানন্দ যে-বছর শিকাগো-তে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্মসভায় তাঁর প্রসিদ্ধ ভাষণ দেন, সেই বছরেই অরবিন্দ ভারতে ফিরে আসেন। সেই বছরেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। প্রথম সন্তানের জন্মের পরেই জননী স্বর্ণলতাদেবীর একটু মাথার গোলমাল দেখা দেয় এবং বারীন্দ্রের জন্মের পরে বেশ বাড়াবাড়ি ঘটে। বারীন্দ্র ও কন্যা সরোজিনী—এই দুটি সন্তানকে নিয়ে দেওঘরে পিতা রাজনারায়ণের কাছে স্বর্ণলতাকে পৃথক ভাবে বাস করতে হয়। দেশে ফিরে অরবিন্দ ঘোষ বরোদা রাজস্ব-বিভাগে কাজ নেন। পরে ফরাশি ও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হন সেখানে—আরো পরে হন সরকারী মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষ।

এগারো বছর বয়সে এবং পুনরায় চোদ্দো বছর বয়সে ভবিষ্যতে যে তাঁর জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অপেক্ষা করছে, এই খবর অলৌকিক ভাবে তাঁর মনে উদ্ভাসিত হয়। ১৮৯৩ থেকে ১৯০৬ মোট তের বছর তিনি বরোদায় ছিলেন। এই সময়টা তাঁর জীবনে খুবই অর্থবহ। ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন তিনি—সংস্কৃত, গুজরাটী, মারাঠী, বাংলাভাষা শিখেছেন এবং ইংরেজিতে প্রচুর কাব্যনাটক প্রবন্ধ লিখেছেন।

১৮৯৩-এ বোম্বাইয়ে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় তখনকার কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উপায়ের ব্যর্থতা দেখিয়ে তাঁর যে ইংরেজি প্রবন্ধগুলি ছাপা হয়, সেই থেকে তাঁর

প্রকাশ্য রাজনৈতিক জীবনের সূচনা বলা যায়। তিনি বিপ্লবাত্মক কাজের সংগঠন শুরু করেন বোম্বাইয়ে এবং বাংলাতেও। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ভূপেন্দ্রচন্দ্র বসুর কন্যা মৃণালিনী দেবীর (১৮৮৮-১৯১৮) সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় বৈপ্লবিক সংস্থাটিও তাঁরই নির্দেশে গড়ে ওঠে। সেই বছরে স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ ঘটে। ভগিনী নিবেদিতা এসে যোগ দেন শ্রীঅরবিন্দের সাধনকর্মে।

বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বের কথা ভোলবার নয়। সে ১৯০৫-এর ঘটনা। তখনকার যাদবপুর ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন তিনি। কলকাতায় এসে অরবিন্দ 'যুগান্তর' [সূচনা : মার্চ, ১৯০৬] সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং বিপিনচন্দ্র পালের ইংরেজি পত্রিকা 'বন্দেমাতরম্'-এও [সূচনা : ৬ই অগস্ট, ১৯০৬] যোগ দেন। বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দের যুগ্ম-সম্পাদনায় ১৯০৬-এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অতঃপর ২রা মে, ১৯০৮ তাঁর গ্রেপ্তার পর্যন্ত অরবিন্দই ছিলেন সে-পত্রিকার প্রাণ। স্বদেশী-ভাবনার ধর্মান্দোলন গেছে এইসব পত্রিকায়।

২

জগন্নাথের রথ! ব্যক্তি-সমাজ-বিশ্ব-সম্পর্কের নিগূঢ় বোধের ইশারা ওটি।

ধর্মমতের প্রসঙ্গে প্রথম কথা হোলো যা আমাদের ধারণ করে, তাকেই 'ধর্ম' বলি,—এই প্রচলিত ব্যাখ্যার একটু বিশদ আলোচনা হলে ভাল হয়। ধর্মের একদিকে ব্যক্তিগত ধ্যান, অন্যদিকে তার সামাজিক বাহুবিস্তার। সাহিত্যে ধর্ম এই দু'দিকে থেকেই নিজের চিহ্ন রেখে যায়। দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা—নানা ধর্ম, না একই ধর্ম? অর্থাৎ সম্প্রদায়ভেদ যতোই ঘটুক, মূলে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই একই মানবধর্মের প্রতি আনুগত্য তো সত্য?

বিশেষ এক জায়গা থেকেই কথা আরম্ভ করতে হয়। একজনের মন্তব্য মনে পড়ে—ঘড়িতে যতোটা দরকার, তার বেশি দম দেবার চেষ্টা করলে খট্ করে একটা শব্দ হয়, তারপর স্প্রিং কেটে যায়। ১৩১৯ সালে প্রকাশিত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রসঙ্গ' বইখানির 'ধর্ম' প্রবন্ধে এই

উদাহরণটি দিয়ে তিনি লেখেন—"ধর্মের নামে যে সকল নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে, সকলই যে প্রকৃত ধর্ম তাহা নহে", "কিন্তু—ধর্মের অনুশাসন অতিক্রম করিয়া চলিতে গেলে প্রথমে বুকের মধ্যে একটা ধড়াস করিয়া উঠে এবং তথাপি সাবধান না হইয়া না মানিয়া চলিতে থাকিলে অবশেষে নিশ্চিত একেবারে বিনাশের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়।" তিনি লেখেন যে, বুকের মধ্যে ঐ 'ধড়াস'টি হোলো বিবেকের নিষেধ,—এবং—"ধর্ম মঙ্গলের নামান্তর মাত্র।" গৌতম বুদ্ধ ও যীশু খ্রীষ্টের কথা উল্লেখ করে "আত্মার স্বাধীনতা রক্ষা"কেই তিনি ধর্মের পথ বলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বারবার নিষ্কাম ধর্মের গুণগান করে গেছেন। আরো অনেকের মতন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রশংসা করেছেন। ইংরেজিতে যা 'প্যাশন' তারই বাংলা প্রতিশব্দ 'রাগ'—ইংরেজি শব্দটির মূলে ছিল লাটিন 'Passio' যার মানে দুঃখভোগ। পার্থিব যন্ত্রণা আর ইন্দ্রিয়বাসনার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। 'বৈরাগ্য' কথাটির মানে এই রাগবিমুক্ত অবস্থা। এই কারণে ধর্মের সঙ্গে বৈরাগ্যের নিবিড় ও অনিবার্য যোগ। বৈরাগ্য মানে সংসারত্যাগ নয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্ত প্রাণকৃষ্ণকে বলেছিলেন : "লোহার খড়্গো যদি পরশমণি ছোঁয়ানো হয়, খড়্গ সোনা হয়ে যায়।" সংসারের প্যাশন-মুক্তিই বোধ হয় বৈরাগ্য। রামকৃষ্ণ ঠাকুরের পোড়া-দড়ির উদাহরণটিও চমৎকার। জীবন্মুক্ত অবস্থা কী রকম?—ঠাকুরের কথায়—"দূর থেকে পোড়া-দড়ি দেখলে বোধ হয় ঠিক একগাছা দড়ি পড়ে আছে, কিন্তু কাছে এসে ফুঁ দিলে সব উড়ে যায়। ক্রোধের আকার, অহঙ্কারের আকার কেবল, কিন্তু সত্যকার ক্রোধ নয় অহঙ্কার নয়।" বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ যোগী শ্রীঅরবিন্দ হয়ে গেলেন—সে যেন শরীরী মানুষের জীবন্মুক্ত অবস্থায় উত্তরণ। সেই পোড়াদড়ি কিন্তু শক্তির স্তম্ভ! তবু কোনো উপমাই চূড়ান্ত নয়। ভাষার অপূর্ণতা তো মানতেই হয়।

'আনন্দ' নামে আর একটি নিবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ লেখেন—"সুখ এবং আনন্দ দুই বিভিন্ন বস্তু। সুখের মধ্যে আনন্দ না থাকিতে পারে, আবার দুঃখের মধ্যেও আনন্দ থাকিতে পারে। সমুদ্র যেমন সমস্ত নরনারীর সঙ্গমস্থল আনন্দও তেমনি সমস্ত সুখদুঃখের মিলন পরিধি।"

'পাপ' ও 'পুণ্য' তিনি বিশ্বাস করতেন। "ধর্মে বণিকবৃত্তি" নিবন্ধে এই ব্যাপারটার সমর্থন পাওয়া যায়। ভাগবতে প্রহ্লাদ যে নিষ্কাম ভক্তির উদাহরণ

হয়ে আছেন, সেই নিষ্কাম ভাবটির ওপর জোর দিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। "ভক্ত ও তাঁহার নেশা" নিবন্ধে তিনি রামপ্রসাদের গানের কথায় 'মন-মাতাল' আর 'মদ-মাতাল'-এর ভেদ ব্যাখ্যা করে জানান—"মদের মাতালের বেচালে পা পড়ে ভক্তের কখনও বেচালে পা পড়ে না"—অর্থাৎ ভক্ত যিনি তাঁর মানসিক সংহতি লক্ষণীয়। তিনি অহংকারহীন, নিরভিমান।

এই ধর্মজাগৃতি কি প্রয়াসসাধ্য? কতোটা প্রয়াস? কতোটাই বা পরমের কৃপা? উপনিষদের কথা তুলে আরো অনেকে যেমন বলেছেন, সুধীন্দ্রনাথও তেমনি উল্লেখ করেন 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য'। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, যীশু, মহম্মদ, নানক, কবীর, রামকৃষ্ণ—এই ক'জনের নামোল্লেখ করে তিনি তাঁর সেই প্রবন্ধটি শেষ করেন। রবীন্দ্রনাথের কথাও বলতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের নানা উক্তি মনে পড়ে। তাঁর 'মানুষের ধর্ম' সর্বাধিক মনে পড়ে। তাঁর 'ধর্ম' বইখানির রচনাগুলি স্মরণীয়। 'আনন্দ' শব্দটির ওপর এ-পথের প্রত্যেকেই জোর দিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দও—ইংরেজিতে লিখেছেন—'bliss'।

৩

য়ুরোপে যাকে বলে Zeitgeist,—ভারতে যাকে বলা হয় 'কাল', সেই যুগশক্তির প্রসঙ্গ ছিল ১৯০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে 'কর্মযোগীন্' পত্রিকায় প্রকাশিত অরবিন্দের ইংরেজি নিবন্ধবলীতে। আমাদের একালের সেই নিয়ন্ত্রী শক্তির প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে তিনি গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ব্যাখ্যা করেন। তার মূল কথা হোলো—জয় মা কালী! তিনিই যুগাবসানের প্রলয়ঙ্করী দেবী! যোগ্য যন্ত্রের যোগ্য ব্যবহার করেন তিনি।

উনিশ শতকের প্রথমেই রামমোহন এলেন সেই মহাকালীর যন্ত্র হয়ে। তাই তাঁর জীবনকথা আগেই জানা দরকার। তাঁর প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার রাজসরকারে চাকরি করে 'রায় সাহেব' উপাধি পান। পিতা রামকান্ত রায়ও মুর্শিদাবাদ সরকারে কাজ করতেন। উত্তরকালে তিনি স্বগ্রামে বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। রামকান্ত রায়ের তিন পত্নীর মধ্যে প্রথমা সুভদ্রা দেবী ছিলেন নিঃসন্তান; দ্বিতীয়া তারিণী দেবীর তিনটি সন্তানের মধ্যে

একজন হলেন জগমোহন, দ্বিতীয় রামমোহন এবং তৃতীয়া রামমণি দেবী ছিলেন রামলোচন রায়ের জননী।

চোদ্দ বছর পর্যন্ত রামমোহন প্রধানতঃ রাধানগরেই বাস করেন। সেই চোদ্দ বছর বয়সে রাধানগরেই তাঁর সঙ্গে সুখসাগরের সন্নিহিত গ্রামের নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের পরিচয় হয়। নন্দকুমার অধ্যাপক ছিলেন এবং পরে তান্ত্রিক সাধনা করে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে পরিচিত হন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন যে, রামমোহনের সংস্কৃত শাস্ত্রে অধিকার অনেকটা এঁরই শিক্ষার ফল। রামমোহনকে ইনিই নাকি তান্ত্রিক মতে প্রথম আকৃষ্ট করেন।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে রামকান্ত রায় সপরিবারে দৌহিত্রকেও সঙ্গে নিয়ে রাধানগরের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে লাঙ্গুলপাড়া নামে কাছাকাছি আর এক গ্রামে গিয়ে নতুন বাড়ি করেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কোম্পানীর কাছ থেকে ভুরসুট পরগণা ইজারা নেন তিনি। জগমোহন এই ইজারার জন্যে রামকান্তের জামিন হন। রামমোহনও সম্ভবত এ সময়ে পিতার বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করছিলেন।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর রামকান্ত নিজের জন্যে সম্পত্তির সামান্য কিছু অংশ রেখে, বাকি সম্পত্তি এক দানপত্রে তাঁর ছেলেদের ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেন৮ তিন ছেলেই প্রায় সমান ভাগ পান। কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ি রামমোহনের ভাগে পড়ে। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রামমোহনের সম্পত্তির পরিমাণ বেশ ধর্তব্য হয়ে ওঠে।

এই সম্পত্তি-বিভাগের পরে রামকান্ত বর্ধমানে চলে যান এবং সেখানে নিজের ইজারার জমিদারি এবং বর্ধমানাধিপতি তেজচন্দ্রের জননী মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন। রামলোচন এবং তাঁর জননী রামমণি দেবী লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ি থেকে চলে যান। ছেলেরা মাঝে মাঝে বর্ধমানে গিয়ে রামকান্তের সঙ্গে দেখা করে আসতেন, রামকান্তও মাঝে মাঝে রাধানগরে এবং লাঙ্গুলপাড়ায় যেতেন।

সম্পত্তি-বিভাগের ন-মাস পরে, রামমোহন স্থায়িভাবে কলকাতায় বাস করতে যান। কিন্তু তখনো স্থায়িভাবে তিনি কলকাতায় বাস করেন নি।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রামকান্ত রায়ের প্রভাবের অবসান হয় এবং নানাভাবে ঋণজর্জর হয়ে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝা-

মাঝি তাঁকে হুগলীর দেওয়ানী জেলে বন্দী হতে হয়। তারপর আরো একবার তাঁকে জেলে যেতে হয়। জগমোহনও বাকি খাজনার দায়ে মেদিনীপুর জেলে বন্দী হন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে রামমোহন পাটনা, কাশী ও কলকাতা থেকে আরো দূর প্রবাসে যাবার জন্যে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজীবলোচন রায়ের সঙ্গে নিজের তালুকগুলির বিলি-বন্দোবস্ত আরম্ভ করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পুত্র রাধাপ্রসাদের জন্মের আগেই রামমোহন পশ্চিম যাত্রা করেন।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। সম্ভবতঃ এই বছরেই তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দেশীয় ভাষা-শিক্ষার্থী সিবিলিয়ন জন ডিগ্‌বির সঙ্গে পরিচিত হন। ডিগ্‌বি এদেশে আসেন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে।

রামমোহন সদর দেওয়ানী আদালতের এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে কোনো-না-কোনো ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শুধু তাই নয়, কলকাতার উচ্চপদস্থ মৌলবীদের সাহায্যে তিনি আরবী ফার্সী ভাষায় তাঁর চর্চা সুপরিণত করেন।

এই সময়ে কলকাতায় রামমোহন বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কিত নানা কাজ করতেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিবিলিয়ন অ্যাণ্ড্রু র‍্যামজেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা ধার দেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে টমাস উডফোর্ড নামে কলকাতার আর এক সিবিলিয়নকে পাঁচ হাজার টাকা ধার দেন। এর কয়েক মাস পরেই জালালপুরে যথারীতি জামিন দিয়ে তিনি উড্‌ফোর্ডের দেওয়ান নিযুক্ত হন। কিন্তু উডফোর্ড ঢাকা-জালালপুর ত্যাগ করবার পরেই ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তিনি পদত্যাগ করেন। ঐ বছর মে-জুন মাসে বর্ধমানের বাড়িতে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। জগমোহন তখন মেদিনীপুর জেলে বন্দী ছিলেন। রামমোহন তখন প্রবাসে ছিলেন। তবে, রামমোহন তখন বেশ সম্পন্ন ব্যক্তি। পিতার শ্রাদ্ধ নিয়ে রামমোহন ও অন্যান্যদের মধ্যে এক গণ্ডগোল ঘটে। রামমোহন নিজের খরচে কলকাতায় পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন; অপর পক্ষে তারিণী দেবী তাঁর দৌহিত্রের অলঙ্কার বন্ধক দিয়ে রামলোচনকে দিয়ে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন; জগমোহন মেদিনীপুর জেলের মধ্যেই আর এক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। সেই ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দেই রামমোহন একেশ্বরবাদ-সম্পর্কিত তাঁর আরবী ফার্সী গ্রন্থ 'তুহফাৎ উল্‌ মুয়াহহিদীন' প্রকাশ করেন।

শিশিরকুমার মিত্রের Resurgent India'র ৭৬ পৃষ্ঠায় শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের উক্তি তুলে দেওয়া হয়েছে—রামমোহন ছিলেন নবজন্ম, নবজীবন নতুন

স্থষ্টির বীজবাহক ও পরিব্যাপ্তির দূত। তাঁর বিরোধী সমালোচকের অন্ত ছিল না। রাধাকান্ত দেব, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রামমোহনের ভাবনেতৃত্বই উত্তরকালে নানাভাবে রূপান্তরিত হয়েছে।

১৮০৫-এর মাঝামাঝি থেকে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত গেছে রামমোহনের সঙ্গে ডিগ্‌বির ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যুগ। তখন ডিগ্‌বির অধীনে তিনি চাকরি করেন এবং তাঁর কাছেই বিশেষ ভাবে ইংরেজি শিক্ষা করেন। ডিগবির সঙ্গে প্রথমে রামগড়ে—রামগড় থেকে যশোহরে,—যশোহর থেকে ভাগলপুরে—এবং সেখান থেকে তিনি রংপুরে যান। ভাগলপুরে কালেকটর সার ফ্রেডারিক হামিলটনের সঙ্গে তাঁর বেশ সংঘর্ষ ঘটে ও বড়লাট লর্ড মিণ্টোর কাছে তিনি প্রতিকারের জন্যে আবেদন করেন। এই আবেদন-পত্রই তাঁর সুপরিচিত সর্বপ্রথম ইংরেজি রচনা। এটির তারিখ ১২ই এপ্রিল, ১৮১৯। ১৮০০ থেকে ১৮১৪ পর্যন্ত ক'বছরের মধ্যে অল্প সময়ের জন্যে রামমোহন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি করেন। ডিগবির পক্ষ থেকে তাঁকে রংপুরে স্থায়ী দেওয়ান করবার চেষ্টা হয়, কিন্তু বোর্ড-অফ-রেভিনিউ কিছুতেই সে প্রস্তাবে রাজী হননি। রামমোহন ডিগবিরই খাস কর্মচারী ছিলেন। ডিগবি যখন যশোহরে ছিলেন তখন রামমোহন ছিলেন তাঁর খাস মুনসী।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জুলাই ডিগবি ছুটি নিয়ে রংপুর ত্যাগ করেন এবং রামমোহনও কলকাতায় আসেন। কিন্তু পরের বছর ইংরেজের দৌত্যকর্মে তাঁকে ভুটান যাত্রা করতে হয়। ভোটরাজের সঙ্গে কুচবিহার-রাজ্যের আঞ্চলিক সীমানা-ঘটিত এক বিবাদে রংপুরে তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট ডেভিড স্কট সেরেস্তার বিশ্বস্ত কর্মচারী কৃষ্ণকান্ত বসুকে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ভুটানে পাঠান। রামমোহন তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষে, কর্তৃপক্ষের নির্দেশমত রামমোহন রংপুরে ফিরে আসেন। তখন ইংরেজের সঙ্গে নেপালের যুদ্ধ চলছিল; ভোটরাজকে নেপালের পক্ষে যোগ দিতে নিরস্ত করাই রামমোহনের দৌত্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। ১৮১৬ থেকে রামমোহন কলকাতায় বাস করেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নামে দুটি বাড়ি কেনা হয়—একটি চৌরঙ্গীতে, অন্যটি মানিকতলায়। সম্ভবতঃ তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ি এই সময়ে বিক্রি হয়ে যায়। ঐ সময়ে দেশে লাঙ্গুলপাড়া ত্যাগ করে রঘুনাথপুরে এক নতুন বাড়ি তৈরীর আয়োজন হয়। মানিক-

তলার বাড়িতে তিনি বেশ ঐশ্বর্যশালী মানুষের মতন থাকতেন। বিদেশ থেকে যাঁরা ভারত-ভ্রমণে আসতেন তাঁরা অনেকেই রামমোহনের সঙ্গে দেখা করতেন।

ভ্রাতা জগমোহনের পুত্র (দুর্গাদেবীর সন্তান) গোবিন্দপ্রসাদ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জুন সুপ্রীম-কোর্টে এক মামলা রুজু করেন সম্পত্তি সম্বন্ধে—হিন্দু একান্নভুক্ত পরিবারের সম্পত্তি—তাঁর তাতে অধিকার ছিল—এই ছিল তাঁর দাবি। রামমোহন সে দাবি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন এবং ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর সম্পত্তির শেষ শুনানির দিন গোবিন্দপ্রসাদ আদালতে উপস্থিত হননি। তিনি রামমোহনের কাছে মার্জনা চান।

তারিণী দেবী সংসারে বীতরাগ হয়ে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে একাকিনী শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করেন। সেখানে তিনি প্রতিদিন জগন্নাথ মন্দিরে ঝাঁট দিতেন। ১৮২২-এর ২১এ এপ্রিল তারিখে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

রামমোহনের এই অতিসংক্ষিপ্ত জীবনকথা প্রধানত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' [১৬] থেকে নেওয়া হোলো। তিনি প্রভূত রজোগুণের মানুষ ছিলেন। বেদান্ত সম্বন্ধে আমাদের ঐতিহ্য চর্চার দিকে তিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করে গেছেন এবং সংসারের সাধারণ অসাধারণ সুখ-দুঃখ অনেক পেলেও তিনি নিজের যুক্তিবিচারে অটুট ছিলেন। তিনিই শতাব্দীর প্রথম কর্মবীর ও চিন্তানায়ক। তাঁর নাম সারা উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী মনীষীদের মধ্যে অদ্বৈতবাদ, ভক্তিবাদ, ইসলামী, খ্রীষ্টীয় ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মমতের প্রভাব-প্রতিধ্বনির প্রসঙ্গ জাগিয়ে তোলে। কিন্তু তিনি নিজে ব্রহ্মোপলব্ধির মানুষ ছিলেন না। রামকৃষ্ণের মতন প্রতিমাকে মাতৃবোধে বুকে জড়িয়ে ধরার তৃষ্ণা ছিল না তাঁর —যদিও তাঁর কয়েকটি গানে রামপ্রসাদের মাতৃপূজার প্রতিধ্বনি অনুভব করেছেন কেউ কেউ। সে যাই হোক, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে তিনি যথাসাধ্য সামাজিক সংস্কারে ও শিক্ষার নেতৃত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। অরবিন্দের তুলনায় তার আয়ুষ্কাল ছিল হ্রস্বতর,—বিবেকানন্দ ছিলেন আরো স্বল্পায়ু,—কিন্তু রামমোহন কখনোই ভাবসমাধির প্রার্থী ছিলেন কি?

এদেশে সত্যসন্ধানের স্রোত যুক্তি থেকে ভক্তিতে—এবং ভক্তির ধারাও

কখনো কখনো বিপরীত খাতে প্রবাহিত হয়েছে। রামমোহন ছিলেন শতাব্দীর প্রথম পথপ্রদর্শক। একে একে এলেন অনেকেই—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র—রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ। সেই ধারাতেই শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দের জীবনও রক্তমাংসের মানুষেরই আত্মানুসন্ধান। তাঁকে যাঁরা 'অবতার' বলেন, তাঁরাও কি অস্বীকার করতে পারেন যে—শ্রীকৃষ্ণ, গৌতমবুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন নশ্বর শরীরী সত্তা? শরীরী জীবের মতোই তাঁদের সুখ, দুঃখ, আশা, আশাভঙ্গ, রোগ, মৃত্যু, সবই বরণ করতে হয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, পরমহংসদেব, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ—এঁরা প্রত্যেকেই অসামান্য মানুষ ছিলেন। এঁদের মতন মানুষদের কথা ভাবতে গেলেই মন সেই প্রবচনটি ফিরে পায়—'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্মা পড়ে কাঁদে।' একটি চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ একজনকে লিখেছিলেন—"তুমি যদি ভিতরে শান্ত ও সমর্পিত হয়ে থাক, তাহলে বাধা বিঘ্ন ইত্যাদি তোমাকে বিচলিত করবে না। অশান্তি, চঞ্চলতা আর "কেন হচ্ছে না, কবে হবে" এই ভাব ঢুকতে দিলে বাধা-বিঘ্ন জোর পায়। তুমি বাধা-বিঘ্নর দিকে অত নজর দাও কেন? মায়ের দিকে দাও।[১]

৪

১৮৩০ থেকে ১৮৫০—উনিশ শতকের এই দুটি দশকেই আমাদের ঐতিহ্য আর প্রগতি, বিপরীত দুই সন্ধান ও সংঘর্ষের কাল গেছে। শতাব্দীর শেষ পাদে ঠাকুর-রামকৃষ্ণের দিব্যচেতনার স্পর্শে সন্ধানী মানুষের মন কতকটা শান্ত হয়। অরবিন্দের শৈশব, কৈশোর, নবযৌবন—একটি-একটি করে অধ্যায় শেষ হয়েছে গত শতকের সেই শেষ পাদে। রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ থেকে ১৯১০-এর পরেই তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ অন্তর্ধান ঘটে। ১৯১০ থেকে ১৯৫০ একটি ভিন্ন অধ্যায় তাঁর

১। 'পত্রাবলী': 'শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী' (১৯৬৯) পৃঃ ২১৫ দ্রষ্টব্য।

জীবনে। সেই পরিণত পর্বে তাঁর কয়েকটি ভাবনা ও অনুভূতির প্রসঙ্গ ঠিক এই সন্ধিতেই মনে পড়ে। তিনি লিখে গেছেন—

When we have passed beyond knowings, then we shall have knowledge. Reason was the helper; Reason is the bar.

When we have passed beyond the willings, then we shall have Bliss. Desire was the helper; Desire is the bar.

When we have passed beyond individualising, then we shall be real persons. Ego was the helper; Ego is the bar.

When we have passed beyond humanity, then we shall be the Man. The Animal was the helper; the Animal is the bar.

Transform reason into ordered intuition; let all thyself be light. This is thy goal.[২]

বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন, 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', মৃণালিনী'—এই প্রথম তিনখানি উপন্যাস লিখেছেন, তারই কাছাকাছি সময়ে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাথ্যু আর্নলড্ তাঁর 'কালচার অ্যাণ্ড অ্যানারকি'-বইয়ের ভূমিকাতে লেখেন যে, পুরোনো খ্রীষ্টধর্মের নীতিবচন যা এককালে বেশ জনপ্রিয় ছিল—সেই বিশপ উইলসনের আবেদন তখন ক্ষীণ হয়ে গেছে। ম্যাথ্যু আর্নলড্ সেই ভূমিকাতে অতঃপর জানান যে, তাঁর ঐ নিবন্ধমালাতে তখনকার চিন্তা ও

২। জন্মশতবার্ষিকী রচনাবলী, ১৬শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৭ দ্রষ্টব্য। বঙ্গানুবাদে এই উক্তিগুলির সার হোলো—যখন আমরা সকল জানার পরপারে পৌঁছোই তখনি সত্যিকার 'জ্ঞান'লাভ ঘটবে। যুক্তিই ছিল সহায়ক; যুক্তিই আবার বাধা। যখন আমরা সব সংকল্প পার হয়ে যাবো তখনি যথার্থ আনন্দে পৌঁছোবো। আকাঙ্ক্ষাই ছিল সহায়ক; আবার আকাঙ্ক্ষাই বাধা। যখন 'আমি' 'আমি' ব্যক্তিভাবের কবল ছাড়িয়ে যাবো তখনি যথার্থ এক-এক ব্যক্তি দেখা দেবে। অহংবোধই ছিল সহায়ক; আবার অহংবোধই বাধা। ইত্যাদি।

আচরণের দুর্যোগ থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্যেই 'কালচার' বা সংস্কৃতির পক্ষে তিনি আলোচনা করবেন—কারণ, 'কালচার' মানেই সার্বিক সৎগুণের পরাকাষ্ঠা! তাঁর নিজের কথায়—"A pursuit of our total perfection by means of getting to know, on all the matters which most concern us."। তাঁর চোখে এই প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞানার্জনই ছিল 'ধর্ম'। এই জ্ঞানযোগের ফলেই মনের স্বাধীন সংস্কারমুক্ত বিকাশ সম্ভব। যান্ত্রিকভাবে গতানুগতিক 'virtue' বা পুণ্যনীতি অনুসরণের চেষ্টা করে লাভ নেই। এবং যে সংস্কৃতিচর্চার প্রস্তাব তিনি তুলেছিলেন, সে কোনো বাইরের ব্যাপার নয়—"And the culture we recommend is, above all, an inward operation." তাঁর এই আলোচনায় বারবার ধর্ম বা 'রিলিজন'-এর প্রসঙ্গ দেখা দেয়। যুক্তিবিচার বা 'রীজন্'-এর প্রসঙ্গও ওঠে। সেকালে আমেরিকা রিলিজন সম্পর্কে বিশেষ মাথা ঘামায়নি—এই প্রচলিত ধারণা সম্বন্ধেও তাঁর কিছু মন্তব্য ছিল। রেনানের (Mr. Renan) এবং ব্রাইটের (Mr. Bright) যথাক্রমে পক্ষপাত ছিল ধর্মের দিকে এবং রাজনীতির দিকে। আমেরিকা সম্বন্ধে আর্নলড্ এই দুজনেরই ধারণা উল্লেখ করেন। আধ্যাত্মিকতা যে কালচার-এর বিশেষ লক্ষণ এবং সে-আধ্যাত্মিকতা যে ঐহিক মানবজীবনের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের প্রতি উদাসীনতা নয়, একথাও তিনি জানান। শুধু গ্রীক-লাটিনের জ্ঞানার্জনের নাম 'কালচার' নয়। শুধু বিভিন্ন বিদ্যার কৌতূহল নয়। ম্যাথ্যু আর্নল্ড বলতে চেয়েছিলেন যে, কাল্চার হোলো সর্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠতার প্রতি মমতা—'love of perfection.'

বার্ট্রন্ড্ রাসেলের 'নিউ হোপ্স্ ফর এ চেঞ্জিং ওয়ার্লড' বেরোয় ম্যাথ্যু আর্নল্ডের ঐ আলোচনার প্রায় আশি বছর পরে—১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে দুনিয়া অনেক তাড়াতাড়ি বদলে গেছে। কিন্তু মনের দ্বন্দ্ব কমেনি। রাসেলের ঐ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের নাম—'মডার্ণ পারপ্লেক্সিটিজ'—অর্থাৎ আধুনিক-যুগের চিন্তাসংকট। একালে মানুষের মানসিক অস্বস্তির এই বিশ্লেষণ পাওয়া যায় সেখানে—তিন দিক থেকে তিনি বিষয়টি অনুধাবন করেছেন—১) মানুষ এবং প্রকৃতি, ২) মানুষে-মানুষে সংঘর্ষ, ৩) ব্যক্তিমনের অন্তর-বিরোধ।

এই দুরবস্থার কুয়াশা কাটাতেই হবে—এই ছিল রাসেলের সংকল্প। এই তিন দিকের চিন্তা থেকেই ভাবনা এগিয়েছে তিন দিকে—১) জড়বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতাই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ ঘটাচ্ছে; ২) রাজনীতি

আর জঙ্গীভাব মানুষে-মানুষে বিরোধের কারণ; (৩) ব্যক্তিমনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ইতিপূর্বে এবং এ-পর্যন্ত ধর্মনীতির দ্বারা নিরাময়ের চেষ্টা ঘটেছে, কিন্তু একালে এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা বলেছেন মনোবিশ্লেষণের সাহায্যে এই সংকট দূর করা যায়,—যদিও রাসেলের নিজের তাতে সন্দেহ ছিল, তিনি লেখেন—"but I doubt whether these methods unsupplemented can supply all that is needed"।

বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই তিন ধারার ইঙ্গিত পরিস্ফুট ক'রে তিনি লিখে গেছেন যে, মানুষের নিজের-নিজের ভেতরকার বিরোধই প্রত্যেককে চেষ্টা ক'রে কাটাতে হবে। সবরকম সংগ্রামের অবসান হোক্ সর্বব্যাপী সৌষম্যচেতনায়—অর্থাৎ 'হার্মনি'-তে। প্রকৃতির প্রতিকূলতাই মানুষকে প্রকৃতির গোপন ও নিহিত সত্যের অধিকারী করেছে। ফলে, যুদ্ধ নয়, সহযোগিতা চর্চা করতে হয়েছে মানুষকে। সেই সহযোগিতার গুণেই মানুষ সেই সৌষম্যচেতনায় পৌছেচে। অন্নবস্ত্রের ভাণ্ডার খুলে রেখেছেন প্রকৃতি। যতক্ষণ প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্র সকলের না জোটে, ততক্ষণই এই অশান্তি চলবে। বৈষম্য, শ্রেণীগত সুবিধাভোগ—এসব ব্যাপারই সুখ-শান্তির কাঁটা। তাই ব্যাপক সহযোগিতা, সমবায়নীতি ইত্যাদি দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশেষ শ্রেণীসুখ বিদায় নিলেই শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।

ততঃ কিম্? তারপরে? রাসেলের কথায়—আমাদের 'পাপ'বোধটাও তাড়াতে হবে। প্রথম অধ্যায়েই তিনি এই পাপের কথা তুলেছিলেন। তিনি ধার্মিকের সংজ্ঞা বা বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—নিয়ত প্রলোভন ও প্রবৃত্তি-তাড়নার দ্বারা বেষ্টিত থেকেও—এবং পাপের টানে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েও প্রায় অতিমানবিক ইচ্ছাশক্তির গুণে সরল সংকীর্ণ ক্ষুরধার পথে হেঁটে যেতে-যেতে যে-ব্যক্তি পথের দুপাশে অন্যান্য যারা কামনার ফুল ছিঁড়তে ব্যস্ত, তাদের নিকৃষ্ট জীব মনে করতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধার্মিক!

প্রচলিত কথায় আমরা জানি, যা আমাদের ধারণ করে, তাকেই বলা হয় 'ধর্ম'। রাসেল বিষয়টি আরও সংহত ক'রে দেখিয়েছেন যে, নিম্নপ্রবৃত্তিও তো অনেককে ধারণ ক'রে থাকে। চোরের ধর্ম চুরি করা, লম্পটের ধর্ম লাম্পট্য, নেশাখোরের ধর্ম নেশা করা—এভাবে 'ধর্ম' বোঝা চলবে না। তাহলে রাসেলের চিন্তায় ধর্মের পথ সত্যিই প্রবৃত্তির হাতে গা ঢেলে দেওয়া নয়—প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন নয়। ধর্মের পথ সত্যিই ক্ষুরধার!

রাসেলের এই ইঙ্গিতটি আগে বুঝে দেখা দরকার যে, 'ধর্ম'-কে ঐভাবে দেখলে—'In this conception, virtue is difficult, negative and arid.'। এখানে বাংলায় যাকে 'ধর্ম' বলা হোলো, সে ঐ 'virtue'-রই অনুবাদ—এবং আমাদের 'ধর্ম' কথাটার মধ্যে ইংরেজি religion এবং virtue দুটোই ধ'রে যায়। রাসেল বলেন—যদি পুণ্য বা ধর্ম অর্থাৎ virtue-র মানে এই ধরা যায় যে, আমাদের মরদেহের সত্তাবোধের স্বাভাবিক ঘাত বা আবেগ বা impulse-গুলোকে পরিহার করবার জন্যে সব সময়েই কোমর বেঁধে থাকতে হবে, তাহলে জীবন বড়োই নীরস শুকনো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় না কি? আমাদের 'পাপ'বোধ হয়তো এই ধরনের অতিনৈতিক নিত্যপীড়িত মানসিকতার—অর্থাৎ tension-এর উপহার।[৩]

কিন্তু সুখের জন্যেই সংযম দরকার। সেকথা কেবল ভারতবাসীরই কথা নয়, চিন্তাশীল বিশ্ববাসীমাত্রই তা মানবেন। রবীন্দ্রনাথ বারবার একথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। নেশার সুখ যথার্থ সুখ নয়; প্রবৃত্তির তাড়নায় যে-সুখের সন্ধানে ছট্‌ফট্ ক'রে কেউ কেউ ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তি পেয়ে থাকেন, তাও স্থায়ী সুখ নয়। 'সুখ' বলতে সাধারণতঃ আমরা যা বুঝি, তা খুবই ক্ষণিক—এবং নেশা মাত্রেরই অবসাদ অনিবার্য।[৪]

অর্থাৎ, মানুষ যা সত্যিই চায়, সেটা তুচ্ছ 'সুখ' নয়। যে দেশ যথার্থ আত্ম-বোধের শিক্ষায় বঞ্চিত, সে-দেশ বা সে-জাতি সুখের তত্ত্ব জানবে কি ক'রে? গ্রন্থিবন্ধনে সুখ নেই। এবং যা আমরা চাই, সে বন্ধনও নয়, উচ্ছৃঙ্খলতাও নয়।

৩। রাসেল লিখেছেন—'The good life, as I conceive it, is a happy life. I do not mean that if you are good, you will be happy; I mean that if you are happy, you will be good. Unhappines is deeply implemented in the souls of most of us."। একথার প্রতিবাদ কি সম্ভব?

৪। রাসেল লিখেছেন—"How many people we all know who go through life apparently gay, and who yet are perpetually in search of intoxication whether of the Bacchic kind or some other. The happy man does not desire intoxication."

ধম্মপদে বলা হয়েছে—'পরিলাহো ন বিজ্জতি'—তার কোনো প্রদাহ নেই; বলা হয়েছে হাঁসেরা যেমন যাযাবর,—আহার শেষ হলেই তুষ্ট তৃপ্ত মনে জলাশয় ত্যাগ ক'রে তারা যেমন উড়ে যায়,—'হায়, হায়, আমার জল, আমার জলাশয়, আমার উৎপল এখানে পড়ে রইলো'—এরকম কোনো খেদোক্তি থাকে না তাদের,—প্রজ্ঞাবান মানুষও সেইরকম অনাসক্ত। সুখের নেশা নেই তাঁর। বৌদ্ধশাস্ত্রে বলা হয়েছে—প্রজ্ঞাহীনের ধ্যান কোথায়?—অ-ধ্যানীরই বা প্রজ্ঞা কোথায়? যাঁর ধ্যান ও প্রজ্ঞা দুই-ই আছে, তিনিই নির্বাণের সমীপস্থ—

নত্থি ঝানং অপঞ্‌ঞস্‌স পঞ্‌ঞা নত্থি অজ্ঝায়তো,
যম্হি ঝানং চ পঞ্‌ঞা চ স বে নিব্বাণসন্তিকে।

না, প্রজ্ঞা ও ধ্যান কোনো শুষ্কতার পথ নয়। তবে এসব বিষয়ে সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ ঘটবেই। শ্রীঅরবিন্দ মানুষের সংশয়-স্বভাব সম্বন্ধে দিলীপকুমারকে এক চিঠিতে লেখেন—৬০ থেকে ৬০০ পৃষ্ঠার মতো লেখা ব্যতিরেকে সন্দেহ সম্বন্ধে যথেষ্ট কিছু কি বলা যায়? কিন্তু বেশ প্রত্যয়োৎপাদক ৬০০০ পৃষ্ঠা লিখলেও কি সন্দেহকে সন্দেহমুক্ত করা যাবে? তিনি বলেছেন, সন্দেহের মূল উৎপাটন করা দুঃসাধ্য। সন্দেহকে ক্ষান্ত রাখতে হয় 'ডিসক্রিমিনেশন' বা বিবেচনার গুণে। বিবেচনাকে প্রহরায় রেখে, সৎসাহস মেনে অভিজ্ঞতার মধ্যে নামা চাই। যা দৈব, তাকে তিনি জড় জগতের সুনিশ্চিতের চেয়ে সুনিশ্চিত বলেছেন।[৫]

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মিনিয়াপলিস্ শহরে ২৬এ নভেম্বর তারিখে স্বামী বিবেকানন্দ পেরিপ্যাটেটিক ক্লাবে তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ঈশ্বর প্রত্যেক ধর্মেই আরাধ্য; হিন্দু তাঁকে পেতে চেষ্টা করে ভালবাসার পথে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জানুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ায় প্যাসাডেনা শেক্‌সপীয়র-ক্লাবে তিনি বলেন—ভারতবর্ষ এক ভগ্নস্তূপে পরিণত বিশাল অট্টালিকার মতো। রোমের উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্য-বিস্তার,—গ্রীসের ছিল বুদ্ধিবৃত্তির ঐশ্বর্য,—ভারতের ধর্মাচার। অন্যান্য দেশে সংকট এসেছে,—তাদের মূল আদর্শ ভেঙেছে, কিন্তু ভারতে ঠিক সেরকম দুর্যোগ

৫। পত্রগুচ্ছ—'অনামী' পৃ২৫৯ দ্রষ্টব্য।

ঘটতে পারেনি,—তার কারণ, ভারত ধর্মপ্রাণতা বিসর্জন দেয়নি। বেদের আগেও ভারতে সন্ন্যাস ছিল; বেদেও সন্ন্যাসীর উল্লেখ আছে। সন্ন্যাস মানে পৌরোহিত্য নয়। পুরোহিতের বৃত্তি আর পাঁচটা সমাজবৃত্তিরই অন্যতম। এই সভাতেই বিবেকানন্দ ভারতের এই দাবি পেশ করেন যে, বিশ্বকল্যাণের জন্যে সহযোগিতা চাই-ই—ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে,—সর্বত্র,—সমাজের সর্বস্তরে সহযোগিতাচর্চা ব্যতিরেকে সন্তোষ সম্ভব নয়। সেই বক্তৃতার বছর-ছয়েক আগে ১৮৯৪-এর কয়েকটি বক্তৃতায় নারীর প্রতি ভারতের শ্রদ্ধার কথা তিনি আলোচনা করেন। ডেট্রয়েটে ছিলেন যখন, সে-সময়ে আমাদের জননীবোধের মহিমার প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরাগের দিকটি তিনি ব্যাখ্যা করেন। ১৮৯৫-এর ফেব্রুয়ারিতে এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক সভায় তিনি জানান যে, খ্রীষ্টের উপদেশগুলির মূল পাওয়া যায় গৌতম বুদ্ধের বাণীতে।

স্বামীজী সেই সময়েই জানান যে, এ-দেশে যাঁরা গৃহী আর যাঁরা সন্ন্যাসী—এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা চাই। তিনি এই সূত্রে এবং অন্যত্রও বলেছেন, পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসে, তাহলে মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হবে। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন—"শিক্ষা কেন দ্বারে দ্বারে যাইবে না?"—বলেছিলেন—"চাষীর ছেলে যদি বিদ্যালয়ে আসিতে না পারে, তাহা হইলে, কৃষিক্ষেত্রে অথবা কারখানায়—যেখানে সে আছে, সেখানেই তাহাকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।"

মহাবীরের মতন নিষ্ঠাবান কর্মী চেয়েছিলেন তিনি। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর 'স্বামী-শিষ্য সংবাদে' ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ঘরোয়া আলাপের মধ্যে স্বামীজীর এই ভাবটির ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, নচিকেতার মতন দেশে দশ-বারোটি ছেলে পাওয়া যেতো যদি, তাহলে দেশের যথার্থ অভ্যুদয় ঘটানো যেতো। সন্ন্যাসেই এই অসামান্য শক্তির সম্ভাবনা। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' অবশ্য তার আগেই সন্ন্যাসীর বিশেষ এক ভূমিকা দেখিয়ে গেছে। এবং আরও আগে ছিল মহারাষ্ট্রের শিবাজীর ভবানী-পূজা।

স্বামী বিবেকানন্দের এই নচিকেতার আদর্শ বৌদ্ধ ভিক্ষুকের কথা মনে করিয়ে দেয়। ধম্মপদের প্রসঙ্গ সেই সূত্রেই পুনরায় মনে আসে—

সব্বসো নামরূপস্মিং যস্‌স নত্থি মমায়িতং,
অসতা চ ন সোচতি স বে ভিক্খুতি বুচ্চতি॥

—অর্থাৎ নামে বা রূপে যিনি অনাসক্ত,—যা অসৎ, তার জন্যে যাঁর মন

খেদহীন ও অনুশোচনাহীন তিনিই হলেন ভিক্ষু!

বাংলায়—তথা সমগ্র ভারতে গৌতমবুদ্ধের বাণী ও সাধনা,—বেদ-উপনিষদ রামায়ণের ও মহাভারতের শিক্ষা, খ্রীষ্টধর্মের মূল বিশ্বপ্রেমের আদর্শ, ইসলামের বিশেষ বিশেষ নীতি, শ্রীচৈতন্যের সাধনা,—তন্ত্রের পথ ইত্যাদি বিচিত্র ধর্মভাবনার সমন্বয় ও তুলনা উনিশ শতকের প্রথম পাদেই সূচিত হয়। প্রজ্ঞা যে ব্যবহারিক জগৎ-নিরপেক্ষ কোনো আকাশকুসুম নয়, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বেচ্ছান্ধতা নয়,—শতকের প্রথমেই রামমোহন রায়ের বিচিত্র কর্মে ও চিন্তায় তা প্রতিভাত হয়। রামমোহন খুবই বিতর্কপরায়ণ মানুষ ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল নাকি ১৭৭৪-এ, সে গবেষণা তুচ্ছ নয়; কিন্তু ততোধিক যা লক্ষণীয়, সে হোলো তাঁর আয়ুকালের মধ্যে অর্থাৎ ১৭৭২ বা '৭৪ থেকে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর তিরোধানের মধ্যে সভ্যজগতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা গেছে। পণ্ডিত ত্রিপুরাশঙ্কর সেনাশাস্ত্রী ১৩৫৬ সালে প্রকাশিত 'তাঁর 'সাহিত্যের নবজন্ম ও যুগচেতনা' নামে চটি বইটির প্রথম নিবন্ধে 'রাজা রামমোহন রায় ও যুগ-চেতনা'-তে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক তথ্য পরিবেশন ক'রে সহজ বাংলায় পূর্বস্বীকৃত এই মন্তব্যটি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, আচার্য শঙ্করের বিচার-পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে নানা ধর্ম-সম্প্রদায়ের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি। বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বে রামমোহন বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন; জীবনকে মায়া বা মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেবার তথাকথিত বিলাসের তিনি মোটেই প্রশ্রয় দেননি। বিশ্বকল্যাণ এবং জাতীয়তাবোধ—এই দুয়ের সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর আদর্শে। একালে এদেশে রামমোহনই প্রথম তুলনা-ভিত্তিক ধর্মালোচনার প্রবর্তক ছিলেন এবং য়ুরোপে যেমন ফ্রান্সিস বেকন, এদেশে তেমনি উনিশ শতকের প্রথমেই রামমোহন সংস্কারমুক্ত ধর্মসাধনার বিশেষ ধারাটি প্রবাহিত ক'রে গেছেন। এই ধর্মবোধই সমাজ, ভাষা, বিজ্ঞানচর্চ্চা, রাজনীতি ইত্যাদি অর্জনীয় যাবতীয় জ্ঞান-কর্মের প্রেরণা দিয়েছে। বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ সকলেই সেই প্রেরণার কুসুম! রামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'—এই বাণীও মুক্ত দৃষ্টির পরাকাষ্ঠা! বুদ্ধিমার্গে রামমোহন যা পেয়েছিলেন, সারা উনিশ শতকের জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির পথে সেই বীজ থেকেই অভাবিতপূর্ব নতুন ভারতবোধ ও বিশ্বযোগের বিকাশ ঘটে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রেরণা থেকেই শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবন-কথার প্রবাহ ছড়িয়েছে—এ মন্তব্যও অলীক নয়। শ্রীশ্রীসারদা দেবী,

ভগিনী নিবেদিতা,—পণ্ডিচেরীর শ্রীমা—এঁরা এবং আরো অনেকেই ভারতের বেদান্ত আর তন্ত্র এবং পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের কর্মকাণ্ডের আশ্চর্য এক শক্তিরই তরঙ্গচ্ছটা! রবীন্দ্রনাথের 'রাজা', 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন' ইত্যাদিতেও এই উপলব্ধির বিভা!

প্রজ্ঞার পক্ষে এবং সরস সাধনার পথেই চলেছি আমরা। বেদান্ত-সম্পর্কিত আলোচনায় স্বামীজী যা বলেছিলেন, তার একটি কথা এই যে, ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রলয়বর্ণনার মন্ত্রে, বেদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে বহিঃপ্রকৃতির মহান্ ভাবের বর্ণনা পাই বটে,—কিন্তু সে হোলো স্থূলেরই মহিমাবোধ! উত্তরকালে জড়ের মহিমা থেকে আমরা চিৎলোকে এলুম। কঠোপনিষদে এলো মৃত্যুজিজ্ঞাসা—বাহ্যজগৎ থেকে এই নিজের অন্তর্লোকে প্রবেশই প্রজ্ঞার অভিমুখে পদক্ষেপ। উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'ভারতে বিবেকানন্দ' [১৩শ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৫] থেকে বলা যাক্—'বেদান্ত' মানে কেবল অদ্বৈতবাদ নয়। বেদান্তী যাঁরা, তাঁরা 'প্রস্থানত্রয়' পড়ে, তবেই বেদান্তী হন।

দিব্যচেতনা (Divine consciousness) মোটেই আমাদের উপস্থিত মনের বোধ-বুদ্ধির মতন নয়। মানসিকতার চেয়ে দিব্যতা অনেক বিস্তীর্ণ ও বিচিত্রতর বিস্তার। মনকে এ বিষয়ে অবহিত হতে হয়। মন যে অনাবশ্যক তা নয়, কিন্তু দিব্যতা অন্য অবস্থা। শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথায়—"This doesn't mean that Mind has no place at all in the spiritual life; but it means that it cannot be even the main instrument much less the authority to whose judgement all must submit itself, including the Divine."[৬] অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবনের অগ্রগতিতে মন একটি গৌণ যন্ত্র। দিব্যনিয়ন্তা তার অনেক ওপরে। সেই স্তর থেকেই মন আলো পাবে—মন নিজের মাপকাঠি দিয়ে তাকে কি মাপতে পারে?

জগন্নাথের রথ! অন্তহীন বৈচিত্র্যের শোভাযাত্রা! অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে সেই রথচক্রের দাগ! শ্রীঅরবিন্দের কথা আলোচনা করতে গেলে ভারতের নীতিধর্মের প্রবাহ-সূত্রেই নানা ভাবনা ভিড় করে আসে। ভারতীয়

৬। পত্রগুচ্ছ—'অনামী' পৃ ২৬২ দ্রষ্টব্য।

ঐতিহ্য বলতে কী বোঝায়, সে বিষয়ে মন অনুসন্ধিৎসু হয়।

ইংরেজি 'ট্রাডিশন'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় 'ঐতিহ্য' শব্দের ব্যবহার চলে আসছে। রচনার ক্ষেত্রে, রূপ ও রীতির দিক থেকে কিংবা মনোভঙ্গি ও ভাবের দিক থেকে ঐতিহ্যের ধারায় বিশেষ বিশেষ রচনার প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে আলোচনা চলতে পারে। বাংলায় 'গতানুগতিক' বলতে যা বোঝায়, ইংরেজিতে কখনো conventional কখনো বা traditional বলে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়। রজার ফাউলার সাহেবের অভিধানে দেখা যায়—"**Tradition is a historical scheme made up of formal, stylistic and ideological attributes common to a large number of works over a long time.**"

'ভারতীয় ঐতিহ্য ও শ্রীঅরবিন্দের ভাবকর্ম' বললে আমাদের জাতীয় জীবনে জ্ঞানের ক্ষেত্র ও ভাবসাধনার অভিমুখীনতার বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গ মনে রেখে শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব উপলব্ধি ও আচরণের সম্পর্কটি বুঝে দেখার দায়িত্বের কথা এসে পড়ে। 'আর্য' কথাটি তাঁর প্রিয় কথাগুলির অন্যতম। তাঁর 'আর্য' পত্রিকার লেখাগুলির কথা মনে পড়ে। এই 'আর্য' হিটলারের আর্যভাবনার দৌরাত্ম্যবাচক শব্দ নয়। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত গ্রন্থে লিখে গেছেন যে, আনুমানিক হাজার-পাঁচেক বছর আগে উত্তর-পশ্চিম য়ুরোপ থেকে এশিয়া ভূখণ্ডে ইরান অঞ্চলে এসে যাঁরা বসতি স্থাপন করেন তাঁদেরই কয়েকটি দল ভারতে সিন্ধুনদের উপত্যকায় উপস্থিত হয়ে সেখানকার অধিবাসীদের যুদ্ধে পরাজিত করে সেখানেই বাস শুরু করেন এবং 'আর্যজাতি' পরিচিতি দিয়ে নিজেদের জাতি চিহ্নিত করেন। সেই নবীন আগন্তুকদলের অনেক আগে থেকেই ভারতে বাস করছিলেন যথাক্রমে দ্রাবিড় জাতির ও এক নিগ্রোবটু জাতির মানুষ। ইতিহাসে আর্য-অনার্য সংগ্রাম বলতে বোঝায় ঐ নবীন আগন্তুকদের সঙ্গে পূর্বাগত অধিবাসীদের সংঘর্ষ। নিগ্রোবটু জাতির লোকগুলি সম্ভবত ধীরে ধীরে দেশ থেকে সম্পূর্ণ সরে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু দ্রাবিড় জাতির সভ্যতা বেশ উন্নত ধরনের ছিল বলেই আর্যদল তাঁদের সঙ্গে রফা বা আপোষ করে নিতে বাধ্য হন। সে যাই হোক, ভারতের মানুষ গ্রামে ও বনভূমিতে নিজেদের সভ্যতা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আগন্তুক আর্যেরাও পশু-পালনে ও কৃষিকর্মে নিযুক্ত

থেকেছেন। উত্তরোত্তর যুদ্ধে হারিয়ে অনার্যদের মধ্যে যাদের তাঁরা বন্দী করে নিজেদের দাস করেন, তারা আর্যজাতির কায়িক শ্রমের দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়। এইভাবে দাস-প্রথা চালু হয়ে যায়।

প্রথম আগন্তুক আর্যদল ক্রমে পাঞ্জাব থেকে আরো পূর্বমুখে সরে গিয়ে,—গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরে অঙ্গ, মগধ, বিদেহ, কাশী, কোশল ইত্যাদি অঞ্চলে রাজত্ব করতে থাকেন। ইতিহাসের গতির বিশেষ প্রহরে নানা নগর ও জনপদের অভ্যুদয় ঘটে ভারতে। এদিকে প্রথম আর্যদলের পরে পশ্চিম থেকে আর একদল আর্য এসে ভারতে প্রবেশ করেন। শোনা যায়, তাঁরা ছিলেন পূর্বাগতদের চেয়ে উন্নত। তাঁরাই নাকি বেদের প্রবক্তা। প্রথমে সিন্ধুনদের তীরে ও পাঞ্জাব অঞ্চলে বসবাস করে গঙ্গা-যমুনার উৎপত্তিস্থলের কাছাকাছি জায়গায়—ঋগ্‌বেদের আমলে যাকে বলা হোতো 'ব্রহ্মবর্ত'—সেখানে তাঁদের রাজত্ব শুরু হয়। পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের আর্যদের মধ্যে আচার-আচরণের পার্থক্য চলে এসেছে সেই সুদূর অতীত থেকেই। আর্যদের 'মন্ত্র ও মন্ত্র-সংগ্রহ' অর্থাৎ 'সংহিতা' ইত্যাদি এবং 'ব্রাহ্মণ' ও 'উপনিষৎ' প্রায় দু হাজার বছর ধরে রচিত হয়। এরই নাম বেদ। বেদ একদিনের বা এক বছরের রচনা নয়। ঋগ্‌বেদের ১০২৮টি স্তব বা সূক্ত, সামবেদের ১৫৪৯টির মধ্যে অধিকাংশই ঋগ্‌বেদে পাওয়া যায়। কয়েকটি মাত্র নতুন, যজুর্বেদের স্তবগুলি গদ্য পদ্য দুই রীতিতেই রচিত, অথর্ববেদের সূক্ত-সংখ্যা ৭৩১টি। ঋগ্‌বেদই আদি বা উৎস, অন্যান্য বেদে সেই উৎসেরই বহুধাগতি, বহুবিচিত্র ব্যবহার। উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয় এবং উপনিষদগুলির সংখ্যা ১০৮ হলেও সেগুলির মধ্যে দশ-বারোটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[৭]

এ শুধু প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা। শ্রীঅরবিন্দ যে-অর্থে আর্য মনোধর্মের কথা বলেছেন সে হোলো যথার্থ ভূমাবোধ ও ঐক্য উপলব্ধির প্রবণতা ও চর্চা। আর্য চরিত্র বলতে বোঝাবে সেই ব্রহ্মবোধের চরিত্র। একদা উইলিয়ম আর্চার [William Archer] নামে এক পণ্ডিতের আলোচনায় ভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কটুভাষণ দেখে তার জবাবে ১৯১৮ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে 'আর্য' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ কটি নিবন্ধ লেখেন। সেইসব রচনায় প্রাচীন বৈদিক

৭। 'ভারত-সংস্কৃতি' [১৩৬৪]: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় [মিত্র ও ঘোষ] দ্রষ্টব্য।

সভ্যতার প্রশংসা করে তিনি লেখেন—প্রাচীন ভারতে সংসদীয় স্বাধীনতা-সংগঠনও ছিল না, যন্ত্রশিল্পের দিকেও ঝোঁক ছিল না বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য প্রতাপ ও তথাকথিত একচ্ছত্র সম্রাটের প্রতিপত্তির রাহুগ্রাসে ভারত কখনোই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়নি। সেই সূত্রে তখনকার য়ুরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে তিনি বলেন—"the self-styled democracy characteristic of the bourgeois or Vaisya period of the cycle of European progress"! ভারতবর্ষের যে সব পণ্ডিত প্রাচীন ভারতে আধুনিক গণতন্ত্র বিদ্যমান ছিল বলতে চেয়েছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের সে ধারণা সম্বন্ধে লেখেন—"this seems to me an ill-judged endeavour"। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল ভারতের নিজস্ব বিশিষ্টতার দিকগুলিই লক্ষণীয়। অতি প্রাচীন কালে ছিল কুলগত, অঞ্চলগত গোষ্ঠীবদ্ধতা,—কুলপ্রধান ছিলেন রাজবৎ, রাজার মতন ক্রমে রাজবংশ স্বীকৃত হয়ে বংশগত রাজক্রম দেখা দেয়; ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র বর্ণবিভাগ দেখা দেয় যথাকালে; কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজত্ব বা theocracy ঘটেনি। 'ঋষি'রা এলেন—"A peculiar figure for some time was the Rishi, the man of a higher spiritual experience and knowledge born in any of the classes."। ঋষির ভূমিকা তখন সামাজিক ও ধর্মগত ভাব-ভাবনায় অপরিসীম প্রভাবের ভূমিকা! পরে রাজতন্ত্র থেকে সাধারণতন্ত্রের দিকে ঝোঁক বাড়তে থাকে। রাজার চেয়ে ধর্ম বড়ো—"A greater Sovereign than the King was the Dharma, the religious, ethical, social, political, juridic and customary law originally governing the life of the people"। তিনি বলেন—There was no exclusive state religion and the monarch was not religious head of the people"। সম্রাট অশোকই প্রথম কতকটা রাজকীয় ধর্মের অনুশাসন দেশবাসীর ওপর আরোপের চেষ্টা করেন।

সমাজে বা ব্যক্তিগত ধর্মাচরণে স্বাধীনতা ছিল। সম্রাট একনায়ক ছিলেন না। তাঁর কাজ ছিল বিরোধের বদলে সমন্বয়ের রাজত্ব করা।

সমন্বয়, সমন্বয়, সমন্বয়—শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় ঐতিহ্যের এই দিকটি খুবই বিশেষভাবে দেখিয়েছেন। এই সমন্বয়-উপলব্ধি থেকেই ব্রহ্মবোধে যেতে হয়।

ব্রহ্ম বা বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিমনের পক্ষে বিনা তপস্যায় কতোটুকুই

বা ধারণা সম্ভব? দিব্য জীবন বা 'লাইফ ডিভাইন' অনেকের কাছেই একটি কথার কথা মাত্র। অপর পক্ষে. আমরা প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু যা জানি, সে তো আমাদের সীমিত ব্যক্তিমন মাত্র। শ্রীঅরবিন্দের উপলব্ধিতে মানব-মনের সম্ভাবনা সুদূর প্রসারিত। অধ্যাপক হরিদাস চৌধুরী তাঁর 'শ্রীঅরবিন্দের সাধনা' বইটির (প্রথম প্রকাশ, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪১, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯) দ্বিতীয় ভূমিকায় লেখেন—"অতিমানসবিজ্ঞান শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের একটি অভিনব তত্ত্ব। প্রাচীন ঋষিগণ এই তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া থাকিলেও ইহার পূর্ণ তাৎপর্য সম্বন্ধে এবং মানব-সভ্যতার বিবর্তনে ইহার প্রকাশ্য অভিব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ ধারণা ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করেন যে, এই অতিমানস বিজ্ঞান একদিন মানুষের জীবনে প্রকাশ্যভাবে সক্রিয় হইয়া দিব্যমানবের জন্ম দিবে।"

এই তত্ত্বটি সরল বাংলায় ব্যক্ত করতে গিয়ে অধ্যাপক চৌধুরী তাঁর ঐ বইয়ের অষ্টম অধ্যায়ের নাম দেন "মানস অধিমানস ও অতিমানস"। বইটির নবম অধ্যায়ের বিষয়: "অতিমানব বা দিব্য মানবের স্বরূপ"—এবং দশম অধ্যায়ের: "দিব্য মানবের জীবনযাত্রা"।

৩

'মন' বলতে যা সাধারণত বোঝা হয়, 'অতিমানস' মোটেই তা নয়। 'মন' আর 'অতিমন' দুটি পুরোপুরি আলাদা ব্যাপার নয় বটে, এবং অধ্যাপক চৌধুরীর কথায়—"প্রকৃতপক্ষে মনের সঙ্গে অতিমানসের পার্থক্য শুধু মাত্রাগত নয়, ধর্মগত—অর্থাৎ qualitative difference। মনকে বলা হয়েছে 'অবিদ্যাশক্তি'—বন্ধনীচিহ্নে ইংরেজিতে উল্লেখ করা হয়েছে—'The power of Ignorance; পক্ষান্তরে অতিমানসকে বলা হয়েছে 'বিদ্যাশক্তি' বা 'The power of knowlege'। তাঁর কথায়—"কিন্তু তাই বলিয়া আবার অতি-মানস বলিতে মনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত সমগ্র চেতন-ভূমিকেও বুঝায় না।" আর একটি বাক্যে বলা হয়েছে—"অতিমানস একদিকে যেমন মনের অতীত জ্ঞান-শক্তি অন্যদিকে আবার অনন্ত সত্তা, অখণ্ড জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দের নিম্নবর্তী সৃষ্টিশক্তি।" আবার পূর্বোক্ত মন ও অতিমানসের পার্থক্যের উল্লেখ করে লেখা হয়েছে—"কেহ যেন মনে না করেন যে ইহাদের মধ্যবর্তী ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য।' অর্থাৎ মনের সঙ্গেও তার যোগ আছে, সচ্চিদানন্দের সঙ্গেও যোগ আছে। 'মন' আর 'সচ্চিদানন্দ' তো সমার্থক নয়। শ্রীঅরবিন্দের ব্যবহৃত ইংরেজি

Supramentalisation শব্দটির বঙ্গানুবাদে 'অতিমানস রূপান্তর' প্রয়োগটি পাওয়া যায়। এই প্রতিশব্দগুলি বুঝে নেবার জন্তেই অধ্যাপক চৌধুরীর বই থেকে এখানে কয়েক ছত্র তুলে দেখা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন—"অখণ্ড সত্যানুভূতির আলোতে সমগ্র সত্তাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি—পরার্ধ (the upper hemisphere of existence) এবং অপরার্ধ (the lower hemisphere of existence)। যে সকল বিভিন্ন তত্ত্ব লইয়া সত্তা গঠিত তাহাদিগকে উপরোক্ত দুইটি ভাগে সাজান যাইতে পারে। ভাগবত সত্তার বিভিন্ন অঙ্গ ও শক্তি লইয়াই পরার্ধ গঠিত। পরার্ধে বিরাজ করে সৎ, চিৎ, আনন্দ এবং সচ্চিদানন্দের সৃজনী শক্তি ও আত্মপ্রকাশের অবলম্বন অতিমানস বিজ্ঞান বা তুরীয় শক্তি। অপরার্ধে অবস্থিত—অন্ন, প্রাণ, মন এবং ইহাদের ধারক ও নিয়ন্তা অন্তরাত্মা (soul or psyche), মানুষের স্তরে উপনীত হইলে যাহা পরিণত হয় চৈত্যপুরুষ রূপে (Psychic being)। মনের ঊর্ধ্বেও কতকগুলি স্তর আছে, যেমন উচ্চতর বা ঊর্ধ্বতন মন (Higher Mind), প্রবুদ্ধ মন (Illumined Mind), বোধিময় মানস বা প্রজ্ঞা (Intuitive Mind) এবং অধিমানস (Overmind)। অধিমানস অপরার্ধের শেষসীমা নির্ধারণ করে এবং ইহাই পরার্ধ ও অপরার্ধের সংযোগসূত্র।"

৫

এখানে চৈত্যপুরুষ, প্রবুদ্ধমন, বোধিময় মানস, অতিমানস এবং অধিমানস —অন্তত এই পাঁচটি বঙ্গানুবাদ পাওয়া গেল।[৮] ভারতের সনাতন ধর্মে ও আত্মসাক্ষাৎ প্রয়াসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এ রকম পর্যায়-বৈচিত্র্যের কথা সুপরিচিত, তবে ভাষাপ্রয়োগ এই রীতিতে ঘটেনি। আত্মজিজ্ঞাসার তৃষ্ণাও চাই,—কেউ একজন দেখিয়ে দেবার বুঝিয়ে দেবার মানুষও চাই—এই রকম উপলব্ধি জিজ্ঞাসুমাত্রেরই মনে জাগে। এই ভাবনাসূত্রেই গুরুর কথা

৮। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা, পৃঃ ৪০-৪১।

ওঠে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথামৃতের চতুর্থভাগে তোতাপুরীর বাঘ আর ছাগলের গল্প[৯] অনেকেই দেখেছেন। ব্যাধের বাণে এক বাঘিনীর মৃত্যুর পরে যে ছাগলের পালটিকে সে আক্রমণ করেছিল তাদেরই মধ্যে সেই বাঘিনীর বৎসটি পালিত হতে থাকে, প্রথমে ছাগমাতার দুধে, পরে ঘাস খেতে-খেতেই তার পুষ্টি হয়। কোনো জানোয়ার আক্রমণ করলে সেটা অন্যান্য ছাগলের মতোই ভয়ে দৌড় দেয়। একদিন এক বাঘ এসে পড়লো সেই ছাগলের পালে, আক্রমণকারী বাঘটা অবাক হয়ে দেখলো যে, ছাগলদের সঙ্গে একটা আসল বাঘও ঘাস খাচ্ছে। আগন্তুক বাঘ অন্য কাউকে না ছুঁয়ে সেই ঘাস-খেকো বাঘটাকে ধরলো। সেটা ভ্যা-ভ্যা করে উঠলো। তখন সেটাকে জলের কাছে নিয়ে গিয়ে সেই জলের দর্পণে তার নিজের মুখ দেখিয়ে, তার মুখে এক টুকরো মাংস গুঁজে দিয়ে বললে—ধিক্ তোকে। তুই বাঘ হয়েও আত্মবিস্মৃত ছিলি! কথামৃত-তে এই কাহিনীর এই ব্যাখ্যাটুকু লক্ষণীয়—"ঘাস খাওয়া কি, না কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকা। ছাগলের মত ভ্যা ভ্যা করে ডাকা আর পালানো—সামান্য জীবের মত আচরণ করা। বাঘের সঙ্গে চলে যাওয়া,—কিনা, গুরু যিনি চৈতন্য করালেন, তাঁর শরণাগত হওয়া, তাঁকেই আত্মীয় বলে জানা, নিজের ঠিক মুখ দেখা কি না স্বস্বরূপকে চেনা।"—এই সূত্রেই চিড়িয়াখানার সেই বাঘের রাগ মনে পড়ে দপ্ করে। বন্ধনের যন্ত্রণা এসব!

পূর্বোক্ত স্তরে স্তরে উন্মীলনের মধ্য দিয়েও আত্মজ্ঞান সম্ভব হতে পারে, আবার হঠাৎ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌লো—এরকমও ঘট্‌তে পারে। ভারতের সাধকরা এই রকমই বলে গেছেন। সংসারী লোকের পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের প্রসঙ্গও যথাযথ আক্ষরিক অর্থে গ্রাহ্য নয়। ওর মানে কামত্যাগ, বাসনাত্যাগ। নীলকণ্ঠ যাত্রাওয়ালার গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেন—"তিনি তোমার দ্বারা কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কাজ শেষ হলে তুমি আর ফিরবেনা। গৃহিণী সমস্ত সংসারের কাজ সেরে,—সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে—দাস-দাসীদের পর্যন্ত খাইয়ে-দাইয়ে—নাইতে যায়,—তখন আর ডাকাডাকি করলেও ফিরে না।"[১০] সেই রামকৃষ্ণেরই ভাষায় জ্ঞানের তত্ত্ব এইরকম—"অনেক জানার নাম অজ্ঞান,—এক জানার নাম জ্ঞান—অর্থাৎ এক ঈশ্বর সত্য

৯।' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত ৪র্থ ভাগ

১০। ঐ পৃঃ ২০৮।

সর্বভূতে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপের নাম বিজ্ঞান—তাঁকে লাভ করে নানাভাবে ভালবাসার নাম বিজ্ঞান।"[১১]

ভারতবর্ষের পথ শুধুই শাস্ত্রগত বিতর্কের পথ নয়, সে পথে রসের স্রোত বহতা—এবং সে তো 'রসের রসাতল' নয়—রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' থেকে এই ভয়ের দিকটা উল্লেখ করা গেল। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন, 'চতুরঙ্গে' তিনি বিড়াল-তপস্বীর আচারসর্বস্ব ভণ্ডামি ও বৈষয়িকতা দেখিয়েছেন, শচীশের অভিভাবকাশ্রিত ভাববাদী ঝোঁকও দেখিয়েছেন, জ্যাঠামশাই চরিত্রের কর্মযোগও দেখিয়েছেন। আবার ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'অভয়ের কথা' (১৩২২) বইখানিতে অতিশয় জটিল বেদান্তকথা ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 'কথারম্ভ' অধ্যায়েই লেখেন—"বোধ হয় বেদান্তই ভক্তির ভিত্তি হইবে।" জ্ঞান কর্ম, ভক্তি—সব পথই মনের গোচর, মনেরই গ্রাহ্য,—মননাশ্রিত। অর্থাৎ 'মন' থেকেই যাত্রারম্ভ।

শ্রীঅরবিন্দের ঐহিক অস্তিত্বের বিশেষ পরিবেশের সঙ্গে তাঁর দৃশ্যমান পরিবর্তনশীল মনের যে পরিচয় বিভিন্ন লেখকের লেখা জীবনীগুলিতে পাওয়া যায়, সে সব ক্ষেত্রে কেউ কেউ তাঁর জীবনের আগের পর্বের ঘটনা ও পরের পর্বের ঘটনার ক্রমানুসরণ না করে, অনেক সব ব্যবহিত ঘটনা পাশাপাশি সাজিয়েছেন। তাতে সময়-প্রবাহে তাঁর মনের ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য না থেকে, পাঠকের মনে এক বহুধাসমুজ্জ্বল ব্যক্তিপুরুষই প্রধান হয়ে ওঠেন। যশে দীপ্যমান মহাপুরুষদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এই ব্যাপার ঘটা অপ্রত্যাশিত নয়। যেমন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'ভূমাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ' লিখতে গিয়ে লণ্ডন পর্ব ও ভারত পর্ব একই ঝোঁকে অনুধ্যান করেছেন। ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের দেশে ফিরে তাঁর পত্নী স্বর্ণলতা ও পুত্র বারীন্দ্রকে খুলনায় নয়, (খুলনায় কৃষ্ণধনের নামে এখনো একটি রাস্তা আছে ; সেখানেই তিনি ডাক্তারী করতেন) দেওঘরে রেখে আসা,—ম্যাঞ্চেস্টার গ্রামার স্কুলে বিনয় ও মনোমোহনের ভর্তি হওয়া,—ড্রুয়েট-দম্পতির কাছে সাত বছরের বালক অরবিন্দের ল্যাটিন, ইংরেজি, ফরাশি, অঙ্ক ও ইতিহাস পড়া,—'ফক্স্ ফ্যামিলি ম্যাগাজিন'-এ অরবিন্দের একাধিক কবিতা প্রকাশিত হওয়া—এই সব ঘটনার

১১। ঐ পৃঃ ২০৯।

ঠিক পরের অনুচ্ছেদেই অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন—

বিষ্ণুভাস্কর লেলেকে অরবিন্দ বল্লে, আমি যোগ করতে চাই।

কেন? জিজ্ঞেস করলে লেলে।

সন্ন্যাস বা নির্বাণের জন্যে নয়, কাজ করবার জন্যে।

খুব ভালো কথা।

কিন্তু কিছু হচ্ছে না যে।

হবে। লেলে আশ্বাস দিয়ে বললে, তুমি কবি, তুমিই তো যোগী হবে। যোগ কবিদের পক্ষেই সহজলভ্য।

এর পরেই আবার বিলেতের প্রসঙ্গ এসে গেছে—'ম্যাঞ্চেস্টারে অরবিন্দদের আসার দু-তিন বছর পরেই ড্রয়েট সস্ত্রীক অষ্ট্রেলিয়ায় চলে যায়, অরবিন্দদের ভার পড়ে ড্রয়েট-জননীর উপর' ইত্যাদি,—তারপর, সেই ড্রয়েট-জননীই কাম্বারল্যাণ্ডে এক পাদ্রীদের আড্ডায় অরবিন্দকে নিয়ে যান,—অরবিন্দকে খ্রীষ্টান করবার আয়োজন ঘটে—ইত্যাদি।[১২]

৬

বিশেষ মনের সহজাত প্রবণতা এবং সেই মনের অধিকারী যিনি, তাঁর ক্রমগতি, দুইই দেখা দরকার। অরবিন্দের চরিত্রের নিজস্ব বীজ ছিল অন্তর্মুখীনতায়, কিন্তু জাগতিক পরিবেশ থেকে কখনোই তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন কি? সতর্ক বিচারবুদ্ধি জাগিয়ে বিরামহীন বিবর্তন দেখে গেছেন তিনি। সহজ ব্যবহারে যাকে 'জানা' বলে, সেই জানা-রই ক্রমাভিব্যক্তিতে প্রত্যয় রাখতে বলে গেছেন তিনি। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ঘোষের বাংলা অনুবাদে নীরদবরণের 'শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বাক্যালাপ'-এর মধ্যে অরবিন্দের এই কথাগুলি এখানে উল্লেখ করা দরকার—"যুক্তি অনেকগুলির ভিতর থেকে একটিকে সত্য বলে গ্রহণ করে, বাকিগুলিকে অসত্য বলে বর্জন করে। যেমন, 'নৈর্ব্যক্তিকতা' যদি সত্য হয় তবে 'ব্যক্তিকতা' অসত্য। কিন্তু মনের উপরে উঠলে

বোঝা যায় যে সত্য অনন্ত, এবং তার অসংখ্য দিক এবং সবগুলিই সত্য। অধিমানসে (overmind) সবগুলি মিলে এক অখণ্ড আকার নেয়।[১৩] বহুতলপ্লাবী চেতনার এই বিস্তার যিনি কিছুতেই দেখতে চান না, তাঁকে বিবর্তনবাদ, মনোবৈচিত্র্য, রুচিভেদ ইত্যাদি নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে-যেতেই এ-বিষয়ের সত্য-কে পেতে হবে। অভিব্যক্তি,—অভিব্যক্তি এবং অভিব্যক্তি—এই ক্রমগতির কি পূর্ণচ্ছেদ আছে?

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস ডারুইন এবং অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস যৌথ-ভাবে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ প্রকাশ করে যা জানান তার মূলকথা এই ছিল যে, সুদূর অতীতে বিদ্যমান স্বল্প সংখ্যক কয়েকটি জীব থেকেই বহুবিচিত্র জীবের অভিব্যক্তি ঘটেছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারাতেই জীবপুঞ্জের প্রকারভেদ সম্ভব হয়েছে। এই নিবন্ধগুলির আগেও কেউ কেউ অনুরূপ কথা বলেছিলেন, কিন্তু পাঠকসাধারণের দৃষ্টি এভাবে ইতিপূর্বে আর কখনো আকৃষ্ট হয়নি। প্রায় কুড়ি বছরের চিন্তার পরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ডারুইন তাঁর 'দি অরিজিন অফ স্পিসিজ' বই প্রকাশ করেন। তাতে এই ইঙ্গিত ব্যক্ত হয় যে, মানবজাতিও এই সাধারণ বিবর্তন-বিধির বহির্ভূত নয়। মানুষের দেহ-মনের পৃথক প্রতিটি বৃত্তি বা শক্তি স্তরে স্তরে বিবর্তিত হয়েছে।

ডারুইনের এক সম্পর্কিত ভাই—যাঁর নাম সার ফ্রান্সিস গ্যালটন,—তিনি 'ইউজেনিক্‌স্‌' বা সুপ্রজনবিদ্যা সম্বন্ধে ১৮৬৫ থেকেই ভাবতে ও লিখতে আরম্ভ করেন। শোনা যায়, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের আগে এই 'ইউজেনিক্‌স্‌' শব্দটিই চালু হয়নি। গ্যালটন এই শব্দের মধ্য দিয়ে এই ধারণা সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন যে, উত্তরপুরুষের শারীরিক মানসিক যা কিছু ব্যাপারের ভবিষ্যতে উন্নয়ন বা অবনয়ন ঘটতে পারে, সেসবই সুপ্রজনবিদ্যার এলাকাভুক্ত।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয়ক্ষেত্রেই অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ধারায় মানুষের অস্তিত্বের প্রসঙ্গ বিভিন্ন চিন্তা জাগিয়েছে। ব্যক্তি ও সমাজ,—রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি,—সাম্য ও বৈষম্য,—জড়বাদ ও অধ্যাত্মভাবনা ইত্যাদি বিষয় বর্তমানকালে কোনো বিশেষ দেশ বা জাতি বা ব্যক্তির একান্ত সম্পত্তি নয়। সংস্কৃতির বিস্তার যতোই ঘটবে, মানুষের আত্মানুসন্ধান ততোই বাড়বে;

বাড়বে বই কমবে না। আগে বলা হয়েছে—শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'লাইফ ডিভাইন'-এর প্রথম খণ্ডের প্রথম সূচনাতেই মানবিক আস্পৃহার কথা তুলেছেন এবং এই বইয়ে উত্তরোত্তর জড়বাদ, সন্ন্যাস, সর্বত্রভাস্বর সত্য, ব্যক্তির নিয়তি, বিশ্বে মানুষের স্থান, অহং ও দ্বৈতভাবনাসমূহ, বেদান্ত-জ্ঞানের প্রণালী ইত্যাদি চিন্তার অনুসরণে পৃথক পৃথক অধ্যায় রচিত হয়েছে। 'মন ও অতিমানস' নামে এই বইয়ের আঠারোর অধ্যায়ের শুরুতেই তিনি তৈত্তিরীয় উপনিষদ ও গীতা থেকে দুটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য উল্লেখ করে আলোচনায় এগিয়েছেন তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলেন—মনই ব্রহ্ম; গীতা বলেন—ব্রহ্ম অবিভাজ্য, কিন্তু মনে হয় সে যেন সত্তায় সত্তায় বিভক্ত। অতিমানসিক অস্তিত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে এগিয়ে, এই অধ্যায়ে পৌঁছে অরবিন্দ অতঃপর আরো এগিয়ে গেছেন। দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ থেকে ভাগবতী চেতনার স্বাদ পাওয়া কি সহজ কথা? কিন্তু ডারুইন যেমন আদিস্তরের জীব থেকে মানুষের মতন বিস্ময়কর জীবস্তর অবধি বিবর্তনের ধারাটিতে ধ্যানস্থ ছিলেন, অরবিন্দও তেমনি চেতনার ঊর্ধ্বগতি সম্বন্ধে দিব্যচেতনার ধ্যান ছাড়েন নি।

আমরা অনেক সময়ে হালকা কথাবার্তার মধ্যেও মন, আত্মা, চৈতন্য, মায়া ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু তিনি সেভাবে শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। ভারতের ঐতিহ্য এবং বিশ্বের চিন্তা—দুইই তিনি অনুসন্ধান করেছেন। 'দি লাইফ ডিভাইন'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগে যথাক্রমে ২৩ ও ২৪-এর অধ্যায়ে তিনি মানুষ ও বিবর্তন—এবং আধ্যাত্মিক মানুষের বিবর্তন,—এই দুটি প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেছেন।

এই সূত্রে মনোরহস্য সন্ধানে সংখ্যাতীত প্রয়াসের কথা স্বীকার্য। 'মাইণ্ড—ইট্‌স্ মিষ্ট্রিজ অ্যাণ্ড কণ্ট্রোল' নামে স্বামী শিবানন্দের বইটি এই ধরনের এক নমুনা। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে টেহরি-গাড়োয়াল জেলার শিবানন্দনগর থেকে তার অষ্টম সংস্করণ প্রকাশ করেন 'দি ডিভাইন লাইফ সোসাইটি'। তার আদিতেই দেখা যায়, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাইয়ের একটি চিঠিতে 'ধীরেন্দ্র'-কে শিবানন্দ লেখেন—'মনকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করো। বাসনা ধ্বংস করো। বাসনা গেলে মন তোমার ক্রীতদাস হবে। বাসনাহীন হও এবং বিজয়ী হও।' ভুক্তভোগীর যন্ত্রণাবোধ দিয়ে স্বামী শিবানন্দ মনকে দমন করবার পথ জানিয়ে গেছেন তাঁর এই ইংরেজি বইটিতে। বাইরের বস্তু, নিজের বাইরের কোনো সামগ্রীই মানুষকে

স্থায়ী সুখ দিতে পারে না। যা অন্তরাত্মার বোধ জাগ্রত করে, সেরকম ব্যাপারই স্থায়ী সুখদাতা, সেই সুখের নাম 'আনন্দ'। আত্মার প্রকৃতিই হোলো আনন্দ-স্বরূপতা। মন যতোক্ষণ বহির্মুখী থাকে, আত্মসাক্ষাৎকার ততোক্ষণ অসম্ভব। লক্ষ্যে মনঃসংযোগ ও ধ্যানই আমাদের অভিপ্রেত আনন্দের পথ। ইন্দ্রিয়ের দংশন থেকে আত্মরক্ষা করা চাই। বইটির প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বাক্যেই বলা হয়েছে—যা তোমাকে ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তারই নাম 'মন'—'That which separates you from God is mind.'। এই শিবানন্দের মতে সাধারণ মানুষ মনের তত্ত্ব কিছুই জানেনা। পাশ্চাত্ত্য মনস্তত্ত্ববিদরা কিঞ্চিৎ জানেন বটে। পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীরাও জানেন কতকটা। এঁরা মনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেরুদণ্ড, স্নায়ুতন্ত্রী, মস্তিষ্ক ইত্যাদির কাজ দেখতে পান। কিন্তু ধ্যানী যোগী যাঁরা, তাঁরাই তাঁদের চেয়ে বেশি জানেন। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক উল্লেখ করে মনকে প্রকৃতির অঙ্গীভূত বলা হয়েছে। ঐতরেয় উপনিষদ ১-৩-৪ উল্লেখ করে বলা হয়েছে—সমাধি-অবস্থায় যোগসাধকের মন তার আদি-আসন 'প্রাণে' আশ্রয় পায়। ব্রহ্মা বিশ্ব সংরক্ষণের জন্যেই জল থেকে পুরুষ বা হিরণ্যগর্ভ যিনি, তাঁকে আহরণ করে তপস্যার উত্তাপ দিলেন। সেই তাপে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হোলো। সেই হৃদয় থেকেই মন-এর অভ্যুদয় এবং মন থেকেই এলেন মনের অধীশ্বর চন্দ্র। যিনি হিরণ্যগর্ভ, তিনিই কার্যব্রহ্ম ও সম্ভূতি—অর্থাৎ সকল মনের সমাহার সেই বিশ্বমানসের সঙ্গে গ্রথিত। জীবমন তারই সঙ্গে জড়িত। জীবমানস পরস্পরের ভাবপ্রবাহের সংবাহী। দূর ও নিকট, জীবিত ও মৃত—সকল ব্যক্তির মনে মনে যোগ অবশ্যম্ভাবী। শিবানন্দ এই কথাই জানিয়েছেন।

মাতৃসাধনার আদর্শ শ্রীঅরবিন্দ এদিক থেকেও দেখিয়ে গেছেন। তাঁর ইংরেজিতে লেখা 'দি মাদার' বইটির আদিতেই তিনি যা লিখেছেন, তার বঙ্গানুবাদে এই দাঁড়ায়ঃ আমাদের দুরূহ প্রয়াসের যা লক্ষ্য—নিচে থেকে ওঠা সেই স্থির ও অব্যর্থ আস্পৃহা এবং তারই উত্তরপ্রদাতা ওপরের ঐশী মহিমার অবতরণ। কিন্তু সেই পরমা শক্তি কাজ করতে পারেন কেবল 'আলো' আর 'সত্য', এই দু'য়ের শর্তে; মিথ্যা ও অজ্ঞান আরোপিত থাকলে তার উদয় অসম্ভব। কারণ, মিথ্যার দাবির কাছে নত হলে সে-উদ্দেশ্য বিফল হয়ে যায়। সেই আলোক ও সত্য—তিনি যাকে বলেছেন 'লাইট' ও 'ট্রুথ'—তারই মধ্যে

সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির অবতরণ সম্ভব—এবং তার নাম দিয়েছেন 'হায়েস্ট সুপ্রামেণ্টাল ফোর্স' অর্থাৎ সর্বোচ্চ অতিমানসিক শক্তি। সেই শক্তির কাছে পূর্ণ সমর্পণ চাই। তাকেই তিনি দিব্য শক্তি বলেছেন। মানসিক স্তরের, প্রাণস্তরের ও দেহস্তরের যেসব শক্তি ও মায়া অদ্যাবধি এই পার্থিব প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করছে, সেইসব পরিবেষ্টনী-প্রভাব পরিহার করতেই হবে। একমাত্র সেই অতি-মানসিক শক্তিই দৈহিক বা জৈব স্তরের অসুবিধাগুলি ধ্বংস করতে পারে।

তাঁর ঐ পুস্তিকাতেই তিনি লিখে গেছেন যে, যে-মন নিয়ে আমরা আছি এখন, শুধু সেই মনই সমর্পণের তত্ত্ব বুঝলে চলবে না, উচ্চতর-মন তা মানলেই চলবে না,—এমন কি অন্তর্লীন প্রাণশক্তির সমর্পণ ঘটা এবং শারীরিক-বাহ্যিক চেতনার পক্ষে তার প্রভাব বোঝাটাও যথেষ্ট নয়; সর্বপ্রকার সন্দেহ-সংশয়-অস্পষ্টতা, সর্ববিধ প্রত্যাখ্যান ও বিদ্রোহ বা প্রচ্ছন্ন প্রতিকূলতা তাড়াতে হবে। ঐশী করুণা কিছুতেই পায়ে ঠেল্‌লে চলবে না। নিজেকে সেই করুণার অধিকারী করে তোলা কোনোরকম আংশিক সমর্পণের কাজ নয়। আমাদের অনেক দিনের আদর্শ—বিশ্বাসে মিলয়ে তাঁরে, তর্কে বহুদূর—প্রবচনটি মনে পড়ে। ঐশী শক্তি তোমার জন্যে সবকিছুই করে দেবেন—এমন কি তোমার সমর্পণও,—এ-বিভ্রম পরিহার্য। শ্রীঅরবিন্দ বলেন—স্বকৃত ও স্বাধীন হোক্ সমর্পণ; সমর্পণ কখনোই অকর্মক নয়, নিষ্ক্রিয় ব্যাপার নয়। সে তো সকর্মক, সক্রিয়, প্রসন্ন, সবল, সহায়ক। পূর্ণ সমর্পণই যথার্থ সত্যসন্ধানীর পথ। ঐশী শক্তির সেই আহ্বান নিরন্তর বেজেই চলেছে। তবে, তিনি জোর করে কিছুই আরোপ করেন না।

চিন্তাস্রোতের এই ঢেউ খেতে খেতে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' [১৯০১] বইয়ের 'বোঝাপড়া', 'অচেনা', 'তথাপি' প্রভৃতি কবিতা মনে পড়ে। প্রথমটির শুরুতেই তিনি লেখেন—

মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

এই কবিতাতেই তিনি আরো লেখেন—

তোমার মাপে হয়নি সবাই
তুমিও হও নি সবার মাপে
তুমি মরো কারো ঠেলায়
কেউ বা মরে তোমার চাপে—

তবু ভেবে দেখতে গেলে
এমনি কিসের টানাটানি
তেমন করে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।

অরবিন্দের বরোদা-পর্ব তখন চলছে। রবীন্দ্রনাথের এ-কবিতা সেই পর্বের রচনা। কিন্তু আজকের জনবিস্ফোরণে ক্ষতবিক্ষত অনুন্নত বা উন্নয়নকামী ভারতবর্ষে মানুষের রোমান্টিক মেজাজই যখন বিগ্‌ড়ে গেছে, তখন 'এমনি কিসের টানাটানি' শুনলেই কেউ কেউ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারেন; কিন্তু ক্ষিপ্ততার ফসল তো ব্যর্থতা! বিপ্লব কি সহজ সাধনা? সত্যিকার সহজিয়া হওয়া কি সহজ কর্ম? অরবিন্দ লিখে গেছেন—জগতে যা কিছু ঘটে, সকলেরই অন্তরালে সেই শক্তির মধ্যস্থতায় দৈবেরই অভিব্যক্তি। কিন্তু নিম্নস্তরে তিনি তাঁর যোগমায়ার গুণ্ঠনে নিজেকে ঢেকে রেখে জীবের জৈবসত্তার মধ্য দিয়েই কাজ করে যান। যোগেও সেই ঐশী শক্তিই সাধিকা ও সাধনা; শক্তি নিজের আলো, সামর্থ্য, জ্ঞান, চেতনা, আনন্দ নিয়ে আধারের ওপর কাজ করে—সেই আধার যখন উন্মুক্ত হয় তখন তাতে শক্তি প্রবাহিত হয়ে সাধনা সম্ভব করে তোলে। যতক্ষণ নিম্নপ্রকৃতির কাজ চলতে থাকে, ততক্ষণ সাধকের নিজস্ব চেষ্টা অবশ্যই থাকা চাই। সেই ব্যক্তিগত প্রয়াসের ত্রিধারা দেখাতে গিয়ে তিনি লেখেন—আস্পৃহা, বর্জন ও সমর্পণ—নিত্যজাগ্রত, নিত্যস্থায়ী, বিরামহীন মনের সংকল্প এবং প্রাণের সন্ধান—প্রাণময় সত্তার ঊর্ধ্বগতি, দেহচৈতন্য ও প্রকৃতিকে নমনীয় করে উন্মোচনের প্রয়াসই সেই আস্পৃহার নিদর্শন; নিম্নসত্তার গতি, মনের ভাব, মত, পছন্দ-অপছন্দের দিক, অভ্যাসকামনা, স্বার্থসন্ধান, গর্ববোধ, দেমাক, লোভ, হিংসা ইত্যাদি বর্জন-ই হোলো অভীপ্সিত বর্জন—যাতে ভেতরের আধার পরিশুদ্ধ হয়;—গোঁয়ার্তুমি, আলসেমি, বোকামি, সন্দেহ, অবিশ্বাস, তমোভাব ইত্যাদি কেটে গিয়ে আলোক, শক্তি আর আনন্দ এসে যে দেহ ক্রমেই ঐশী মহিমার উপযুক্ত হয়ে উঠছে, তাতে আরো বলাধান ঘটাতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত 'অচেনা' কবিতায় দেখতে পাই—

মন নিয়ে কেউ বাঁচে নাকো,
মন বলে যা পায় রে
কোনো জন্মে মন সেটা নয়
জানে না কেউ হায় রে।

ওটা কেবল কথার কথা,
মন কি কেহ চিনিস ?
আছে কারো আপন হাতে
মন বলে এক জিনিস ?
চলেন তিনি আপন চালে,
স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে
কেই বা তাঁরে দিচ্ছে এবং
কেই বা তাঁরে নিচ্ছে !

সমর্পণ চাই, চেতনার সকল স্তরেই এই সমর্পণের চেষ্টা অবশ্যই চলছে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সাধকের নিজের চেষ্টা বন্ধ করলে চলবে না। রাতারাতি হঠাৎ-প্রাপ্তির দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। তন্ত্রের পথ, অদ্বৈতবেদান্তের ভাবনা—এদের মধ্যে সত্যিকার ধর্তব্য বিরোধও নেই। 'দি মাদার' পুস্তিকাতেই তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনাতে অরবিন্দ লেখেন, কেবল দুটি সামগ্রী চাই—দিব্যা জননীর করুণা একদিকে, অন্যদিকে সাধকের অন্তরের বিশ্বাস, আন্তরিকতা ও সমর্পণ। একথা একমাত্র তাঁরই কথা নয়। অনুরূপ কথা অনেকে বলে গেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে আর্থিক বলের কথাও আছে। প্রাণ ও দৈহিক বাসনার স্তরে বহির্জীবনের পূর্ণতার জন্যে টাকা অবশ্যই এক স্বীকার্য শক্তি। কিন্তু টাকার ক্ষেত্রে নিম্নপ্রকৃতির আসুরিকতা থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। তাঁর নিজের ভাষায়—power, wealth, sex,—এই তিন আসুরিক আকর্ষণ অতি বৃহৎ বাধা। কিন্তু যাঁরা বলেন অর্থমনর্থং, অরবিন্দ এই অধ্যায়েই তাঁদের চিন্তার বিপক্ষে গিয়ে লেখেন—ওরকম চিন্তা প্রমাদ! সংকীর্ণ আত্মার্থে নয়,—রাজসিক আসক্তিতেও নয়,—মায়ের সেবার জন্যেই টাকার প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার মেনে নিতে হবে। টাকার কাঙাল হয়ে মনকে বিক্ষুব্ধ বা চঞ্চল রাখলে চলবে না। কামহীন কাঞ্চনে আপত্তি কিসের? ওই পুস্তিকার পঞ্চম ও পরবর্তী অধ্যায়গুলিতেও একই সর্বসমর্পণের নির্দেশ পাওয়া যায়। বিপ্লবী, কবি ও যোগী, অরবিন্দ যে একই ব্যক্তি,—এইসব পরিচিতি যে তাঁর একই সত্তার সমান্তরাল অথচ ঐক্যাভিমুখী গতি,—পূর্ণ বিবেচনা ও সশ্রদ্ধ অনুভব ব্যতিরেকে সেই সত্যটি কি কখনো বোঝা যায়? তিনি লেখেন—"If you want to be a true doer of divine works, your first aim must be to be totally free from all

esire and self-regarding ego. All your life must be an ffering and a sacrifice to the Supreme; your only object n action shall be to serve, to receive, to fulfil, to become manifesting instrument of the Divine Shakti in her vork. You must grow in the divine consciousness till here is no difference between your will and hers, no notive except her impulsion in you, no action that is not er conscious action in you and through you."[১৪] এই নির্দেশের ঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত'-এর ['উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে ১৩০৫-০৬ ও ১৩০৬-০৭ সালে ধারাবাহিকভাবে ও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত] শেষ বক্তব্য প্রসিদ্ধ 'স্বদেশমন্ত্র' রচনাটির যে বাণী বিশেষভাবে মনে পড়ে, সেটি হোলো—"ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।" তাঁর ঐ বাংলা লেখাটির প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর পরে তাঁর উপলব্ধিই অরবিন্দ নিজের উপলব্ধি বলে মেনেছিলেন। তিনি যখন সশস্ত্র বিপ্লবের দলে ছিলেন, তখন, এবং তিনি যখন পূর্ণযোগী হয়ে ওঠেন, তখনো, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি-মেথরদের তাঁর মনুষ্যধর্ম-সাধনার বাইরের সামগ্রী বলে দূরে রাখেন নি। তাঁর 'দি আইডিয়াল অফ্ হিউম্যান ইউনিটি'র মধ্যে তিনিও বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' [প্রথমে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ১৩০৬-৮ সালে প্রকাশিত] চিন্তাধারা নিজের কালের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে আরো বিস্তৃতভাবে ভেবেছেন,—লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' ইত্যাদি লিখেছিলেন, বিবেকানন্দেরও তেমনি 'পরিব্রাজক' ছিল। কিন্তু সেসব সাদৃশ্যের প্রসঙ্গ এখানে স্থগিত থাক্। যেটা বিশেষভাবে ভাববার কথা, সে হোলো অরবিন্দের মাতৃসাধনার উৎস ও বিকাশ। বেদান্তের অদ্বৈতব্রহ্ম আর তন্ত্রের 'মহামায়া' তাঁর ধ্যানে অভেদ উপলব্ধি হয়ে ওঠে।

৭

আমাদের গত শতকের সাধকদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে আমাদের ভাব ও কর্মের নিত্য সম্পর্ক মানতেই হয়, সেই রামমোহন, রামকৃষ্ণ ও তৎশিষ্য বিবেকানন্দ এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন তন্ত্রপথে অনুপ্রেরিত।

অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত ইংরেজিতে লেখা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যবৃন্দ প্রণীত স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীর ১৯৪৯-এর সংস্করণের প্রথম অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকথা আছে। তার তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের প্রেম এবং শঙ্করের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—একদেহে এই গুণের আধার ছিলেন রামকৃষ্ণ।[১৫] ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি হুগলী জেলার কামারপুকুরে তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তার বছর-তিনেক আগে ব্রিষ্টলে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়ে গেছে।

রামমোহন থেকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ,—বিবেকানন্দ,—বিবেকানন্দের গুরুভাই অভেদানন্দ,—সমকালের অন্যান্য সাধুসন্ত, তৎপরে শ্রীঅরবিন্দ—এঁদের সাধনা এ দেশে উনিশ শতকে বেদান্তের ব্যাপক পুনর্বিকাশের দৃষ্টান্ত। জগৎ বহুধা বিস্তীর্ণ। কিন্তু মূলে যেমন, অন্তেও তেমনি কেবল অদ্বিতীয় একই বিদ্যমান—এই হোলো বেদান্তের শিক্ষা—এরই নাম কেবলাদ্বৈতবাদ। আঠারোর শতকের রামপ্রসাদের মতন রামকৃষ্ণও ছিলেন মাতৃসাধক। সন্তান ও জননীর দ্বৈতবোধ কি বেদান্তবোধ? পণ্ডিতরা অনেকে অনেক কথা বলেছেন। বৈষ্ণব-দার্শনিকরা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদ ইত্যাদি ইশারা রেখে গেছেন। এখানে এবিষয়ে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণের পিতা ও মাতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রমণি দেবী ছিলেন সাধু স্বভাবের মানুষ। শৈশবে তাঁর ডাক নাম ছিল গদাধর। পোষাকী নাম রামেশ্বর। গদাধরের বড়ো ভাই রামকুমার কলকাতায় এসে একটি টোল স্থাপন করেন। বাল্যকালে গদাধর এসে ওঠেন দাদার কাছে। কিন্তু সেকালের সেই গতানুগতিক বিদ্যা-শিক্ষা তাঁর অন্তরাত্মা মানেননি। লোকে যাকে বলে রুজি রোজগারের বিদ্যা, সে বিদ্যায় তাঁর দরকার নেই—রামকুমারকে গদাধর নিজেই সেকথা জানিয়েছিলেন। স্মৃতি-ব্যাকরণ-সাহিত্য-শাস্ত্রের পণ্ডিত হবার ইচ্ছেই ছিল না তাঁর।

গঙ্গার পূর্বপারে কলকাতা থেকে সামান্য কয়েক মাইল উত্তরে সুরম্য দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালী-মন্দির হয়েছে তখন। রাসমণির জামাই মথুরানাথ বিশ্বাস তাঁরই সম্পত্তির ম্যানেজার ছিলেন। রামকুমার সেই মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হন এবং ছোটো ভাই গদাধরকে সঙ্গে আনেন। তখন থেকে মাত্র বারো বছরের মধ্যেই রামকৃষ্ণ কালী-মন্দিরের পূজারীর পদ থেকে,—ভক্তির গভীর আবেশ থেকে, ক্রমে ঈশ্বরের অবতার বলে পরিচিত হন। দিনে পূজা-প্রার্থনা-গান, ভাবাবেশে গঙ্গাতীরে পদচারণা, আর রাত্রে ধ্যান, ধ্যান, ধ্যান—একজন ভাবুকের ঈশ্বরোপলব্ধির এই ব্যাকুলতা,—এই তপস্যাই পূর্বগামী রামপ্রসাদী ভাব ছুঁয়ে থেকে বিচার-বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যবহারিক বেদান্তবাদের দিকে শিক্ষিত ভারতবর্ষের মনের পথ প্রশস্ত করেছিল।

মথুরানাথ নাকি গোপনে রামকৃষ্ণকে বাজিয়ে নেবার জন্যেই তাঁকে কামাকর্ষণে বিভ্রান্ত করবারও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু একমাত্র দিব্যজননীর ভাব ছাড়া অন্য কোনো ভাবেই মেয়েদের দিকে রামকৃষ্ণের মনের অভিমুখিতা ঘটেনি। আলোচ্য ইংরেজি বইটিতে বলা হয়েছে যে, মাতৃদর্শনের ("First vision of the mother") প্রথম আঘাতে তাঁর শরীরে নানা অসুখ দেখা দেয়। তাঁর নিজের মায়ের কথামতন কামারপুকুরে ফেরেন তিনি এবং আত্মীয়স্বজনের চেষ্টায় সন্নিহিত গ্রামেরই বালিকা-কন্যা সারদা দেবীর সঙ্গে তার পরিণয় ঘটে। এই বিবাহে তিনি সোজাসুজি সম্মত হন।

স্বামী সারদানন্দের প্রসিদ্ধ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' প্রথম ভাগে রামকৃষ্ণের পিতৃপরিচয় ও অন্যান্য বৃত্তান্ত বিশদভাবে দেওয়া হয়েছে। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় সম্ভবত ১১৮১ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবার ছিলেন রামচন্দ্রের উপাসক। ক্ষুদিরামের প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয় খুবই অল্প বয়সে। দ্বিতীয়া পত্নী চন্দ্রমণির (জন্ম ১১৯৭ সাল?) প্রথম সন্তান রামকুমার (জন্ম ১২১১), দ্বিতীয়টি কন্যা, নাম কাত্যায়নী (জন্ম ১২১৬?), তৃতীয় রামেশ্বর (জন্ম ১২৩২)। জমিদার রামানন্দ রায়ের এক মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সম্মত না হওয়ায় ক্ষুদিরাম স্বগ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়ে বন্ধু সুখলাল গোস্বামীর আমন্ত্রণে কামারপুকুরে গিয়ে নতুন বাসস্থান পান।

স্বামী সারদানন্দের এই বইটিতে অজস্র লৌকিক-অলৌকিক কাহিনী সহযোগে যা বলা হয়েছে, তা থেকে চট্টোপাধ্যায়-পরিবারের নানা সৎগুণ ও ধার্মিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। রামকুমারের কিছু অলৌকিক শক্তি ছিল।

ক্ষুদিরাম ভূতযোনিত বিশ্বাস করতেন। বারাণসী প্রভৃতি তীর্থভ্রমণ করে
ছিলেন তিনি। দীর্ঘ জীবন ধর্মপথে কাটিয়ে, কন্যা কাত্যায়নীর অসুস্থত
নিরাময়ের উদ্দেশ্যে সম্ভবত ১২৪১ সালের চৈত্রমাসে তিনি গয়াতে পিতৃপুরুষে
পিণ্ডদান করতে যান এবং ১২৪২-এর বৈশাখে কামারপুকুরে ফেরেন। ক্ষুদিরা
এবং তাঁর পত্নী উভয়েই স্বপ্নদর্শনে বুঝতে পারেন যে, অলৌকিক শক্তিধ
কোনো মহাপুরুষ তাঁদের সন্তান হয়ে ভূমিষ্ঠ হবেন। ১২৪৮ সালের ৬ই ফাল্গু
বুধবার এই সন্তান গদাধরের জন্ম হয়। শৈশবেই তিনি ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির
পুরাণ-কথা ও যাত্রাগান শোনা—এবং দেবদেবীর প্রতিমা গড়ার কাজে তাঁ
মন প্রসন্ন থাকতো। গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ ক্ষেত্রে
তীর্থযাত্রী সাধু-সন্ন্যাসীদের এক পান্থশালায় অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে সে
কৈশোরেই তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়। আট বছর বয়সে বিশালাক্ষী মন্দিরে
যাবার পথে তিনি একদিন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। ঠাকুর রামকৃষ্ণই তাঁর শি
স্বামী বিবেকানন্দকে ব্যক্তিগত মুক্তি-কামনা থেকে সরিয়ে লোকহিতের কাজে
লাগিয়েছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পরে দেশে
১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন খুবই স্মরণীয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগোতে
বিবেকানন্দ বিশ্বধর্মসভায় ভারত-সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের মহিমা সম্বন্ধে যথ
আলোচনা করেন, অরবিন্দ ঘোষ তখন বিলেত থেকে দেশে ফেরেন
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাই-ই,—এ-বোধ তৎপূর্বেই তাঁর প্রত্যয়ে পরিণত
ধর্ম এবং কর্ম দুয়ের উজ্জ্বল প্রবাহ চলতেই থাকে। তার প্রায় দ
বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮২তে তাঁর 'আনন্দমঠ' প্রকাশ করে শক্তিপূজা
কথাই দেশের মনে বিশেষ ভাবে পৌঁছে দেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে
কথাও ছিল তাতে। অরবিন্দের শক্তিপূজার সঙ্গে তার যোগ অস্বীকা
করা যায় না। বিপিনচন্দ্র পাল ইংরেজিতে অরবিন্দের যে চরিত্রচিত্র রেখে
গেছেন তাতে দেখা যায়—"Aravinda has a small family an
practically no cumulative obligations. His only care is fo
his country—the Mother, as he always calls her."[১৬]

১৬। Character Skctches : ১৯৫৭ ; পৃষ্ঠা ৭৯-৯৫ দ্রষ্টব্য।

৮

সাধকদের ব্যক্তিগত জীবনের পৃথক পৃথক তথ্য খুঁজে দেখবার চেষ্টা কম হয়নি। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ যেমন,—রামমোহনও তেমনি খুবই তেজস্বী সাধক ছিলেন। এঁদের মধ্যে যুক্তি ও ভক্তি—দুই পথেরই চিহ্ন আছে।

বাংলার তথা ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য যুগোপযোগী কর্মসাধনার পথে প্রবাহিত হতে দেবার মূলে এঁরাই ছিলেন। তন্ত্রশক্তির প্রেরণাতেই এটা সম্ভব হতে পেরেছিল। অলৌকিক শক্তির ঐশ্বর্যে এঁরা প্রত্যেকেই আমাদের জাতীয় পুনর্গঠনের নেতৃত্ব করে গেছেন। কাজেকাজেই এঁদের বিচ্ছিন্ন অবস্থান নয়,—এঁদের ঐকান্তিক ভাবগত যোগসূত্রগুলি ভেবে দেখা দরকার। অরবিন্দের একটি ছোটো ইংরেজি কবিতা এইসূত্রে এখানে তুলে দেখা যেতে পারে—

The Cosmic Dance

Dance of Krishna, Dance of Kali

Two measures are there of the cosmic dance.
    Always we hear the tread of Kali's feet
Measuring in rhythms of pain and grief and chance
    Life's game of hazard terrible and sweet:
The ordeal of the veiled Initiate,
    The hero soul at play with Death's embrace,
Wrestler in the dread gymnasium of Fate
    And sacrifice a lonely path to Grace.
Man's sorrows made a key to the Mysteries,
    Truth's narrow road out of Time's wastes of dream
The soul's seven doors from Matter's tomb to rise,
    Are the common motives of her tragic theme.
But when shall Krishna's dance through Nature move,
His mask of sweetness, laughter, rapture, love?[১৭]

স্বাধীন অথচ ভাবের দিক থেকে মূলের অনুগত বঙ্গানুবাদে এটি এই রকম দাঁড়ালো—

বিশ্বনৃত্য

কৃষ্ণনৃত্য, কালীনৃত্য

দুটি তাল আছে বিশ্বনৃত্যের
আমরা নিত্যই শুনি কালীর পদধ্বনি
যন্ত্রণা আর কষ্ট আর কপাল—
বিপজ্জনক ভয়ঙ্কর মধুর লীলা এই জীবনের।

অবগুণ্ঠিত শক্তির ইচ্ছাধীন অগ্নিপরীক্ষা সব;
বীরের আত্মা মরণের আলিঙ্গনে প্রেরিত।
নিয়তির ভয়াল মল্লস্থলে পালোয়ানের ভূমিকা
এবং করুণার অভিমুখে ত্যাগ এক জনহীন পথ।

মানুষের দুঃখ থেকেই রহস্য-উদ্‌ঘাটনের চাবি বানানো হোলো।
কালের অপচিত স্বপ্ন থেকে বেরিয়ে এলো সত্যের সংকীর্ণ পথ।
জড়ের সমাধি থেকে আত্মার সপ্তদ্বার জেগে উঠবে
—এই হোলো তাঁর বিষাদগম্ভীর কাহিনীর সাধারণ লক্ষ্য।
কিন্তু প্রকৃতির মধ্য দিয়েই নাচতে নাচতে কখন উন্মোচিত হবে
কৃষ্ণের মধুর, সহাস, উচ্ছল প্রেম ?

এইরকম বেশ কয়েকটি কবিতা আছে ওই 'কালেক্‌টেড পোয়েম্‌স'-এ—যেমন, 'কৃষ্ণ', 'শিব', 'সারেণ্ডার', 'লীলা', দি ইনার সভারিন', 'দি হিউম্যান এনিগ্‌মা' 'আই' [আমি], 'ইভলিউশন' ইত্যাদি। এইসব চতুর্দশপদীর আঁট-সাঁট বাঁধুনির ফলে তাঁর প্রকাশের বিস্তার-প্রবণতা এসব ক্ষেত্রে শমিত এবং এদের কাব্যব্যঞ্জনা বিতর্কাতীত। এইসূত্রে এখানে কবি-অরবিন্দের মনেও বিবেকানন্দ যে কতোদূর স্বীকৃত ছিলেন, তা বোধগম্য হয় যখন বিবেকানন্দের 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'-র—'সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী' ও অন্যান্য কবিতার অংশ মনে পড়ে যায়। ১৯০৯-এ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ৩০শে মে অরবিন্দ তাঁর বিখ্যাত উত্তরপাড়া-ভাষণ দেন এবং ১৯শে জুন থেকে ইংরেজি সাপ্তাহিক 'কর্মযোগিন্' প্রকাশ করেন। সেই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই ঈশোপনিষদের ইংরেজি অনুবাদ ছিল,—শঙ্করাচার্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও তাঁর

আলোচনা ছিল। সেই ১৯১৯-এরই ২৩শে অগস্ট থেকে বাংলা সাপ্তাহিক 'ধর্ম' প্রকাশ করেন তিনি—যার প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় ছিল গীতার উক্তি—যখনই ধর্মের গ্লানি ঘটে, তখনি অবতারের অভ্যুদয় হয়। সেই 'ধর্ম' পত্রিকার অষ্টাদশ সংখ্যায় তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবিষ্যৎ ভারত' নিবন্ধটি ছাপা হয়। ট্রান্সভালে তখন গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ-আন্দোলন চলছে। অরবিন্দ ঘোষের 'ধর্ম' ও 'কর্মযোগিন্' উভয় পত্রিকাতেই সেই আন্দোলনের প্রশংসা ছিল।

কবি অরবিন্দের পূর্বোদ্ধৃত কবিতার অনুবাদে তৃতীয় ছত্রের 'pain', 'grief' ও 'chance'—এই তিনটি শব্দের মধ্যে 'chance'তো 'সম্ভাবনা'—বাংলায় আরো সহজবোধ্য করবার চেষ্টায় অদৃষ্ট-বাচক 'কপাল' কথাটা ব্যবহার করেছি। কিন্তু pain আর grief কি অনেকটা একই রকম অনুভূতি নয়? সদ্যপ্রয়াত 'অনির্বাণ' তাঁর 'দিব্য-জীবন-প্রসঙ্গ'-এর [জানুয়ারি, ১৯৫৯] ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'evil' ও 'pain' (পৃঃ ৯০) শব্দ-দুটির অনুবাদে যথাক্রমে 'অনর্থ' ও 'দুঃখ' ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সচরাচর grief-এর বাংলাতেই 'দুঃখ' ব্যবহৃত হয়। তাই 'pain'-এর জন্যে 'যন্ত্রণা' রেখে,—'sorrow'-র জন্যে 'দুঃখ' তুলে রেখে,—'grief'-এর প্রতিশব্দ 'কষ্ট' দেওয়া হোলো। অরবিন্দের ইংরেজি লেখার বাংলা অনুবাদ বড়োই কঠিন কাজ। দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার প্রসঙ্গে 'discontent'-এর কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। 'অনির্বাণ' লিখেছেন 'অরতি'।[১৮] স্পষ্টই বোঝা যায়, 'অরতি' শব্দ বিশেষ বিদ্বানের প্রণীত। কিন্তু এই শব্দার্থ কি জনসাধারণের বোধগম্য? খুব সহজ করে শ্রীঅরবিন্দের মূল সদুক্তিগুলি যদি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-র রীতিতে বাংলায় লেখা হোতো, তাহলে তাঁর সত্যিকার ব্যাপকতর প্রচার হোতো দেশের মাটিতে। তাঁর নজর ছিল সাধক ও মনীষীর নজর। বিশ্বমানব-কল্যাণের দিকে দৃষ্টি থাকলেও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠার অন্ত মেলে না। সেই 'ঐতিহ্য' বলতে কী বোঝায় সে-প্রসঙ্গ আগেই কতকটা দেখা গেছে, এখানে পুনরায় দ্রষ্টব্য।

৯

ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরূপ সমালোচনায় তিক্ত ভাষণের তীব্রতা নিয়ে নাট্যসমালোচক উইলিয়ম আর্চার যখন আসরে উপস্থিত হন, সার জন উড্রফ তখন তাঁর তন্ত্রবিদ্যার পাণ্ডিত্যমাত্র অবলম্বন করে বসে থাকেন নি।

১৮। 'দিব্য-জীবন-প্রসঙ্গ', পৃষ্ঠা ২৭৩ দ্রষ্টব্য।

তিনি তাঁর কলম ধরেছিলেন আর্চারের বিরুদ্ধে। অরবিন্দ সোৎসাহে উড্‌রফের সেই সংগ্রামের প্রশংসা করে গেছেন। উড্‌রফের বইখানিকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ রচনা বলে গেছেন। গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, উড্‌রফ তো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা অহমিকাবোধের তাড়নায় তা' লেখেন নি। তিনি য়ুরোপীয় ও এশিয়া-মহাদেশের পৃথক পৃথক সাংস্কৃতিক প্রকৃতির প্রভেদ দেখাতে চেয়েছিলেন। এই দুই সংস্কৃতির সংঘর্ষের প্রসঙ্গই ছিল তাঁর আলোচনার বিষয়। মনুষ্য-জগতের কল্যাণের জন্যেই ভারতীয় সভ্যতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য, এই ছিল সেই সার জন উড্‌রফের মন্তব্য। 'ভারতবর্ষ কি সভ্য'—'ইজ ইণ্ডিয়া সিভিলাইজ্‌ড্‌'—তাঁর বইখানির এই নামটিই তাঁর গৃহীত প্রসঙ্গের ইঙ্গিত।

সাধক অরবিন্দ তাঁর নানা রচনায় দেহ, মন, আত্মা (বডি, মাইণ্ড, স্পিরিট)—এই তিনের কল্যাণের তত্ত্ব একযোগে ভাববার কথা বলেছেন। আর্চারের আলোচ্য বইয়ের কথাসূত্রেও তিনি এই কথারই পুনরুল্লেখ করেন। দেহ-মন-আত্মার নির্বিঘ্ন সৌষম্য বা সামঞ্জস্যই মানব-জীবনের লক্ষ্য। বিশেষ কোনো সংস্কৃতির মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এই দিকটিতে নজর দিতে হবে। কোন্‌ পথে, কী কী উপায়ে এই লক্ষ্যে পৌঁছোবার চেষ্টা চলেছে, সে-বিষয়ে ভেবে দেখা দরকার। অরবিন্দ লিখে গেছেন যে, প্রাচীন গ্রীক-রোমক সংস্কৃতি যেমন প্রধানত মনের ক্ষেত্রে, বুদ্ধিমার্গে নিষ্ঠা রেখে এই লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছিল, আধুনিক য়ুরোপের যেমন প্রধানত জড়বাদী গতি, প্রাচীন ভারতে তো বটেই, এমনকি একালের ভারতেও তেমনি মুখ্যত আত্মিক অনুশীলনের ওপর ঝোঁকই প্রধান। আত্মাই শাশ্বত, আত্মাই শরীরে ব্যক্ত, আবার, আত্মা দেহাতিশায়ীও। নিরন্তর কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের ধারায় চেতনার উর্ধ্বায়ন চলেইছে। আমরা চলেছি সজ্ঞান সেই নীতিলোকে,—যার নাম ধর্মচেতনা। রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বুঝিয়েছিলেন অন্য ভাষায়, অন্য ভঙ্গিতে—তাঁর 'ধর্মের অর্থ' (১৩১৮) নিবন্ধটিতে—যেখানে তিনি শরীরের প্রয়োজনের দিকটি অগ্রাহ্য না করেও 'মুক্তির', 'আনন্দের', 'মিলনের' তীব্রতর আকুতির কথা তুলেছিলেন।

সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ তিন গুণের কথা সুপরিচিত। আমাদের উত্তরোত্তর এগিয়ে যেতে হবে সাত্ত্বিকতার দিকে। আত্মিকতার উদ্দিষ্ট দিক এটি। ভারতবর্ষের সামাজিক-দার্শনিক-ধর্মানুভূতির গতি বলতে অরবিন্দ এই ভাবটিই বোঝাতে

চেয়েছিলেন। 'ধর্ম' বলতে ভারতবর্ষের এই অভিব্যক্তিবোধই স্বীকার্য। বাইরের উপকরণাশ্রিত প্রগতি নয়, অন্তরের পূর্বোক্ত বিকাশই আমাদের স্বভাব। এ লক্ষণ আমাদের ঐতিহ্যে আশ্রিত।

বলা বাহুল্য, পৃথিবীর দেশে দেশে পরিব্যাপ্ত বিপুল মনুষ্য-পরিবারের সর্বত্রই যে এই বিকাশ-চেতনা সজ্ঞান ও সক্রিয়, তা নয়। কোনো-না-কোনো রকম বিকাশ বা প্রগতি যদিও সকলের কাম্য, তবু একজাতির মনোধর্মের সঙ্গে অন্য জাতির মনোধর্মের সংঘর্ষ ঘটছেই। বিপরীতে-বিপরীতে সাক্ষাৎ যে না ঘটছে, তা নয় ; কিন্তু সেই বিপরীতের সংঘর্ষই শেষ কথা নয়। পরিণামে, সব বিপরীতকেই এক মহাসমন্বয়ে গিয়ে মিলতে হবে। কিন্তু যুদ্ধ যতক্ষণ, ততক্ষণ যুদ্ধের সজ্জাই স্বীকার্য। অরবিন্দ স্পষ্টই বলেছেন, যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড আঘাত-প্রত্যাঘাতের প্রহরে পৌঁছেচে, তখন হঠাৎ অস্ত্রত্যাগের মতি শুধু দুর্মতিই নয়, —তা আত্মঘাতী ! অর্থাৎ, যে সংস্কৃতি স্বেচ্ছায় তার স্বীকার্য স্বাতন্ত্র্য হারায়, তার পক্ষে আত্মরক্ষা দুঃসাধ্য। যে জাতি সেভাবে বাঁচতে চায়, তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আগে বিবেকানন্দ, পরে রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই কথাই বলে গেছেন।

ভারতবর্ষের আত্মিকতাকেই অরবিন্দ বলেছেন 'ভারত-শক্তি'। য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের সহায়ক নয়, একথা তিনি কখনোই বলেন নি,—কিন্তু 'ভারত-শক্তি' যদি উপেক্ষিত হয়, তা হলে আমাদের বিনাশ অবধারিত। এবং এশিয়ার চরিত্রে আত্মিকতাই যদিও প্রধান লক্ষণ, তবু বিশেষভাবে ভারতেই, এশিয়ার আত্মিকতা-ব্রতের নিবিড়তম ক্ষেত্র দেখেছিলেন তিনি। ইতিহাসের পর্ব-পর্বান্তরের দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি বলে গেছেন যে, মধ্যযুগে য়ুরোপেও এমন এক সংস্কৃতি ছিল যার প্রধান অবলম্বনই ছিল খ্রীষ্টীয় ভাব। তবে, খ্রীষ্টধর্মও তো এশিয়ারই দান। এবং আত্মিকতাই খ্রীষ্টীয় ভাবের প্রাণ।

য়ুরোপে-এশিয়ায় দৃষ্টিগত প্রভেদ তবু মানতেই হয়। মেজাজের বিভিন্নতা অবশ্যই স্বীকার্য। এবং ভারতবর্ষের বিশেষত্ব এই যে, এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে য়ুরোপের বিরুদ্ধে শারীরিক (physical) আক্রমণটাই ঘটে থাকে, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের ওপর ভারত কখনোই দেশাধিকারের অভিযান অর্থাৎ শারীরিক আক্রমণ চালায়নি বা তাতে যোগ দেয়নি, পক্ষান্তরে, ভারতের আত্মিকতার বিস্তার-ই ভারতের চরম আয়ুধ !

১০

ব্রিটিশ-শাসনাধীন ভারতবর্ষে বাস ক'রে অরবিন্দ এসব কথা লিখে গেছেন। তিনি তাঁর স্বদেশের ওপর পাশ্চাত্ত্য অধিকারের দিকে চোখ বুজে থেকে এসব বলেননি। একথা স্পষ্ট ভাবেই তিনি মেনেছেন যে, য়ুরোপ যখন এশিয়ার শাসক হবার সুযোগ পেয়েছে, তখন জড়বাদী য়ুরোপের প্রগতি-ধারণা তো এদেশে প্রত্যাশিত সাংস্কৃতিক-বিজয় প্রতিষ্ঠিত করবেই। বস্তুগত ঐশ্বর্য-সঞ্চয়ের দিকে, ব্যবহারিক সুখ-সুবিধার লোলুপতা বাড়িয়ে দিতে য়ুরোপের নেতৃত্ব উপেক্ষণীয় নয়,— অস্বীকার্য তো নয়ই। শুধু তাই নয়, ভারতে ইংরেজ-শাসনের ফলেই ভারত তার সামাজিক স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখতে পেরেছে —যদিও একথাও মানতে হয় যে, সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বাধাসৃষ্টি এড়িয়ে চললেও ইংরেজ-শাসন এদেশের প্রাচীন সমাজ-শক্তিকে কোনো রকমে টিঁকে থাকবার সুযোগটুকুই দিয়েছে,—দেশের অদম্য বিস্তারশক্তিকে তা পঙ্গু করে রেখেছে। স্বাধীনতা মানে কি শুধু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দেশের মানুষের গদি দখল? শুধু অর্থনৈতিক বিস্তার ও বণ্টনের অধিকার? প্রেম নয়? ধর্ম নয়? মনুষ্যত্বের জাগরণ নয়? রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শান্তিনিকেতন'-এর 'তপোবন' প্রবন্ধে লেখেন—"জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে গণ্য করতে পারিনে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা।" তাঁর 'গীতবিতান' -এর 'স্বদেশ'-বিভাগের ২০ সংখ্যক গানে পাই—

> ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
> তোমাতে বিশ্বময়ীর,
> তোমাতে বিশ্বমায়ের
> আঁচল পাতা।

কিন্তু সভ্যতার ব্যাধি কি বর্তমান দুনিয়ার মানব-সমাজের প্রায় সর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েনি? অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, তিলক, গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র ইত্যাদি নমস্যেরা কি ভারতীয় সংস্কৃতির কোনো মহামিলন মঠ বা আশ্রম গড়ে তুলতে পেরেছেন? এঁরা প্রত্যেকেই ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিকটি দেখিয়ে গেছেন। মঠ ও আশ্রম গড়ে ওঠে যথার্থ শিক্ষার্থী সাধকের সহযোগিতায়। ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ি বানিয়ে দিলেই দেশে শিক্ষার অমৃতধারা যে

বয় না, এ-সত্য তো আমরা একালে এদেশে বাস করেই হাড়ে-হাড়ে বুঝছি। তথাকথিত বিদ্যা আমাদের ক্রমেই নিঃসঙ্গতায়—ক্রমেই বিচ্ছিন্নতাবোধে ঠেলে দিচ্ছে। আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি—তিনি কোথায়?

তাহলে কোনো অলৌকিক যাদুবিদ্যার শরণার্থী হবো কি আমরা? শোনা যায়, ভাল ভাল শিল্পীরাও নেশার মাদকশক্তিতে আশ্রয় নিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন জার্মান কবি শিলারের প্রসঙ্গ,—যিনি নাকি তাঁর ডেস্কে পচা আপেল রেখে কবিতা লেখবার জোর পেতেন। কিন্তু পচা আপেলটা যে উপলক্ষ্য মাত্র, কবি-প্রতিভাই যে আসল কথা, সে কথাও রবীন্দ্রনাথ নির্দ্বিধায় উল্লেখ করে গেছেন।

ব্যক্তিগত, কৌলিক, স্বাদেশিক—এই তিন রকম অভ্যাস যে থাকতে পারে একথা রবীন্দ্রনাথের 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধে (১৩১৮) স্বীকৃত। ধর্মবোধের যথার্থ শিক্ষা ও অভ্যাসের জন্যে তুচ্ছ, আপতিক কোনো অবান্তর তুক্-তাকের ওপর নির্ভর করাটা মূঢ়তা। রবীন্দ্রনাথ এই বিবেচনা নিয়ে আশ্রম গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কথাসূত্রে তিনি লেখেন—"বস্তুত ব্রাহ্মসমাজে আমরা দেবমন্দির চাইনা, বাহ্য আচার অনুষ্ঠান চাইনা, আমরা আশ্রম চাই। অর্থাৎ যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একত্র মিলিত হইয়া একটি যোগাসন রচনা করিতেছে এমন আশ্রম।" কথাসূত্রে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রসঙ্গ ওঠে এবং পরে শান্তিনিকেতন গড়ে ওঠার ঘটনা স্মরণ করেন তিনি। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নিজের এই উপলব্ধি ঘটেছিল যে—"এখানে গুরুশিষ্য সকলেই একই ইস্কুলে সেই মহাগুরুর ক্লাসে ভরতি হইয়াছি।" এখনকার শান্তিনিকেতন কি সেই বোধেই বিদ্যমান?

ভূমাবোধই রবীন্দ্রনাথের সেই 'মহাগুরু'! নাট্যকার আর্চারের কটুকথায় আহত তন্ত্রজ্ঞানী সার জন উড্রফও ভারতবর্ষের সেই ভূমা-মিলনের পৃথক সংস্কৃতির সুদীর্ঘ ও বিচিত্র সাধনার দিকটি দেখিয়ে দেন।

আজ আমরা নাগরিক পরিবেশে বাস করি। ব্যবহারিক, প্রয়োজনীয় সব কিছু পরিত্যাগ করে কোনো দূর তপোবনে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টাই কি তাহলে মুক্তির পথ? সেও কি এলিয়নেশন বা বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা নয়? সংসারে ভালো-মন্দের ঢেউ উঠছে। সেখান থেকে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দুর্গ বানাবার স্বপ্ন দেখা কি ছেলেখেলা নয়? রবীন্দ্রনাথের কথায়—"মানুষের সঙ্গ এড়াইয়া দায়িত্ব কাটাইয়া শৌখিন শান্তির মধ্যে একটা বেড়া-দেওয়া

পারমার্থিকতার দুর্বল সাধনা” নিয়ে থাকতে চাই কি আমরা? তাঁর আরো একটি উক্তি—“কাঁটাবনের গোলাপটাই সত্যকার গোলাপ—আর বারবার অতি যত্নে চোলাই করিয়া লওয়া সাধুতার গোলাপি আতর একটা নবাবি জিনিস।” পোলিটিকাল ও ইকনমিক যোগ নয়,—তিনিও চান পূর্ণযোগ।[১৯]

সাধুতার নিষ্কণ্টক আতর-বিলাস বিলাস মাত্র! জীবদেহে বাস করে জৈব আচরণ বা ক্ষুধা-তৃষ্ণা অস্বীকার করা অসম্ভব, এই বাস্তব স্বীকৃতি শিরোধার্য। ভারতবর্ষের আত্মিক অভীপ্সা যে আমাদের মহাপুরুষদের অলীকভাষণ নয় সেও যেমন অবশ্যস্বীকার্য, কোনো ম্যাজিক-বিদ্যা দিয়ে যে যথার্থ মুক্তিবোধে পৌঁছানো যায় না, সে-কথাও তেমনি মানতে হয়।

সার জন উড্‌রফ তাঁর আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিরই মর্মার্থ জানিয়ে গেছেন যা অরবিন্দও জোর দিয়ে বলেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের কথায় যা এই ভাবে বলা যায়—“আমরাই তো জগৎ-প্রকৃতির সঙ্গে মানব-প্রকৃতির মিলন ঘটাইয়া চিত্তের বোধকে সর্বানুভূ, ধর্মের সাধনাকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিব, সেইজন্যই এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।”

উনিশ শতকের শেষদিকে থিয়সফি-চর্চার আন্দোলন এবং বিবেকানন্দের শিকাগো-ভাষণ আমাদের ঐতিহ্য-অনুসন্ধিৎসারই উজ্জ্বল নিদর্শন, বিপরীতে বিপরীতে সংঘর্ষের পরে,—আক্রমণ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদির পরে, সমস্ত যুদ্ধের পরে আসে পরস্পরকে পুনরায় চিনে নেবার সময়। আধ্যাত্মিকতা কখনোই একমাত্র ভারতের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। মানুষ মূলে ও পরিণামে আধ্যাত্মিক। কিন্তু নিকটকালের নগদ-নারায়ণের খাতিরে, বস্তুবিষয়ের ঐশ্বর্যলোলুপতায় মানুষ কি সন্ন্যাসকে কেবলি ধিক্কার দেবে? ভারত কি জড়বাদের দীক্ষা নিয়ে সত্যিই পার পাবে? এই ভবসমুদ্র কি সেরকম সমুদ্র?

দেহ-মন আত্মার সৌযম্যই যদি সভ্যতা ও সংস্কৃতির লক্ষ্য হয়,—সাত্ত্বিক-ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাটাই যদি শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্য বলে মানতে হয়, তাহলে আমাদের মনের গতি সেই দিকেই চালিত করবার আয়োজনে মন দিতে হয়। সংসারের মধ্যেই সন্ন্যাস চাই। এবং এই যোগেরই নাম ‘সভ্যতা’।

মনে মনে এই ধরনের আলাপ চলছেই। তর্ক-বিতর্ক মন্দ নয়। কিন্তু কতোরকম জল্পনা, বিসংবাদ, বৃথাতর্কই যে আমাদের ঘিরে আছে! তাই, সহজ উপলব্ধির ভাষা তর্ক নয়,—বরং গল্প, কাহিনী কথামৃতই যোগ্য অভিব্যক্তি।

১৯। ‘কালান্তর’, ‘সত্যের আহ্বান’ দ্রষ্টব্য।

যেমন, রামকৃষ্ণের কথামৃত। মনে পড়ে গৌতম বুদ্ধকে তাঁর একজন চাষীভক্ত জিগেশ করেছিলেন,—আপনি নিজের আহারের শস্য নিজে ফলান না কেন? বুদ্ধদেব সে কথার জবাবে বলেন—আমি যে অমৃতের চাষ করেছি! অরবিন্দও অমৃতের আবাদে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। প্রথম পর্বে তিনি সশস্ত্র যুদ্ধায়োজনের মধ্য দিয়ে দেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছেন; তাঁর কবিসত্তা, বিপ্লবী সত্তা ১৯১০-এর পরবর্তী পর্বে নিঃশেষিত হয়নি; পূর্ণযোগ ব্যতিরেকে দিব্যজীবন লাভ সম্ভব নয়, এই উপলব্ধি থেকেই তিনি তাঁর ইহজীবনের দ্বিতীয় পর্বে উত্তরোত্তর ধ্যানে, যোগে সমাহিত ছিলেন।

১১

গত শতাব্দীর শেষ প্রান্তের দিকে ফিরে দেখছে মন। শিকাগোর বিশ্ব-ধর্মসম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে, য়ুরোপ-আমেরিকা ভ্রমণের পরে দেশে ফিরে, কলকাতায় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮-এ ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিপুলভাবে সংবর্ধিত হয়েছেন বিবেকানন্দ। জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গভীর বন্ধুত্বের কাল তখন। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম লোকান্তরিত হয়েছেন কাছাকাছি সময়ে (১৮৯১ ও ১৮৯৪)। অরবিন্দ ঘোষ বরোদার মহারাজার কাছে চাকরি নিয়েছেন। তখন তাঁর—"পায়ে শুঁড়ওয়ালা সেকেলে নাগরা জুতা, পরিধানে আমেদাবাদ মিলের বিশ্রী পাড়ওয়ালা মোটা থাদি, কাছার আধখানা খোলা, গায়ে আঁটা মেরজাই, মাথায় লম্বা লম্বা গ্রীবাবলম্বিত বাবরীকাটা পাতলা চুল, মধ্যে চেরা সিঁথি, মুখে অল্পস্বল্প বসন্তের দাগ, চক্ষুতে কোমলতাপূর্ণ স্বপ্নময় ভাব, শ্যামবর্ণ ক্ষীণ দেহধারী এই যুবক ইংরাজী, ফরাসী, ল্যাটিন, হিব্রু, গ্রীকের সজীব ফোয়ারা।"[২০]

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখনো তিনি অরবিন্দ ঘোষ। কালক্রমে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনিই শ্রীঅরবিন্দ হয়েছেন। প্রধানত ইংরেজি ভাষার লেখক তিনি। তাঁর মনোগতি বিশ্বমানবিক, আন্তর্জাতিক। তিনি স্রষ্টা এবং সমালোচক দুইই। গত শতাব্দীর শেষ দিকেও মাতৃভাষা বাংলায় সাহিত্যের আস্বাদন তাঁর পক্ষে শ্রমসাধ্য ছিল।

২০। দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য।

অরবিন্দের মাতুল যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁর পিতা রাজনারায়ণ বসুকে—অর্থাৎ, অরবিন্দের মাতামহকে সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কথা বলেন। রাজনারায়ণের অনুমোদনক্রমে দীনেন্দ্রকুমার বরোদায় যান অরবিন্দের বাংলার শিক্ষক হয়ে। রাজনারায়ণ তখন রোগশয্যায়,—কিন্তু বৃদ্ধের মুখে তখনো হাসির রেখা উজ্জ্বল হয়ে আছে। আরো কয়েক বছর আগে বন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে উচ্চ হাস্যের পাল্লা দিতেন তিনি।

বরোদায় গিয়ে অরবিন্দ সাধারণ পরিচ্ছদই ব্যবহার করতেন—মাথায় শোভা পেতো 'পিরাণী' টুপি,—শুতেন লোহার খাটে,—মাঘের শীতেও লেপ ব্যবহার করেতেন না—অনেক রাত পর্যন্ত পড়তেন। তাঁর ঘুম ভাঙ্গতে বেলা হোতো। অল্প দামের একটি পকেট-ঘড়ি রাখতেন নিজের কাছে। সকালে চা-পানের পর কবিতার খাতা খুলে বসতেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত পড়তেন—মহাভারতের ইংরেজি অনুবাদেও নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯৯-এর শেষ দিকে বরোদার মহারাজার নিমন্ত্রণে রমেশচন্দ্র দত্ত সেখানে গিয়ে অরবিন্দের রামায়ণ-মহাভারতের টুক্‌রো টুক্‌রো অনুবাদ দেখে বলেন—"তোমার এইসব কবিতা দেখিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদে আমি কেন পণ্ডশ্রম করিয়াছি ভাবিয়া দুঃখ হইতেছে। তোমার এই কবিতাগুলি আগে দেখিলে আমি আমার লেখা কখনই ছাপাইতাম না।" দীনেন্দ্রকুমারের নিজের উক্তি এটি। তখন দীনেন্দ্রকুমারকে অরবিন্দ বলতেন—"কি চিত্র-শিল্পে কি সাহিত্যে রুশিয়া একদিন ইউরোপের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।"

বরোদা রাজসরকারের কাজ নিয়ে অরবিন্দ ভারতে ফেরেন ১৮৯৩-এর ৬ই ফেব্রুয়ারি। বরোদায় তিনি মোট প্রায় সাড়ে তের বছর কাটিয়েছেন। সেখানে তাঁর প্রথম মাসিক মাইনে ছিল দুশ টাকা; ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন বরোদা থেকে কলকাতায় চলে আসেন তখন মাইনে পেতেন মাসিক সাড়ে সাতশ'। সেই বরোদাতেই তাঁর বিপ্লবী, কবি ও যোগী জীবনের প্রস্তুতি আরো এগিয়ে যায়। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ-এর 'ঋষি অরবিন্দ' বইয়ে [এপ্রিল ১৯৭২] বিশেষভাবে এই বরোদা-জীবনের কথা-প্রসঙ্গে এই তথ্যগুলি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে—বরোদায় জনসাধারণের ভাষা ছিল গুজরাটী এবং রাজ পরিবারের ভাষা মারাঠী। অরবিন্দ মারাঠী সাহিত্য পড়েছিলেন, কিন্তু ওই ভাষাতেই তাঁর চর্চা থাকলেও গুজরাটী বা মারাঠীতে কিছু লেখেন নি। ডঃ ঘোষের কথায়—"এমন কি তাঁর বিরাট পরিমাণ লেখার মধ্যে কোথাও

প্রসিদ্ধ গুজরাটী ভক্ত কবি নরসিংহ মেহতার বা বিখ্যাত মহারাষ্ট্রের গীতার ভাষ্যকার জ্ঞানদেবের লেখার উল্লেখ পাই নি।" দ্বিতীয়ত, তিনি বরোদাতেই সংস্কৃত ভাষা ভালভাবে শেখেন, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় কিছু লেখেন নি। তৃতীয়ত, বরোদা ছাড়বার পরে কলকাতায় তাঁর তামিল-শিক্ষা শুরু হয়—পণ্ডিচেরিতে সেই শিক্ষা আরো বাড়ে, তবে সে-ভাষায় তিনি তেমন পারদর্শী হননি। বরোদায় বাসের সময়েই তাঁর বিবাহ হয়,—যোগাভ্যাস শুরু হয়—এবং প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয়।

বরোদায় অরবিন্দ সকালে চা-পানের পরে কবিতার খাতা খুলে বসতেন। এই সময়ে তিনি ইংরেজিতে মহাভারত অনুবাদের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। দীনেন্দ্রকুমারের পূর্বোক্ত বইয়ে দেখা যায়, তিনি খুব তাড়াতাড়ি লিখতে পারতেন না, শব্দ নির্বাচনে অতিশয় সতর্ক থাকতেন।—"ছোট আকারের গ্রে-গ্রানাইট রঙের চিঠি লেখার কাগজে প্রথমে কবিতাগুলি লিখিতেন; প্রায়ই কাটাকুটি করিতেন না। লিখিবার পূর্বে সিগারেট টানিতে টানিতে খানিকটা ভাবিয়া লইতেন; তাহার পর তাঁহার লেখনীমুখে ভাবের মন্দাকিনী প্রবাহিত হইত।"—আবার—"অরবিন্দকে কখনও রাগ প্রকাশ করিতে দেখি নাই। কোন রিপুকেই তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখা যাইত না"। বেলা প্রায় দশটা পর্যন্ত লেখাপড়ার পরে তিনি স্নান করে উঠে আবার কবিতার খাতা নিয়ে বসতেন। এগারোটার আগেই অল্পাহারী অরবিন্দের আহার শেষ হোতো। এই সময়ে চিত্রকর শশীকুমার হেশ ইংলণ্ড থেকে বরোদায় আসেন। ফাড়কে নামে এক মারাঠী ব্রাহ্মণ যুবকের কাছে অরবিন্দ মারাঠী শিখতেন। ফাড়কে ছিলেন মারাঠী সাহিত্যিক। তিনি রমেশচন্দ্র দত্তের 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত'-এর অনুবাদ করেন। সেই পর্বেই একবার অরবিন্দ ও দীনেন্দ্রকুমার উভয়ে কলকাতায় এলে সুরেশচন্দ্র সমাজ-পতির সঙ্গে অরবিন্দের আলাপ করিয়ে দেন দীনেন্দ্রকুমার। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় তখন 'বসুমতী' প্রকাশিত হোতো। দীনেন্দ্র-কুমারের কথায়—"পাঁচকড়িবাবুর সরস টিপ্পনী পাঠ করিয়া অরবিন্দ খুব আমোদ পাইতেন।" জ্যোতিষ শাস্ত্রে সেই পর্বেই অরবিন্দের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল।

দেশের স্বাধীনতাই যে অরবিন্দের প্রধান কাম্য ছিল সে কথা বার বার বলা হয়েছে। সিপাহী যুদ্ধের স্মৃতি তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কারও কারও মনে বিশেষ

দীপ্যমান ছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত-শাসনের ক্ষেত্র থেকে লর্ড ডালহৌসি বিদায় নেবার পরে বড়োলাট ক্যানিং (১৮৫৬-৬২) যখন আসেন, সেই পর্বেই ইংরেজের জবরদস্ত শাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অসন্তোষ দেখা দেয়। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ইংরেজি,শিক্ষা ইত্যাদির প্রবর্তন তখন দেশবাসী সন্দেহের চোখে দেখেছেন। ১৮৫৭-র জানুয়ারি মাসে দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে গুজব ছড়ায় যে, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ধর্মচ্যুতি ঘটাবার জন্যে বন্দুকের টোটায় শূকর ও গোরুর চর্বি মেশানো হচ্ছে। সেই সন্দেহটি মিথ্যে নয়—একথা ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারও লিখেছেন।[২১] বারাকপুরের সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হয় এবং ২৯-এ মার্চ ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষকে আহত করে। বাংলায় অচিরেই সে বিদ্রোহ দমন করা হলেও ১০ই মে, মীরাটে—এবং পরে দিল্লীতেও বিদ্রোহীদের সহিংস আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে কানপুর, লখনউ প্রভৃতি অঞ্চলেও বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ চলতে থাকে। কানপুরে বিদ্রোহের নায়ক দ্বিতীয় বাজী রাওর দত্তক পুত্র নানা সাহেব কানপুরের সন্নিহিত বিঠুরে নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করেন। বিদ্রোহী সেনাদলের অন্যতম নেতা ছিলেন মারাঠী ব্রাহ্মণ তাঁতিয়া টোপি। ৬ই ডিসেম্বর কলিন ক্যাম্বেল বিদ্রোহীদের অধিকার থেকে কানপুর উদ্ধার করবার পরে তাঁতিয়া টোপি ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈর সঙ্গে যোগ দেন। ঝান্সী ইংরেজদের কবলিত হবার পরে রাণী লক্ষ্মীবাঈ তাঁতিয়া টোপির সাহায্যে গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়াকে তাড়িয়ে দেন, নানা সাহেব পেশোয়া ঘোষিত হন। কিন্তু অচিরেই সার হিউ রোজ যখন গোয়ালিয়র দখল করতে যান, সেই সময়ে পুরুষ-সৈন্যের বেশে যুদ্ধ করতে-করতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন ঝান্সীর রাণী যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দেন।

এই বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৮৫৮-তে। এই যুদ্ধে প্রধান প্রধান দেশীয় রাজ্যের রাজারা যোগ দেননি। রমেশচন্দ্রের ভাষায়—"অনেক মনে করেন ইহা ভারতের প্রথম জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ; কিন্তু ভারতের এক অংশে সীমাবদ্ধ এই সমুদয় খণ্ড খণ্ড বিপ্লবকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের জাতীয় সংগ্রাম বলিয়া গণ্য করা অনেকে সংগত মনে করেন না। কারণ ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশ, বিশেষত শিক্ষিত সম্প্রদায় এই বিদ্রোহের প্রতি বিশেষ কোন সহানুভূতি দেখায় নাই। বিভিন্ন বিদ্রোহী নায়ক ও

সৈন্যদলের মধ্যে একযোগে কার্য করার কোন ব্যবস্থা ছিল না, জাতীয়তা ভাবে প্রণোদিত হইয়া দেশের স্বাধীনতা লাভ করাই যে তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তথাপি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কারণ ইহার স্মৃতি পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যথেষ্ট প্রেরণা যোগাইয়াছিল।[২২]

অরবিন্দকে যখন 'ঋষি' বলা হয়, তখন তাঁর বিপ্লব-ভাবনার কথাসূত্রে সিপাহী-যুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশি মনে জাগা স্বাভাবিক স্বামী দয়ানন্দের (১৮২৪-৮৩) কথা। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর সম্বন্ধে লিখে গেছেন—"Swmi Dayananda is the Rishi or Divine Seer of modern India"। আবার—"He is the fulfiment of Raja Rammohan Roy and the forerunner of Mahatma Gandhi."[২৩] স্বামী দয়ানন্দ চেয়েছিলেন বৈদিক আদর্শে ভারতের নবজাগরণ ঘটাতে। রামমোহনের মতন তিনিও প্রচলিত জাতিভেদ-প্রথা মানতেন না। বৈদিক শাস্ত্রে তাঁর গভীর অধিকার ছিল। তর্কে তিনি ছিলেন বিশেষ দক্ষ। রাজা রামমোহনের মতোই দয়ানন্দ ছিলেন প্রতিমা-পূজার বিরোধী। কিন্তু রামমোহন সংসারে ছিলেন, আর দয়ানন্দ আঠারো বছর বয়সেই সত্যের সন্ধানে সন্ন্যাসীর ভূমিকায় পথে বেরিয়ে পড়েন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের মতোই মতোই দয়ানন্দের বেশবাসের ঠিক থাকতো না। বিপ্লব যে গভীর ঐতিহ্য-বোধের উৎস থেকে সমসাময়িক নিপীড়নের ফলে, প্রবল আশাবাদের উত্তাপে জন্মগ্রহণ করে, উনিশ শতকের শেষদিকে এদেশে তা স্পষ্ট হয়ে হয়ে ওঠে।

রামমোহন রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে অ্যারিস্টট্‌ল ও মণ্টেসকিউ-এর (Montes quieu) প্রদর্শিত ঐতিহাসিক নীতি মেনেছিলেন, কিন্তু দয়ানন্দের নজর ছিল পুরোপুরি বৈদিক পন্থায়। তিনি অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাতে রাষ্ট্রীয় মতামতের উদ্ভব সম্বন্ধে মোটেই সচেতন ছিলেন না। বেদই ঈশ্বরোক্তি। অতএব, বেদই একমাত্র মাননীয়—এই ছিল দয়ানন্দের মজ্জাগত বিশ্বাস। স্বর্গত বিমানবিহারী মজুমদার এদিকটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন যে, অরবিন্দ ঘোষ দয়ানন্দের এই রীতি বর্জনীয় বলে লিখে

গেছেন। দয়ানন্দ তাঁর নিজের বৈদিক অনুধ্যান-সূত্রে জগদ্বন্ধন থেকে মোক্ষের পথই বেদের কাম্য বলতেন।

অরবিন্দ দেশে ফেরার প্রায় এক যুগ আগে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি ইংরেজি 'মারাট্ঠা' এবং ৪ঠা জানুয়ারি মারাঠী 'কেশরী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিলক (১৮৫৬-১৯২০) ছিলেন এই দুই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রানাডে (১৮৪২-১৯০১) ছিলেন তখন, গোখেল (১৮৬৬-১৯১৫) ছিলেন। মাদ্রাজে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন চলেছে ১৮৯০-এ সূচিত কে. নটরাজন-এর ইংরেজি পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান স্কুল রিফর্মার' ও অন্যান্য সমকালীন পত্রিকার মাধ্যমে। বঙ্গভূমিতে ছিল শিশিরকুমার ঘোষ ও তাঁর ছোটো ভাই মতিলাল ঘোষের অমৃতবাজার পত্রিকা। বিমানবিহারী আরো অনেক পত্রিকার নামোল্লেখ করে লিখেছেন—'The most constructive ideas in political science in the period selected by us (তার মানে, রামমোহন থেকে দয়ানন্দ অবধি) are to be found in the articles contributed by Sri Arabinda in the *Bande Matarm, Karmayogin* and the *Arya*।"[২৪] এই সূত্রে মনে রাখা দরকার যে, অরবিন্দ ১৮৭৯-তে বাল্যাবস্থায় বিলেত যাত্রার আগেই ১৮৭৮-ভার্নাকিউলার-প্রেস-অ্যাক্ট ঘটে গেছে এবং সেকালে শিশিরকুমার ঘোষের অমৃতবাজার পত্রিকা রাতারাতি দ্বিভাষিক হয়ে ওঠা ছিল সেকালের এক বিস্ময়কর ঐতিহাসিক ঘটনা।

অরবিন্দের স্বদেশপ্রেমের মূলে ছিল বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, তিলক প্রভৃতি অনেকের প্রেরণা। কিন্তু অগ্নিযুগের আগ্নেয় ব্যাপারে তাঁর সংযোগের প্রসঙ্গ অতঃপর চারুচন্দ্র দত্তের কথা দিয়েই দেখা যাক।

১২

চারুচন্দ্র সিবিল সার্ভিসের পরীক্ষার্থী হিশেবেই বিলেতে যান। তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর; কিন্তু তাঁর 'পাকা মতলব' ছিল যে, বিলেত থেকে ব্রাজিলে গিয়ে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের সাহায্য নিয়ে সেনাবিভাগে ঢুকবেন। এদিকে, বিলেতে পৌছোবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কর্ণেল বিশ্বাসের স্ত্রীর চিঠিতে জানেন যে, তাঁর স্বামী 'সম্প্রতি মারা গেছেন' এবং—'তিনি আমাকে কোন রকমে সাহায্য করতে পারবেন না।' তখন চারুচন্দ্র তাঁর শিক্ষক রেন সাহেবের মারফৎ ইংলণ্ডের সেনাবিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষার অনুমতি পান,

২৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৫ দ্রষ্টব্য।

অচিরে তাঁরই মারফৎ জানতে পান—'আমি ফার্ষ্ট হলেও সামরিক কলেজে ঢুকতে পাব না ; ভারত দপ্তরের ঘোর আপত্তি আছে।' অগত্যা তিনি এবং তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ সিবিলিয়ন বন্ধু ও রবীন্দ্রনাথেরও বিশেষ প্রিয় বন্ধু লোকেন পালিত গোলন্দাজ-বাহিনীতে (Honourable Artillery Company) ভর্তি হবার দরখাস্ত দেন। লোকেন ভর্তি হলেন, কিন্তু প্রায় একশ গিনি খরচ পড়বে জেনে চারুচন্দ্রকে পিছয়ে আসতে হয়। এই ঘটনার সূত্র ধরে তিনি লিখেছেন—"তবে আমার সেপাইগিরির সাধ ত কেবল ইংরেজ তাড়াবার জন্য ! লেগে গেলাম গুপ্ত রাজনৈতিক কাজে কোমর বেঁধে। তৈরী কোন রাজদ্রোহী দলের পাত্তা পেলাম না। কানে শুনলাম—কেম্‌ব্রিজে একটা দল একবার গড়ে উঠেছিল বটে কিন্তু এখন সেটা লোপ পেয়েছে। বোধহয় সেইটাই অরবিন্দবাবুদের 'খড়্গ ও কমল সংঘ'।[২৫] ১৮৯৬-৯৭ সালে আবহাওয়া বেশ অনুকূল ছিল। দেশে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের প্রকোপ, পুনাতে দুজন সাহেব কর্মচারীর হত্যা, রানী ভিক্টোরিয়ার জয়ন্তী উৎসবে যোগ দেবার জন্যে ভারতকে ধরে টানাটানি এসবই আমাদিকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলেছিল গুপ্ত রাজদ্রোহের অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে। আমাদের এই কাজে সাহেব মুরুব্বীরও অভাব ছিল না। সদ্য দশ বছর জেল খেটে বেরিয়ে এসেছেন ফিনিয়ান বিদ্রোহী মাইকেল ডেভিট। সমাজতান্ত্রিকদের কর্তা হাই ন্ডম্যান, নৈরাজ্যবাদী কানিংহাম, শ্রমিকদলের নেতা আগুনের ফিনকী টম্‌মান—এদের সকলের সঙ্গেই আমাদের ক্ষুদ্র দলটির ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এঁরা সবাই আমাদিকে গুপ্তহত্যা, বিপ্লব সংগঠন, বিদ্রোহের জোগাড়যন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দিতেন। আমাদের সর্বজনমান্য ভারতীয় নেতা ছিল ঋষিতুল্য দাদাভাই নৌরোজী[২৬]। আমরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু তিনি আমাদের এইসব সাহেব মুরুব্বীদিকে ভাল চোখে দেখতেন না, কেবলই বলতেন, "এই সমস্ত নামকাটা সেপাইদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িও না।"

উনিশ শতকের শেষ দশকের এই পরিস্থিতির সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের উভয়েরই আন্তরিক বিপ্লবাত্মক স্বাদেশিকতাবোধের যোগ দিল। পুরোনো মডারেট-পন্থা এঁরা কখনই মেনে নেননি। চারুচন্দ্র লিখেছেন—"পুরানো নেতারা ত ইংরেজদিকে তুষ্ট করে এঁটোকাঁটা আদায় করাকেই রাজনীতি বলে জানতেন ! দু'পাঁচ বছর পরেই ত অরবিন্দ তাঁর পুরোনো

২৫। 'Lotus and Dagger'। ২৬। ১৮২৫-১৯১৭

প্রদীপের বদলে নূতন প্রদীপ বলে বিখ্যাত প্রবন্ধাবলীতে এই মনোবৃত্তির সমালোচনা করেছিলেন।[২৬] ১৮৯৬ সালে আমি নিতান্ত ছেলেমানুষ, হয়ত যা-তা বলে বেড়াতাম। স্বামী বিবেকানন্দ ঐ সময়টাতে লণ্ডনে কিছুদিন ছিলেন। লোকমুখে আমার অসংযত বাক্য ও কর্মের কথা শুনে থাকবেন। একদিন এক তরুণ মাদ্রাজী আমার বাসাতে এসে বল্‌লে "স্বামীজী তোমাকে একবার ডেকেছেন।" কিন্তু চারুচন্দ্র স্বামীজীর কাছে যান নি, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল—"হয়ত আমাকে লোকটি ধাপ্পা দিয়ে গেল।" কয়েকদিন পরে আবার সে ভদ্রলোক স্বামীজীর আহ্বানের কথা বলে যান। কিন্তু চারুচন্দ্র তাতেও যান নি; এ বিষয়ে তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি—"মোটকথা ভয় হয়েছিল। কি জানি, সন্ন্যাসী মানুষ, হয়ত আমার মতিগতি সব ঘুরিয়ে দেবে। আবার কয়েক সপ্তাহ পরে—অক্ষয় ঘোষ বলে এক বাঙ্গালী বন্ধু এসে চেঁচামেচি করতে লাগল, তুই আচ্ছা ছেলে ত! স্বামীজীর কাছে গেলি না। তিনি বলছিলেন—ছোঁড়াটা এলে ভাল করত, ওর কাজেরই হদিশ বাতলে দিতাম।" স্বামীজীর কাছে পরের জীবনেও চারুচন্দ্র যান নি কখনো, কিন্তু লিখেছেন—"তথাপি তাঁর একটা অহৈতুকী কৃপা ছিল আমার উপর। দুই একবার ফাই-ফরমাশও করেছেন।"

দাদাভাই সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও ডেভিট প্রভৃতি সাহেব বন্ধুদের ওপর নির্ভর ছিল চারুচন্দ্রের এবং তাঁর তরুণ ভারতীয় বন্ধুদের। ডেভিট তাঁদের কাছে আইরিশ নেতা রেডমণ্ডের আদেশ মাফিক ভারতবাসীদের উদ্দেশে এই প্রস্তাব জানান যে—ভারত যদি আয়র্লণ্ডের জাতীয় দলকে বছরে আট লাখ টাকা দেয় তাহলে ব্রিটিশ 'প্রজাসভাতে' অর্থাৎ পার্লামেণ্টে তাঁদের আটটি আসন ছেড়ে দেবেন, শর্ত এই থাকবে যে, সেই আটজন ভারতীয় সকল আইরিশ ব্যাপারে তাঁদের মতে মত দেবেন—বিনিময়ে, পুরো আইরিশ জাতীয় দল ভারতীয় ব্যাপারে কংগ্রেসের মত সমর্থন করবেন। দাদাভাই নৌরজী উৎসাহী ভারতীয় ছোকরাদের সে প্রস্তাবও গ্রাহ্য করেন নি।

চারুচন্দ্রের দল এতে ক্ষুণ্ণ হন, কিন্তু দাদাভাই-এর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা অটুট ছিল। তাঁরা এক বছর পরিশ্রম করে 'নব ভারত সভা' নামে এক সমিতি স্থাপন করেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল প্রথমে বিলেতে, তারপর দেশে ফিরে ভারতের সম্মান যাতে সর্বপ্রকারে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই আয়োজন করা,—১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের

২৬। 'New Lamps for the Old'।

সিপাহী-যুদ্ধের আদর্শে "ভারত থেকে বিদেশী মেরে তাড়ানো।" পুনাতে সে সময়ে রাজদ্রোহের অভিযোগে তিলকের বিচার চলছিল। 'নব ভারত সভা' খোলা কার্ডে নিজেদের তৎসম্পর্কিত এই মন্তব্য বিলি করেন যে—"নবভারত তিলক মহারাজের রাজদ্রোহ অপরাধ সাদরে মেনে নিয়ে তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছে।" এই নবভারত দলের ভাষা খুবই উদ্ধত ছিল, তবে, মারামারি কাটাকাটির কথা তুল্‌লে অধিকাংশই ঠাণ্ডা হয়ে যেতেন। এঁদেরই মাত্র পাঁচটি নাছোড়বান্দা সদস্য ১০ই মে ১৮৯৭ তারিখে—সিপাহী যুদ্ধের ঠিক চল্লিশ বছর পরে ভারত থেকে শেষ ইংরেজটি পর্যন্ত যতক্ষণ না দূর হয়, ততক্ষণ তাঁদের বিশ্রাম নেই—এই শপথ নেন। এই ঘটনার আটবছর পরে অরবিন্দ ঘোষের পতাকাতলে চারুচন্দ্র এসে দাঁড়ান—কিন্তু—"তখন তাঁদের কাউকে কাছে টানতে পারলাম না। এই ত জগতের গতি!"

দেশে ফিরে আই. সি. এস্. চারুচন্দ্র তাঁর কর্মসূত্রে বড় বড় জমিদার, ব্যবসায়ীদেরও যেমন নিকট সংস্পর্শে এসেছেন, তেমনি গ্রামের গরিব চাষীদেরও। লাট কর্জনের আমল সেটা। —"তাঁর লম্বা লম্বা কথা, ভারতের পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, ভারতের মানুষকে দূর-ছাই করা, এসব দেখে শুনে লোকের মন তেতো হয়ে গেছল।" লাট কর্জনের বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ফলে দেশের মনে 'একটা মরিয়া ভাব' জেগে ওঠে। সেই সময়ে প্রস্তাব ওঠে—কর্জন যখন দিল্লিতে শোভাযাত্রা করে বেরোবেন তখন তাঁকে গুলি করা হবে। চারুচন্দ্রের নিজের কথায়—"আমাদের মধ্যে তিন চারজন খুব বড় বড় লোক ছিলেন—একজন জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিক, একজন নামজাদা বৈজ্ঞানিক, একজন জাহাজঘাটার মালিক (আমার পিতৃ-স্থানীয় হেম মল্লিক মহাশয়) এবং বিশ্ববিশ্রুত জাপানী শিল্পী ও ভাবুক ওকাকুরা কাকুজো। সুরেন ঠাকুর ও আমি ছিলাম কনিষ্ঠতম বিদ্রোহী। সুরেনবাবু ও কাকুরা একজন তরুণ বিহারীকে পছন্দ করলেন শহীদ বলে। আমি তাকে চিনতাম।" কিন্তু কাজের সময়ে সেই পরমেশ্বরলাল ভয় পেয়ে দিল্লি থেকে পালিয়ে আসে। তারপর আর একটি উপায় মাথায় আসে। হরেন নামে কলকাতার একটি ছেলেকে চারুচন্দ্র নিজের রাইফেল চালাবার শিক্ষা দিয়ে কর্জনকে ফেরার পথে পশ্চিমঘাটের একটা ছোটো স্টেশনে গুলি করবার জন্যে প্রস্তুত করলেন।"—আবার চারুচন্দ্রের কথায়—"কার সঙ্গেই বা পরামর্শ করি। তখন আমি কিছুদিন থেকে অরবিন্দবাবুর সঙ্গে খানিক

খানিক স্বদেশীর এবং তাঁর ভবানীমন্দিরের কাজ করছিলাম। তাঁরই শরণাপন্ন হওয়া স্থির করলাম। বন্দুকটা তখনও হাতছাড়া করি নেই। হরেনকে বরোদা পাঠালাম বন্ধুবরের কাছে। তাকে একটি চিঠি লিখে দিলাম, "ছেলেটিকে কোন জরুরী সঙ্গীন কাজে নিযুক্ত করা যায় কি?" দুদিন বাদে জবাব এল, "তোমার ছোকরা নির্ভরযোগ্য নয়।" "হরেন আর আমার কাছে এল না, একেবারে ডুব মারলে।"

চারুচন্দ্র লিখেছেন—"অরবিন্দবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় বরোদা স্টেশনে। আমি ও একজন ইংরেজ সহকর্মী বোম্বাই যাচ্ছিলাম, আর তিনি চিত্রকর শশীহেশকে গাড়িতে তুলে দিতে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট কেশবরাও দেশপাণ্ডে ও সিপাহী যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। আলাপ পরিচয় হলে আমি অরবিন্দবাবুকে বললাম, "আপনার দাদা বিনয়বাবু আমাকে অনেকদিন থেকে চেনেন।" তিনি অতি সুন্দর মিষ্টি হাসি হেসে জবাব দিলেন, "আমি তোমার কথা সবই জানি। এখনত, আমরা দুজনেই গুজরাটে রয়েছি, খুব দেখাশুনা হবে।" এইভাবে গুরুবরের প্রথম দর্শন পেলাম। তবে তখনত আর তাঁকে গুরু বলে জানতাম না, কর্তা বলতাম, দণ্ডমুণ্ডের হর্তাকর্তা।" এর পরে বছর-তিনেক অরবিন্দের সঙ্গে চারুচন্দ্রের আর দেখা হয়নি, কারণ ১৯০৩-এ তিনি দক্ষিণ-ভারতে বদলী হয়ে যান। ১৯০৬-এ থানা শহরে চারুচন্দ্র জজ হয়ে আসেন। ইতিমধ্যে গুপ্তসমিতির কাজ চলেছে। অরবিন্দ বারবার সশস্ত্র বিপ্লবের কথা শুনে বলতেন—"পাগলামি করে দেশ স্বাধীন করা যায় না।" চারুচন্দ্রকে স্বদেশী ও ভবানীমন্দিরের কাজে তিনিই লাগিয়ে রেখেছিলেন। অতঃপর একদিন হঠাৎ বারীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে চারুচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে নিয়ে গিরগাঁও অঞ্চলে এক ব্যারিস্টারের বাড়িতে যান। সেখানেই অরবিন্দ বারীন্দ্রকে দিয়ে বাংলায় বয়কট আন্দোলনের ফলে তাঁদের গুপ্ত সমিতির কাজের কতো সুবিধা ঘটেছে তা বুঝিয়ে দিয়ে বলেন যে, "তাঁর সমিতির লক্ষ্য ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।" সেই দিনই চারুচন্দ্র দলভুক্ত হলেন।

অরবিন্দ তার অল্প কিছুদিন পরেই কলকাতায় চলে আসেন—এবং তিনি নিজে, বাল গঙ্গাধর তিলক ও লালা লাজপত রায় পরস্পরের সহযোগী গরমপন্থী নেতা হন। নরমপন্থীদের নেতা ছিলেন মেহতা, গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। সুবোধ মল্লিক ছিলেন অরবিন্দের বিশ্বস্ত পার্শ্বচর।

বঙ্গীয় অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও অধিনায়ক ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র ছিলেন অরবিন্দের বিশ্বস্ত সহযোগী, বাংলায় তাঁকে নাকি পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা গড়ে তোলবার ভার দিয়েছিলেন। দলের নেতাদের মধ্যে কীরকম সহযোগিতা ছিল, সে বিষয়ে চারুচন্দ্রের এই গল্পটি দিয়ে আপাতত অনুশীলন-সমিতি ও বারীন্দ্রের যুগান্তর-কর্মীদের দ্বন্দ্বের দিকটির কথা স্থগিত রাখা যাক্। চারুচন্দ্র লিখেছেন—"১৯০৭ সালে দুজন তরুণ কর্মী এল এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় আমার কাছে। তারা তাদের লাট হিউয়েট সাহেবকে মারবে বলে একটা তৈরি বোমা চাইতে এসেছে। তাদিকে বিশ্বাসযোগ্য লোক মনে হল, তাই আমি আমাদের নিজের একজন ছেলেকে দিয়ে প্রয়াগে বোমা পাঠিয়ে দিলাম। দিন দুই বাদে ছেলেটি ফিরে এসে খবর দিলে যে লাজপত রায় হিউয়েটকে মারা বন্ধ করে দিয়েছেন এই বলে যে তিনি তাঁর এলাকাতে কখনই কোন খুনোখুনি চান না। আমি যখন গরম হয়ে কর্তাকে একথা জানালাম তখন তিনি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, লাজপত তা বলতে পারে।' আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে একটা ভাগাভাগি ব্যবস্থা আছে বই কি!" পাঞ্জাবে, বিহারে, উত্তরপ্রদেশে, মহারাষ্ট্রে, বাংলায়—সর্বত্রই দেশজোড়া গুপ্ত সমিতির কাজ চলছে তখন। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বী 'অহংবোধ' জেগে উঠেছিল। যাঁরাই বিপ্লবী সংগঠনে কাজ করেছেন তাঁরা জানেন অহংকার বিপ্লবের শত্রু।

আমিত্ব ধ্বংস করা কি সহজ কথা? কর্তা-'আমি', ভোক্তা-'আমি' কি বিনা তপস্যায় যায়? কিন্তু ভক্তির গুণেই ঐশী জননীর [অরবিন্দের 'ডিভাইন মাদার'-এর এই বঙ্গানুবাদ করা গেল] কাছে সর্বস্ব সমর্পণ সম্ভব হবে। তিনি নিজে লিখেছেন—এবং পরে তুমি অনুভব করবে যে, সেই ঐশী শক্তি কেবল যে তোমাকে প্রেরণা দেন ও পরিচালিত করেন, তা নয়—তিনি তোমার কাজ আরম্ভ করিয়ে দেন এবং কাজ করেও দেন; তোমার যাবতীয় জীবনগতি তাঁরই প্রবর্তনায় সাধিত, তোমার সকল শক্তি তাঁরই, এই বহির্জগতে তাঁর প্রকাশের জন্য তোমার মন, প্রাণ, জীবন ও শরীর তাঁরই। কর্মের ও লীলার চিৎপ্রণোদিত প্রসন্ন যন্ত্র।[২৭] নিষ্কাম কর্মী হও, নিষ্কাম ভক্ত হও, নিষ্কাম জ্ঞানী হও—মনে হয় এই নির্দেশই তাঁর সর্বসমর্পণের মূল ইঙ্গিত। দম্ভ যাক, গর্ববোধ যাক, সন্দেহ ঘুচে যাক—এই কথাই তিনি বারবার বলেছেন।

২৭। 'দি মাদার', পৃষ্ঠা ২২ দ্রষ্টব্য।

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে' (জিজ্ঞাসা, জুন, ১৯৬১) বইয়ে ১৯০৮-এর ২রা মে বোমার মামলায় অরবিন্দের গ্রেপ্তারের আগেই বরোদায় মহারাজের নিমন্ত্রণে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে নিবেদিতার বরোদায় উপস্থিতির কথাসূত্রে লিখেছেন যে, হয়তো সেই সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হবার তিনি আর একটি সুযোগ পেয়ে থাকবেন। তার আগে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে স্বামীজী অরবিন্দের মাতামহ বৃদ্ধ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রাজনারায়ণ বসুকে দেওঘরে দেখতে যান। আমেরিকা-যাত্রার আগেও রাজনারায়ণের সঙ্গে স্বামীজী দেখা করেন। হয়তো রাজনারায়ণবাবুও তাঁর দৌহিত্র অরবিন্দের মনে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলেছিলেন।[২৮]

আধ্যাত্মিক তাড়নাই অরবিন্দকে রাজনৈতিক দিকেও প্রেরণা জুগিয়েছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে মেদিনীপুরে বাংলা প্রাদেশিক সম্মিলনে নরমপন্থী ও গরমপন্থীর ভেদ সুস্পষ্ট হয়। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কথায়—'এই সুরাটের পূর্বাভাষ।' তারপর ১৯০৭-এর ডিসেম্বরে কংগ্রেসের অধিবেশনে দক্ষযজ্ঞ ঘটে যায়। তিলক ছিলেন গরমপন্থীদের নেতা। "তিলককে জিজ্ঞাসা না করেই শ্রীঅরবিন্দ মহারাষ্ট্রের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে মঞ্চের উপর যেতে নির্দেশ দেন। তারপর ধ্বস্তাধ্বস্তি, মারামারি।"[২৯] সেই সুরাট-কংগ্রেসের আগেই ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণু ভাস্কর লেলে-র কাছে তাঁর যোগাভ্যাস আরম্ভ হয়েছে। তাঁর ব্রহ্মোপলব্ধিও ঘটে গেছে বলে শোনা যায়। ১৯০৮-এ বোম্বাইয়ে ১৯-এ জানুয়ারি অরবিন্দ 'বর্তমান অবস্থায় কি প্রয়োজন' বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন, সেটিতে একজন লিখেছেন—"এই বক্তৃতায় ধর্ম ও রাজনীতির অপূর্ব মিলন। এই সভায় তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।"[৩০]

তারপর তাঁর গ্রেপ্তার,—হাজতবাস,—বাসুদেব দর্শন—'কারাকাহিনী'তে তাঁর যন্ত্রণা ও উপলব্ধির অভিব্যক্তি! রাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটে গেল তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। হিংসা, সন্ত্রাস, রক্ত, অগ্নি কিছুই কি সম্পূর্ণ মুছে যায়? সে-প্রশ্নের জবাব পাই তাঁর ১৯১০-এর পরবর্তী পর্বে। ১৯১০-এর ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে তিনি চন্দননগরে গিয়ে প্রায় ছয়

২৮। উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৫০-৫২ দ্রষ্টব্য।

২৯। 'ঋষি অরবিন্দ': ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮ দ্রষ্টব্য।

৩০। তদেব, পৃঃ ৮৯-৯০ দ্রষ্টব্য।

সপ্তাহ কাটিয়ে, পয়লা এপ্রিল অন্তর্দেবতার নির্দেশে ডুপ্লে জাহাজে পণ্ডিচেরি-যাত্রা করেন। ৪ঠা এপ্রিল তিনি পণ্ডিচেরিতে পৌছোন। চন্দননগরে পরে যিনি প্রবর্তক সঙ্ঘের গুরু হন, সেই মতিলাল রায় ছিলেন তাঁর আশ্রয়দাতা। অরবিন্দ পণ্ডিচেরি যাত্রার আগেই মতিলাল সুরেশ চক্রবর্তীকে ট্রেনে সেখানে পাঠিয়ে দেন। ৩১-এ মার্চ তিনি সেখানে পৌছে শ্রীনিবাসাচারী ও সুব্রহ্মণ্য-ভারতীকে খবর দেন। অরবিন্দ যখন পণ্ডিচেরিতে পৌছোন, তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন বিজয় নাগ। তিনিও ছিলেন বোমার মামলার অন্যতম আসামী। দুজনেই ছদ্মনামে যান—অরবিন্দের নাম হয় 'যতীন্দ্রনাথ মিত্র' এবং বিজয়কৃষ্ণ নাগের নাম হয় 'বঙ্কিমচন্দ্র বসাক'।

১৩

আবার সেই বাঘ আর ইয়াক আর ল্লামা-র ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভেসে ওঠে মনের মধ্যে! হরিণও সুন্দর; বাঘের হিংস্রতাই কি কম সুন্দর? হরিণ আছে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-প্রবৃত্তির জীব হয়ে। বাঘটাও আছে নিজস্ব অহংবোধ নিয়ে। এই দুনিয়ায় বলশালী জন্তু, দুর্বলের যম। বিশ্বজননী কি হরিণকে বাঘের কবল থেকে বাঁচাতে চান? প্রকৃতির প্রকৃতিই তো মাৎস্যন্যায়ের উদ্দীপনা ঘটানো। কিন্তু যাঁরা কবি, মনীষী, ভূয়োদর্শী, তাঁদের বক্তব্য অন্য রকম। 'পোয়েম্‌স্‌ ইন নিউ মিটার্‌স'-এর মধ্যে 'দি টাইগার অ্যাণ্ড দি ডিয়ার' নামে অরবিন্দের কবিতাটির বঙ্গানুবাদ করা গেল এই সূত্রে—

বাঘ ও হরিণ

অরণ্যের বুকের সবুজে
গুঁড়ি-মারা, ঝুঁকে হাঁটা, ঝক্‌মকে কে সে?
চক্‌চকে চোখ তার, বলিষ্ঠ বুক তার—
ধ্বনিহীন নরম থাবাতে
নিধনের ঝোঁক।

পাতাদের ফাঁকে হাওয়া ভয়ে ভয়ে সরে যাওয়া—
ভয়, পাছে পদশব্দে ঝল্‌মলে জন্তুটা রাগে,
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ভয় যেন।
কিন্তু সেই বিশাল জন্তুটা
গুঁড়ি মেরে, গুঁড়ি মেরে—শেষবার ঝুঁকে সেই
হরিণের ঘাড়ে দেয় নিঃশব্দ ঘাতক এক ঝাঁপ!

অরণ্যের ছায়াময় জলস্রোতে অসংশয়ে
তৃষ্ণা মেটাবার মুহূর্তেও
ছিন্ন হয়ে যাবার ক্ষণেও
স্মৃতি ছিল—একা ঘন বনে
ফেলে এসেছে সে সঙ্গিনীকে—

প্রকৃতির শান্ত শোভা
ছিন্ন হয় তারই নখাঘাতে—
হিংস্র সুন্দরের।
তত্রাচ একদিন হয়তো আসবেও বা
যখন বাঘের
বনের ভয়াল বুকে গুঁড়ি মারা, ঝাঁপ দেওয়া শেষ—
এশিয়ার সমভূমি যেমন ম্যামথ আর দেয়না ঝাঁকুনি।
অরণ্যের পত্রচ্ছায়া পরিবৃত বৃহৎ নির্ঝরে
তখনো সুন্দর সেই বনের হরিণ খাবে জল।
শক্তিতে উন্মত্ত যে, সে পরিণামে মরেই শক্তিতে।
যে নিহত,—সেই বাঁচে ঘাতকেরও পরে।

বোধ হয়, কথাটা অতঃপর এইভাবে মনে দেখা দিতে পারে যে, হিংস্র বাঘেরও রূপান্তর ঘটুক—সে শান্ত হরিণ হয়ে যাক্। রূপান্তর চাই। প্রকৃতির মধ্যেই হিংসাও আছে, শান্ত ভাবও আছে। 'শ্রীঅরবিন্দের দিব্য কর্মযোগ' [অক্টোবর, ১৯৭৪] নামে বইটির সপ্তম পৃষ্ঠায় লেখিকা শ্রীমতী সুধা বসু লিখেছেন—"আসল লক্ষ্য হল রূপান্তর। বিরোধের ফলে শক্তি জাগে, সেই শক্তি দিয়ে বৃত্তির সুষম ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটানোই যোগীর পুরুষার্থ। এইটিই শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের মূল লক্ষণ।" মাতৃভাবনার মধ্যে যোগী অরবিন্দ সেই যোগশক্তিকে জাগ্রত রাখবার ইশারা রেখে গেছেন।

'পূর্ণতা' নামে ছোটো একটি বাংলা নিবন্ধে অরবিন্দ লেখেন "মানুষরূপ মুকুলে ভাগবত-পথের পূর্ণতা লুক্কায়িত, তাহা ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে প্রকৃতি ফুটাইতে সচেষ্ট। যোগ-অভ্যাসে যোগ শক্তিতে সে মহাবেগে ত্বরিতবিকাশে ফুটিতে আরম্ভ করে। লোকে যাহাকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব বলে, মানসিক উন্নতি, নৈতিক সাধুতা, চিত্তবৃত্তির ললিত বিকাশ, চরিত্রের তেজ, প্রাণের বল, সে

দৈহিক স্বাস্থ্য, সে ভাগবত পূর্ণতা নয়। সে প্রকৃতির একটি খণ্ড ধর্মের পূর্ণতা। আত্মার পূর্ণতায়, মানসাতীত বিজ্ঞান-শক্তির পূর্ণতায়, প্রকৃত অখণ্ড পূর্ণতা আসে। কারণ, অখণ্ড আত্মাই আসল পুরুষ, মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক পুরুষত্ব তাহার একটি খণ্ড বিকাশ মাত্র।"

সেই সুদূর সময় থেকে তাঁর লোকান্তরণ অবধি এবং তার তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী অবধি বিস্তীর্ণ সময়প্রবাহে তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে বিশ্বের পাঠক-সমাজের নানা স্তরে নানা চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে। সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি নিজে কী ভেবেছেন? যেসব প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যের কথা বলেছেন, যেসব অনুবাদে তিনি ভারতের মহাকবিদের বাণী ভাষান্তরিত করেছেন, যেসব গীতিকবিতায় তিনি অন্যান্য লেখকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং মৌলিক যেসব কাব্যে-কবিতায় তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন, সেই বিভিন্ন শ্রেণীর রচনা থেকেই সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণার বোধে পৌঁছোতে হবে। অন্যান্য স্রষ্টার মতোই তিনি প্রতীক, রূপক, সংকেতের ভক্ত ছিলেন। জীবনের বহির্ভূমি এবং অন্তঃস্তল দুয়েরই নিরীক্ষায় তিনি নিযুক্ত ছিলেন। ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা, অনুভূতির তরঙ্গ, যুক্তির তাড়না—সবই তাঁকে পেতে হয়েছে। পোপের কবিতাও তিনি পড়েছেন, ব্লেকের কবিতাও। তাঁর অপরিসীম অধ্যয়নক্ষেত্র থেকে আচম্বিতেই দুজনের নাম করা গেল। বোধ হয়, ব্লেক তাঁকে বেশি আকর্ষণ করতেন। বোধ হয়, তিনি একজন যুক্তিনিষ্ঠ, বোধিসন্ধানী, প্রতীকানু-রাগী, ভূয়োদর্শী, শান্ত সাহিত্যিক হতে চেয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যচিন্তা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতেই পরিণতি পেয়েছে। তাঁর জীবন আর তাঁর রচনার মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ ছিল না। তিনি প্রেরণায় বিশ্বাসী। সে প্রেরণা দিব্যপ্রেরণা!

তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য আগেই দেখা গেছে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার পণ্ডিচেরিতে তাঁকে দেখে পুনরায় মুগ্ধ হন।

অরবিন্দের সাহিত্যচিন্তার সূত্রনির্ণয় কঠিন পরিশ্রমের কাজ। তাঁর রচনার বিভিন্ন পর্যায়ের প্রসঙ্গ সুপরিচিত। অধ্যাপক শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর একটি সুলিখিত বাংলা প্রবন্ধে অরবিন্দের প্রতিভা ও প্রকাশবৈচিত্র্যের তিনটি ধারা দেখিয়ে দিয়েছেন—শাস্ত্রার্থ বা তত্ত্বালোচনার দিক, যেমন 'On the Veda,' 'Essays on the Gita', 'The Life Divine'; দ্বিতীয়টি চেতনার বিবর্তন, যোগ ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাখ্যা; তৃতীয়ত তাঁর লিরিক, সনেট, প্রেমোপাখ্যান, সংলাপ, সমালোচনা ও প্রতীকী মহাকাব্য 'সাবিত্রী'।

১৮৮৭-তে ইংলণ্ডে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর প্রথম কবিতা লেখা আরম্ভ হয়। তাঁর 'সাবিত্রী' মহাকাব্য শেষ হয় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে।

তাঁর সাহিত্যচিন্তা পূর্বোক্ত প্রথম দুটি বিভাগের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়, কিন্তু প্রধানত ঐ তৃতীয় বিভাগেই নিহিত। এই দিকটির প্রতি অবহিত থেকে সাহিত্য সম্পর্কে তার ধারণার বিবিধ তথ্য বা সূত্র অনুভব করা সম্ভব। এই আলোচনায় এই রকম সাতটি সূত্রের অবতারণা ঘটেছে।

আত্মাবিষ্কার ও আত্মোপলব্ধিই বোধ হয় এই সপ্ত সূত্রের মূল সূত্র। সেটির উপস্থাপনা কি কেবলমাত্র সমালোচনার বিশ্লেষণবুদ্ধির অধিগম্য? তা কি গদ্যে বর্ণনীয়? সে কি শুধু বিষয়ের বর্ণনা? সে কি সূত্র মাত্র?

রবীন্দ্রনাথের যুক্ত করপল্লবের 'নমস্কার'ই এইসব প্রশ্নের যোগ্য উত্তর। বাংলা সাহিত্যের লেখকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁকে সর্বাধিক উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং ভারতের বৈদিক সাহিত্য, গীতা,রামায়ণ, মহাভারত তাঁকে জীবন-সচেতন করেছিল। রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে তাঁরও বেশ কয়েকটি ছোটো কবিতার ভাবগত মিল আছে। ১৮৯৫ থেকে ১৯০৮-এর মধ্যে লেখা অরবিন্দের 'শর্ট পোয়েম্‌স্'-এর মধ্যে 'God' নামে কবিতাটির বঙ্গানুবাদ পরে দেওয়া হোলো। তাঁর Last Poems বইখানিতে সংকলিত একটি কবিতার নাম 'The Hidden Plan'। সে কবিতাটির বঙ্গানুবাদ করা গেল। বাংলায় এই কবিতার শিরোনাম দেওয়া গেল 'নিহিত অভীপ্সা'।

নিহিত অভীপ্সা

যতোই সুদীর্ঘ হোক রাত্রির তিমির, তবু আমি
স্বপ্নেও বলবো না এই ছোটো-আমি ব্যক্তির মুখোশ
আমাদের এ-জীবনে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ইচ্ছাই,
প্রকৃতির বিশ্বকর্মে শেষ ফল,—চূড়ান্ত ঘটনা।

আরো এক মহনীয় অস্তিত্বের লীলা তার বুকে,
তারই অভিব্যক্তি রচা চলে দীর্ঘ সময়প্রবাহে;
পাথরে পশুতে সেই ভাগবতী শক্তিরই প্রকাশ,
শাশ্বত সময়ে সে তো জ্যোতির্ময় ব্যক্তিরূপ এক।

মনের রচিত সীমা দীর্ণ ক'রে হবে সে উদিত,
পূর্বজ্ঞানী অন্তর্যামী হবে সাক্ষী সেই ঘটনার।

এই জড় অন্ধতার মধ্যেও সে ব্যক্ত করে দেবে,
এই প্রকৃতিতে যিনি অচেতনে সুদীর্ঘ-গুণ্ঠিত।
ঘটাবে বিস্ময়কর গূঢ় অভীপ্সার রূপায়ণ
বিশ্বব্যাপী মৃত্যুহীন আত্মার প্রকাশ নবরূপে।

তাঁর ঐ সংকলনের আর একটি কবিতার নাম 'The Divine Hearing'—যার বাংলা অনুবাদে বলা যায় 'ঐশ্বরিক শ্রুতি'। এই অনুবাদও বর্তমান লেখকের।

ঐশ্বরিক শ্রুতি

সব শব্দ সব স্বর হয়েছে তোমারই
গান, বজ্র, পাখির কাকলি,
জীবনের দুঃখ আর আনন্দের ধ্বনি
মানুষের বাক -ছন্দ মর্মরিত কথা ;

সমুদ্রের সুবিশাল ফুর্তির হাসিও,
বিজিত আকাশে গুম্‌ গুম্‌ প্লেনের আওয়াজ,
মাটিকে বেগের শিঙা শোনায় মোটর,
যন্ত্রের ঘর্ঘর,—ক্ষুব্ধ সাইরেনের সুতীক্ষ্ণ হুঙ্কার।

শূন্যের বিস্তারে কে যে ফুঁ দিয়ে বাজায়
দূরের আহ্বান কোন্ রহস্যের ডাক,
রৌদ্রোজ্জ্বল দেশ আর সমুদ্র-পথের স্মৃতি সব
এখন তোমারই কথা, তোমারই অবাক সুরময়।
অন্ধ এ অন্তরে এক গূঢ় সুর ঢোকে চুপে চুপে,
সকলই সুন্দর হোলো তুমি আছ, তুমি আছ ব'লে!

এইসব রচনার মধ্যে প্রত্যয়ের উপলব্ধি রণিত হয়েছে। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের নানা উক্তি। গীতিমাল্যের ৮৪ সংখ্যক গানে দেখা যায়—

আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।
কত জনম-মরণেতে
তোমারি ওই চরণেতে
আপনাকে যে দেব তবু
বাড়বে দেনা।

কবি অরবিন্দের পূর্বোক্ত শেষ কবিতাগুচ্ছের আর একটি কবিতা এই সূত্রে মনে পড়ে—যার নাম—'The Self's Infinity'; বঙ্গানুবাদে বলা যায়—'সত্তার অসীমতা':

সত্তার অসীমতা

কাল-সূচনার আগে যা ছিলাম হয়েছি তাই,
নিভৃত ছোঁয়াতে শান্ত এখন চিন্তা ও বোধ।
প্রকর্তা মন যা রচনা করে, সবই চলে যায়—
নিশ্চুপ মহাশূন্যে মিশতে কী গরিমায়!

জীবন আমার স্তব্ধতা এক কালাতীত হাতে ধরা,
জগৎ ডুবেছে চির অপলক চাহনিতেই।
সাজ খুলে ফেলে নগ্ন আমার আত্মা দাঁড়ায়
বিস্তার চাই,—তাই একা নিজ সত্তাময়।

হৃদয় আমার অসীমের এক কেন্দ্র জানি,
আত্মার মহাবিস্তারে দেহ বিন্দু এক।
যা-কিছু অস্তি সবারই যা আদি,—আমাতে লীন—
যা একদা ছিল আবৃত বিশাল অজ্ঞানে।
নিমেষবিহীন এই ভূমা জানি শুচি ও শূন্য,
প্রসারিত আমি শাশ্বত সারা বিশ্বময়!

সাহিত্যের উৎস, সৃষ্টি, আবেদন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস বলতে যা বোঝায়, সে হোলো মর্তবাসী শিল্পীর এই ভূমাব্যাপী আত্মতা-বোধে নিহিত। তুমি-আমি বোধের দ্বৈততা নিঃসন্দেহে সুনিশ্চিত অদ্বৈতের আনন্দে গিয়ে মিশেছে।

১৪

কবি এ. ই. (জর্জ ডব্লিউ রাসেল) ডাবলিন থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারির এক চিঠিতে দিলীপকুমার-প্রেরিত শেঠ্‌নার কয়েকটি কবিতা সম্বন্ধে দিলীপকুমারকে লিখেছিলেন—"the only advice one writer can give to another rightly is technical criticism. The

craft of any art, painting music, poetry, sculpture, is continually growing and much can be taught in the school. But the inspiration cannot be passed on from one to another."[৩১] অর্থাৎ তাঁর কথা ছিল এই—শিল্পের আঙ্গিক নিত্যই বদলাচ্ছে এবং এক শিল্পী অন্য শিল্পীকে সেই আঙ্গিক সম্বন্ধেই পরামর্শ দিতে পারেন, একজনের প্রেরণা তো অন্যজনকে দেওয়া যায় না।

কবিতাসৃষ্টি সম্বন্ধে অরবিন্দের মন্তব্য ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুনের এক চিঠিতে এইভাবে পাওয়া যায় যে, তিনটি উপাদানের দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে—(১) প্রেরণার মূল উৎস সম্বন্ধে, (২) সৃজনী সৌন্দর্যের শক্তি—যার ফলে কবিতাটি বস্তু ও রূপ পায়, সেদিকে—(৩) কবির সেই যোগাযোগের চেতনা —যে শক্তিতে তিনি তা পাঠকের পক্ষে অধিগম্য করেন, সেই দিকেও। শ্রেষ্ঠ কবিতার ক্ষেত্রে এই তৃতীয় দিকটি প্রথম দুটির কাছে সমর্পিত থাকে এবং স্বচ্ছতম ও অবাধ অবস্থায় প্রেরণাই কবিকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়।[৩২] যদি দ্বিতীয়টি বেশি তীব্র হয়, তাহলে কবিতা হিশেবে রচনাটি শক্তিময়ী হলেও শ্রেষ্ঠ হয় না। তৃতীয় উপাদানের ক্ষেত্রে যদি আলসেমি ঘটে, তাহলে কবিতা ব্যর্থ হয়ে যায়। অরবিন্দ যাকে বলেন vital এবং mental—অর্থাৎ প্রাণ-শক্তি ও মননের শক্তি, সেখান থেকেও প্রেরণা আসতে পারে। কিন্তু সর্বাধিক প্রেরণা—তাঁর মতে,—"When you get something from the illumined mind, then you produce something really fine and great"। তিনি 'illumined mind' এবং 'overmind' শব্দ দুটি এক্ষেত্রে সমার্থকভাবে ব্যবহার করেননি। এরা অভিন্ন নয়,—দুটি পৃথক স্তর; কারণ 'পত্রগুচ্ছের' পরের চিঠিতে (অমলকে লেখা) দেখা যায়, তিনি এই ক্রম ব্যবহার করেছেন—overmind হোলো শীর্ষতম এবং the plane between the illumined mind and the overmind হোলো সৃজনী চেতনার বা সৃজন-বোধির শীর্ষস্তর—"the highest intuitive consciousness"।

পৃথিবীর এই প্রতিদিনের সীমাবদ্ধ সংসারে ব্যক্তিমনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার তাৎপর্য কী? গীতবিতানের ৮৯ সংখ্যক গানে রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—

৩১। "অনামী" : দিলীপকুমার রায়, 'পত্রগুচ্ছ' পৃষ্ঠা ২৭২-৭৩ দ্রষ্টব্য।

৩২। ঐ পৃঃ ২৭৫।

আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে-জন ভাসায়।
যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে,—ভালোবাসে
আড়াল থেকে –
আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায়।

এই মর্ত্য অস্তিত্বের মধ্য দিয়েই মানুষের চেতনা উত্তরোত্তর অদ্বৈত ভূমা-বোধের স্বাদ পাবার অধিকারী হয়ে ওঠে। গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরেজি প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য-পাঠের মধ্য দিয়ে ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃত কবি ও কাব্যের আস্বাদনসূত্রে এবং নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও দেশগত জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অরবিন্দের মন শিল্পের এই বিশেষ ধারণায় পৌঁছেছিল যে, মর্ত্য অভিজ্ঞতাই সকল কলাসৃষ্টির মূলে বিগুমান,—কিন্তু দৃশ্য থেকে অদৃশ্যের দিকেই তার গতি,—সীমা থেকে অসীমের দিকে। বিশেষ বিশেষ চিত্র রচনার উৎস এই দৃশ্যমান জগৎ, কিন্তু কাব্য এক লোকোত্তর সৃষ্টি। কবি হলেন স্রষ্টা। তাঁর নিজের কথায়—
"All art starts from the sensuous and sensible, or takes it as a continual point of reference or at the lowest, uses it as a symbol and a fount of images; even when it soars into invisible worlds, it is from the earth that it soars; but equally all art worth the name must go beyond the visible, must reveal, show us something that is hidden, and in its total effect not reproduce but create."

তাঁর সাহিত্য-ধারণার প্রথম সূত্র হোলো এই মর্ত্য উপকরণ থেকে দৃশ্যাতীত গুহাহিত সত্যোদ্ঘাটনের গতিপথে আস্থা। অর্থাৎ প্রথম কথা—মাটিকে ছুঁয়ে মাটি থেকে উত্তরণ। দ্বিতীয় প্রাসঙ্গিক কথা,—শ্রেষ্ঠ কবিদের সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব শ্রেণীবিচারের প্রয়াস।

১৯১৪ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে 'আর্য' পত্রিকা পরিচালনার সময়েই তিনি The Future Poetry সম্পর্কিত আলোচনামালা রচনা করেন এবং সেই পর্বের পরেও নানা পত্রে, নানা মন্তব্যে কবিতার সত্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণার কথা তিনি জানিয়ে গেছেন। আমার অন্যত্র আলোচিত একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করে এই আলোচ্য দ্বিতীয় কথাটির উল্লেখ করতে চাই—তাঁর

চিঠিপত্রের সম্পাদনায় বিভিন্ন বিভাগের উল্লেখ আছে—"শেষ বিভাগের মধ্যে 'Poets—Mystics, Intellectuals' শিরোনামে সংকলিত প্রথম রচনাটির নাম দেওয়া হয়েছে 'The Poet and the Yogi'। এই পর্যায়ের মধ্যেই ৩১. ৩. ১৯৩২ তারিখের এক চিঠি থেকে জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের সম্বন্ধে তিনি যে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন, সে-প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে হোমর, শেক্‌স্‌পীয়র, বাল্মীকি,—দ্বিতীয় শ্রেণীতে দান্তে, কালিদাস, ঈস্‌কিলস, ভার্জিল এবং মিলটন,—আর তৃতীয় শ্রেণীতে গ্যেটের নাম করা হয়েছিল।

দান্তে, মিলটন প্রভৃতি কেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে, গ্যেটে কেন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়বেন, সে বিষয়ে স্বভাবতই কৌতূহলী পাঠকের মনে সংশয়চিহ্নিত প্রশ্ন জাগে। কিন্তু তিনি বিশদ ভাবে সংহত কোনো জবাব দেননি। এই সূত্রে কবিদের সামর্থ্য বিচারের নিরিখ কী হবে সে-বিষয়ে তিনি তাঁর ধারণা প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর ধারণা—"The first three have at once supreme imaginative originality, supreme poetic gift, widest scope and supreme creative genius"।

এখানে imaginative gift, widest scope ইত্যাদি লক্ষণগুলি ঠিক একটির সঙ্গে আর একটির সংযোজন নয়। কল্পনাশক্তির মৌলিকতা আর বিষয়বস্তুর বিস্তার—এই দুটি ব্যাপার নিঃসন্দেহে পৃথক ভাবে চিন্তা করার বিষয়; কিন্তু 'supreme creative genius' বা পরমা সৃজনী প্রতিভার সত্যে এইসব লক্ষণই যে ওতপ্রোত ভাবে আশ্রিত, তাতে সন্দেহ নেই। অতএব তাঁর মূল কথা ছিল, বিষয়ের সেই বিস্তারলক্ষণের অভিপ্রায়ী, যাতে খণ্ড ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ব্যাপার বৃহৎ পরিসরের অন্তর্লীন হয় এবং তিনি এই কথা বলতে চেয়েছিলেন যে মৌলিক কল্পনাশক্তির গুণেই তা সম্ভব। মনে প্রশ্ন জাগে, দান্তে বা মিলটন বা গ্যেটের ক্ষেত্রে তা কি ঘটে নি?[৩৩]

'Notes on the Mahabharata' নামে নিবন্ধের সূচনাতেই তিনি লেখেন—"The Mahabharata, although neither the greatest nor the richest masterpiece of the secular literature of India, is at the same time its most considerable and important body of poetry"। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত অধ্যাপক ওয়েবারের মহাভারত-সম্পর্কিত মতামতের সমালোচনা আছে এই আলোচনায়,—মহাভারত কাব্যের

৩৩। বর্তমান লেখকের 'সাহিত্য বিচিন্তা' দ্রষ্টব্য।

আয়তন ঠিক কতো শ্লোকে, কতো পর্বে আশ্রিত, সেসব প্রসঙ্গে মতামত আছে,—তবে সে উল্লেখ বর্তমান আলোচনায় স্থগিত থাক। মূল মহাভারত চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ, এই ধারণা একভাবে মেনে নিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে তিনি সর্বাধিক পৌরুষধর্মী লেখক বলেছিলেন, এবং কোল্‌রিজ-কথিত "প্রতিভার রমণীধর্ম" সম্পর্কিত মন্তব্য থেকেই তাঁর এই মন্তব্য স্থচিত হয়। এখানে তাঁর নিজের উক্তি তুলে দেখা যেতে পারে—"Vyasa is the most masculine of writers. When Coleridge spoke of the femineity of genius he had in mind certain features of temperament which, whether justly or not are usually thought to count for more in the feminine mould than in the masculine, the love of ornament, emotionlism, mobile impressionability, the tyranny of imagination over the reason, excessive sensitiveness to form and outward beauty, tendency to be dominated imaginatively by violence and the show of strength; to be prodigal of oneself, not to husband the powers to be for showing them off; to fail in self-restraint is also feminine"।

প্রতিভার 'রমণীস্বভাব' সম্পর্কে কোল্‌রিজ যে এসব লক্ষণের কথাই ভেবেছিলেন, এই ধারণা প্রকাশ ক'রে তিনি লেখেন—"All these are natural properties of the quick artistic temperament prone to lose balance by throwing all itself outward and therefore seldom perfectly sane and strong in all its parts"। এসব লক্ষণ কোল্‌রিজের নিজের মনোধর্মেই বদ্ধমূল ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন—"So much did these elements form the basis of Coleridge's own temperament that he could not perhaps imagine a genius in which they are wanting. Yet Wordsworth, Goethe, Dante and Sophocles show however that the very highest genius exist without them."

গ্যেটে, দান্তে, ওয়ার্ডস্বার্থ, ও সোফোক্লিসের নামোল্লেখ ক'রে অতঃপর তিনি লেখেন—"But none of the great poets I have named is

so singularly masculine, so deficient in femineity as Vyasa, none dominates so much by intellect and personality, yet satisfies so little the romantic imagination."

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পূর্বোক্তনামাদের মধ্যে গোটে ও দান্তেকেও তিনি শ্রেষ্ঠ পৌরুষময় কবি বলেছেন। জগতের বিভিন্ন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের শ্রেণী-নির্ণয়ের এই প্রয়াসে হোমর, শেক্‌স্‌পীয়র, বাল্মীকির সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকেও তিনি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে মেনেছেন। তাঁর সাহিত্য-ধারণার পূর্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্র—অর্থাৎ সাহিত্যের শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে তৃতীয় সূত্রে আর একটি প্রসঙ্গও পাওয়া গেল—যাকে বলা যায়, কাব্যের রমণীধর্ম ও পৌরুষের ভেদ।

কবিত্বে বাল্মীকি আর ব্যাসদেব পরস্পরের বিপরীত। বাল্মীকির রামায়ণে দিব্য ও বিশালের একত্র সমাবেশ এবং কবিপ্রতিভার এক আশ্চর্য নমনীয়তা লক্ষ্য করেছেন তিনি—"a flexible and universal genius embracing the Titanic and the divine, the human and the gigantic at once or with an inspired ease of transition"। তাঁর মতে, ব্যাসদেবের প্রকৃতি কিন্তু অন্য রকম। তিনি অলঙ্কারমনস্ক নন; তিনি আতিশয্যবিমুখ;—শ্রীকৃষ্ণের শক্তির বিশালতা বোঝাবার জন্যে তিনি শুধু 'অপ্রমেয়' শব্দটি ব্যবহার করেই পাঠককে অভিপ্রেত যথাযথ উপলব্ধিতে চালিত করেন। ব্যাসদেব তাঁর কাব্যের লিপিকর গণেশের অতিশয় দ্রুত লিখনের মধ্যে নিজের ধ্যানের সুযোগ যাতে অব্যাহত থাকে, সেজন্যে প্রয়োজন মতো ব্যাসকূট রেখে যেতে পারেন অবলীলাক্রমে। এই সব গুণের বিশদ আলোচনা ক'রে ব্যাসদেবের রচনায় অরবিন্দ দেখেছেন—বিশুদ্ধি, শক্তি, মনন ও ব্যক্তিত্বের মহিমা—'Pureness, strength, grandeur of intellect and personality'। প্রসঙ্গত Worsdsworth ও বাল্মীকির সমধর্মিতার কথাও তিনি বলছেন—"There are some poets who are the children of Nature whose imagination is made of her dews, whose blood thrills to her with the perfect impulse of spiritual kinship ; Wordsworth is of these and Valmiki"।

প্রকৃতির রূপে অভিভূত এইসব কবিদের অগোচরেই তাঁদের কণ্ঠস্বর

গাঢ় হয়ে ওঠে—"Their voices in speaking of her unconsciously become rich and liquid and their words are touched with a subtle significance of thought or emotion"।

শেক্‌স্‌পীয়র, কীট্‌স, কালিদাস—এই তিনজনের নাম করে সৌন্দর্য-চেতনার ব্যাপারে অরবিন্দ এঁদের পরিণততর সংবেদনশীলতার কথা বলেছেন। ধ্রুপদী সাহিত্যের কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বচ্ছ বুদ্ধিদিগ্ধ ভাস্বরতাও লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু আরো একটি কথা উল্লেখ করা দরকার; সেটি পৃথক অনুচ্ছেদে বলা হোলো।

তাঁর সাহিত্য-চিন্তার দ্বিতীয় প্রসঙ্গ—কবিদের শ্রেণীনির্দেশনার ব্যাপারে তিনি তাঁর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ মার্চ তারিখের পূর্বোক্ত চিঠিতে যেসব কবিদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে স্থাপিত করেছিলেন, তাঁর অন্যান্য আলোচনায় সেই বিভাগ-বিন্যাস তিনি নিজেও সুনিরূপিত বলে মানেননি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থাপিত কবি দান্তেকে এবং তৃতীয় শ্রেণীতে স্থাপিত গ্যেটেকে তিনি যে তাঁর 'Vyasa and Valmiki' নামক গ্রন্থের 'Notes on the Mahabharata' নিবন্ধে শ্রেষ্ঠ পৌরুষধর্মী কবি বলেছেন, একটু আগেই তা দেখা গেছে।

আবার, ১৯৩২-এর পত্রগুচ্ছে শেলি, কীট্‌স, ওয়ার্ডস্বার্থকে তিনি যথার্থ বড়ো কবি বলতে সম্মত হননি, তাঁদের 'ভালো' কবিতার লেখক বলেছিলেন বটে, তবে মহৎ স্রষ্টা বলতে পারেননি—"their best work is as fine poetry as any written, but they have written nothing on a larger scale which would place them among the greatest creators."। আবার, একটু আগেই দেখা গেছে, প্রকৃতির কাব্যে বাল্মীকির সঙ্গে ওয়ার্ডস্বার্থের সমধর্মিতার লক্ষণ তিনি মেনেছেন,—কীট্‌সের সৌন্দর্যচেতনার অভিব্যক্তি তাঁকে শেক্‌স্‌পীয়র ও কালিদাসের সামর্থ্যের সমযোগ্যতার কথা ভাবিয়েছে। এইভাবে তাঁর ১৯৩২-এর সেই চিঠিতে কবিদের শ্রেণীনির্ণয়-প্রয়াসের প্রতি দৃষ্টি রেখে আলোচ্য প্রসঙ্গে তাঁর সাহিত্য-সম্পর্কিত ভাবনার পূর্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রটি এইভাবে ব্যক্ত হতে পারে যে, তিনি বৃহৎ বিস্তীর্ণ পরিসরের কাব্যেই 'supreme imaginative originality' ও 'supreme poetic gift'-এর অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণেই তিনি তা সর্বাধিক পরিমাণে অনুভব করেন।

পূর্বোক্ত 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' বইটিতে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের উক্তি এই সূত্রে মনে পড়ে। দীনেন্দ্রকুমার লিখে গেছেন—"ব্যাস অপেক্ষা আদিকবি বাল্মীকির তিনি অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। বাল্মীকির ন্যায় মহাকবি পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই, ইহাই তাঁহার ধারণা। তিনি বলিতেন, 'মহাকবি দান্তের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, হোমারের 'ইলিয়াদ' পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম;— ইউরোপের সাহিত্যে তাহা অতুলনীয়। কিন্তু কবিত্বে বাল্মীকি সর্বশ্রেষ্ঠ। রামায়ণের তুল্য মহাকাব্য পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই।"

মহাকাব্যের প্রতি এই সর্বাধিক আগ্রহই তাঁর সাহিত্য-ভাবনার চতুর্থ সূত্র। ইতিপূর্বে তৃতীয় সূত্রটির বিস্তৃত উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় সূত্রের পর্যালোচনা সূত্রেই এই চতুর্থ সূত্রটি পাওয়া গেল।

বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদন উভয়ের প্রতিই তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। মেঘনাদ-বধ কাব্য প্রসঙ্গে তাঁর এই চিন্তাটুকু এখানে প্রাসঙ্গিক—"I had once the regret that the line of possibility opened out by Michael Madhusudan was not carried any further in Bengali poetry; but after all it may turn out that nothing has been lost by the apparent interruption. Magnificent as are the power and swing of his language and rhythm, there was a default of richness and thought matter, and a development in which subtlety, fineness and richness of thought and feeling could learn to find a consummate expression was very much needed"। অর্থাৎ, মেঘনাদবধ কাব্যের ধারায় বাংলায় সার্থকতর অন্যান্য মহাকাব্য দেখা দিক, এই ছিল তাঁর কামনা। মধুসূদনের ভাষা ও ছন্দের তিনি প্রশংসা করে গেছেন, তবে গভীরতর মননের বস্তু না থাকায় সে-কাব্যে ঐশ্বর্যের অভাব ঘটেছে বলে তাঁর বিশ্বাস। তিনি মহাকাব্যের আরও সূক্ষ্ম অভিব্যক্তিকলা চেয়েছিলেন। তাঁর 'সাবিত্রী' কাব্য রচনার মূলে সে-চিন্তা অবশ্যই তাঁর শিল্পিমনে তরঙ্গ সঞ্চারিত করেছিল।

বিভিন্ন সাহিত্য-সৃষ্টির তুলনাভিত্তিক আলোচনায় তাঁর ছিল অবাধ ও সাবলীল সামর্থ্য। এটিকে এই অনুসন্ধানের পঞ্চম সূত্র বললে আপত্তি হবে কি? এর আগেই এরকম বিভিন্ন তুলনা-প্রয়াসের কথা বলা হয়েছে। এখানে আর একটি নিদর্শন দেওয়া যাক। 'ঋতুসংহার' সম্পর্কে আলোচনা-সূত্রে

ভারতের কালিদাসের সঙ্গে আঠারোর শতকের ইংরেজ কবি Thompson-এর নাম করেছেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে কালিদাসকে বলেছেন 'one of the greatest world-poets',—টম্‌সনকে বলেছেন 'eighteenth century versifier'। কালিদাসের দোষ গুণ দুইই তিনি দেখিয়েছেন। টমসনের ব্যর্থতার কথা জানাতে গিয়ে লিখেছেন—"instead of creating he tried to photograph"। কাব্যে প্রকৃতির ভূমিকা কী? সে বিষয়ে প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের তত্ত্বটি তিনি এইভাবে জানিয়েছেন—"Nature interpreted by Wordsworth as a part of his own and the universal consciousness, by Shakespeare as an accompaniment or note in the orchestral music of life, by more modern poets as an element of decoration in the living world picture is possible in poetry ; as an independent but dead existence it has no place either in the world itself or in the poets' creation"।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'Kalidasa' নামে ইংরেজি বই থেকে এই উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হোলো। কালিদাসের প্রধান কাব্যগুলির বিশিষ্ট কবিত্বগুণ যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 'ঋতুসংহার' কাব্যেও বেশ অনুভব করা যায়, একথা তিনি নানা উদাহরণ সহযোগে দেখিয়ে গেছেন। কালিদাসের সঙ্গে তুলনায় বাণভট্ট ও ভবভূতিকে তিনি শব্দবহুলতা ও বর্ণনাতিশয্যের দোষে অভিযুক্ত করেছেন। এসব রীতি—অর্থাৎ তুলনার বহুলতা, বিশ্লেষণের বিস্তার তাঁর সাহিত্য-সম্পর্কিত আরো নানা রচনায় ছড়িয়ে আছে, কিন্তু কালিদাস প্রসঙ্গে তিনি এমন একটি তত্ত্বের প্রতি তর্জনী সংকেত করেছেন যেটিকে তাঁর সাহিত্য-চিন্তার বিশেষ এক উপলব্ধি বলা চলে। ব্যাসের মধ্যে তিনি যেমন পৌরুষ ও মননগুণ দেখেছিলেন, কালিদাসের কাব্যে তেমনি ইন্দ্রিয়বোধ। তিনি যে শুধু মহাকাব্যের বিশাল পরিসর-অনুরাগেই আচ্ছন্ন ছিলেন, তা নয়। কবিতায় জীবনানন্দের কবিতা পড়তে গেলে একালের বাংলা কবিতা-পাঠক যেমন জগৎ ও জীবনের বহু বিচিত্র ইন্দ্রিয়বোধ অতুলনীয়ভাবে হৃদয়সংবাদী ব'লে অনুভব করেন, কালিদাস-প্রসঙ্গে অরবিন্দ সেইরকমই অনুভব করে গেছেন—"A vivid and virile interpretation of sense-life in Nature, a similar interpretation of all elements of human life

capable of greatness or beauty seen under the light of the senses and expressed in the terms of an aesthetic apprecia-tion, this is the spirit of Kalidasa's first work as it is of his last।" কবিতার ইন্দ্রিয়সংবেদনগুণ সম্বন্ধে তাঁর এই ধারণাই তাঁর সাহিত্যচিন্তার ষষ্ঠ উল্লেখযোগ্য সূত্র বলে মনে হয়।

এইসব সূত্র বা চিন্তাধারা পৃথিবীতে অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার নয়। তাঁর মতন মনোযোগী পরিশ্রমশীল, নিষ্ঠাসম্পন্ন লেখক ও পাঠকের মনে সাহিত্য সম্বন্ধে অপরিমেয় চিন্তা-তরঙ্গের ধারা বয়ে গেছে। সেই স্রোতোধারার সম্পূর্ণ পরিচিতি তাঁর প্রাসঙ্গিক রচনাবলী অধ্যয়ন ব্যতিরেকে পাওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতিতে যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অশেষ সম্ভাবনা বিগুমান, সে তো ইন্দ্রিয়ানুভূতিতেই নিঃশেষিত হবার জন্যে নয়। সৌন্দর্য আমাদের হার্মনি বা সৌষম্যের আনন্দে পৌঁছে দেয়। সাহিত্য-চিন্তার এই ষষ্ঠ সূত্রের যোগটি-ই আসল কথা। অতঃপর এখানে পর পর তাঁর তিনটি কবিতার অনুবাদ দেখে নেওয়া যাক। এই অনুবাদগুলিও বর্তমান লেখকের।

মূল রচনা (একটি সনেট)

Surrender : *Thou of whom I am the instrument*···

তোমাকে

যে তোমার আমি যন্ত্র, হে সেই সঙ্গোপন,
আত্মা এবং প্রকৃতি—যাদের আমাতেই ঘর,
আমার সকল নরসত্তাই পাক্ সে নমন,
হোক্ অচপল দিব্য তোমারই গুণনির্ভর।

যাতে তব ভাব বহে মোর মনে, সে-খাত খননে
মনকে সঁপেছি,—যদস্তি তব অভিপ্রায়,
তদস্তু মোর ; রেখোনা পৃথক,—যা ছিল পিছনে—
যাক্ মুছে যাক্ ; অকথন সেই আলোক-মেলায়।

তোমার প্রেমের নিখিলস্পন্দে হৃৎ-স্পন্দন
ঘটুক আমারো ; মর্ত্য কর্মে হোক্ ইঞ্জিন
এই দেহ ; আর, বহুক্ স্নায়ুতে প্রাণকম্পন,
তব শক্তির জ্যোতির পাহারা এই মনোলীন।

শুধু দিও কাজ আত্মাকে চিরনিযুক্তির
সব রূপে সব জীবে-জীবে তব চির-আরতির।

আর একটি—

মূল রচনা

God : Thou who pervadest all the worlds below.

ঈশ্বর

যে তুমি রয়েছ পরিব্যাপ্ত নিচে সারা দুনিয়াতে
অথচ ঊর্ধ্বাসীন,
যারা কাজ করে, শাসন করেও,
জানে—
সকলের প্রভু, মমতার তুমি দাস।
কীট হবে ভবে যে জাতক আহা,
তাকেও করোনা ঘৃণা;
মাটিকেও নয়,
কাকেও করোনা ঘৃণা।
জানি তাই,
সেই বিনম্রতাই তুমি।

আর একটি—

মূল রচনা

One Day, and all the half-dead is done

একটি দিন

একটি দিন, আর যা-কিছু আধমরা সমাপ্ত;
একটি দিন, আর অজাত সকলেরই আরম্ভ;
একটু পথ, আর মহান্ সেই পথশেষের যা।
একটু ছোঁয়াতেই দিব্য পূর্ণের সঙ্গলাভ।

পাহাড়ের পরে পাহাড় পেরিয়ে আসা গেছে, এবং আজ—
ভাখো কী নিদারুণ বিশাল সংকট অতঃপর,
কী বিপুল পাহাড়,—যা আজও মাড়ায়নি, কেউই মাড়ায়নি।

আর এক সিঁড়ি শুধু, ততঃপর—
বিরতিবর্জিত আকাশ, শেষহীন কী ঈশ্বর!

সাধারণ সাহিত্যরসিকতা ও সাধারণ জীবনাভিজ্ঞতা বল্‌লে বোধের যে স্তরটুকু বোঝায়, বিবেকানন্দ বা অরবিন্দ সে-ক্ষেত্রের মানুষ ছিলেন না। উভয়ের রচনাতেই বীরোচিত আবেগের ঢেউ অনুভব করা যায়। প্রধানত দুজনেই ইংরেজিতে বলেছেন বা লিখেছেন। তবে বিবেকানন্দের মতো নয়,—অরবিন্দ ছিলেন সজ্ঞান শিল্প-স্রষ্টা। তাঁর সাহিত্য-ব্যাখ্যানের পরিমাণ অনেক বেশি, সাহিত্য-সৃষ্টিরও। বুদ্ধির নৈপুণ্য, অলঙ্করণের দক্ষতা শব্দ ও ছন্দের কৌশল ইত্যাদি সাহিত্যিক কারুকর্ম সম্বন্ধে তিনি অনেক মতামত দিয়েছেন বটে, কিন্তু স্রষ্টা মনের গভীরতর বোধির আবাহনেই তিনি ছিলেন বিশেষ উন্মুখ। এই বোধিতে আত্মসমর্পণই তাঁর সাহিত্য-চিন্তার সপ্তম ও সর্বাধিক সূত্র।

সাহিত্যিকের দিব্য দর্শন চাই। সাহিত্যস্রষ্টা ও সাহিত্য-পাঠক হিসেবে এটিই তাঁর শেষ কথা। মর্তকে ছুঁয়ে থেকে, সীমার বন্ধন পেরিয়ে যেতে হবে—এই প্রথম সূত্র দিয়ে এ আলোচনা শুরু হয়েছিল। অতঃপর এই সপ্তম সূত্রে এসে বৃত্তটি সম্পূর্ণ হোলো। আগের অনুবাদগুলি সবই বর্তমান লেখকের। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে লেখা 'The Infinite Adventure' কবিতাটির বঙ্গানুবাদ নিবেদিত হোলো অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তীর রচনা থেকে—

এক অনামা অনন্তের সমুদ্রে
আমার তরী ভাসিয়েছি, ছেড়ে এসেছি মনুষ্যকুল।
আমার পশ্চাতে সব কিছু অস্পষ্ট,
সামনে দেখতে পাচ্ছি অজানা পাতাল গহ্বর
এবং শীর্ণ এক দিশারি আলো।
এক অদৃশ্য হাত আমার হাল ধরে আছে।
তমিস্রার আনন্দে রাত্রি ঘিরে রেখেছে সমুদ্রকে—
সমুদ্র যেন এক অবোধ ক্ষুধার আর্ত সিংহগর্জন
অথবা মৃত মৌনীবাবার মহান নিদ্রা।

আমি অনুভব করছি, আমার অম্বিষ্ট মহাশক্তি
আমাকে ঘিরে রেখেছে; আমার নিচে সুবিশাল গহ্বর।

দূরে, অদৃশ্য খাড়াই—
যেখানে কোনো আত্মা পৌঁছোয়নি।
আমি একাকার হয়ে যাবো একাকিত্বে, অনন্ততায়,
এবং জেগে দেখবো ঈশ্বরের হঠাৎ আলোর ঝলকানি,
অনুভব কোরবো দিব্য দর্শনের বিস্ময় ও উল্লাস।

১৫

এই দিব্য দর্শনের পথ কী রকম? 'প্রভাত সংগীত' পর্বেই রবীন্দ্রনাথের সহসা এই দিব্য দর্শন ঘটেছিল। কবি ও যোগী অরবিন্দ মনে করেন, সাধনার মধ্য দিয়েই তা ঘটে থাকে। গাছ যেমন মাটিতে বন্দী বীজের অবস্থা থেকে একদিন আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ায়,—বুদ্ধি, বিশ্লেষণ, শব্দসন্ধান, বিষয়-মৃগয়া, সুখ-দুঃখের চঞ্চলতা তেমনি সার্বিক জীবনসত্যের নিরন্ত নির্ঝরে পরিস্নাত হয়ে সত্তার নিজেরই গভীরে গিয়ে পৌঁছোয়। কবি অরবিন্দ এই ইঙ্গিতই দিয়ে গেছেন। মানুষ আদি-পর্বের কবিতায় সরল স্বাভাবিক বহির্ঘটনার কথাই প্রকাশ করে থাকে। হোমরের অডিসি মহাকাব্যে অডিসিয়াসের কীর্তিকাহিনীরই স্রোত প্রবাহিত। সেই সব বহির্ঘটনার গভীরে আছে জীবনযুদ্ধের নিহিত বিশালতা। ইলিয়ডেও শুধু রণবাদ্য ও অস্ত্রের ঝঞ্চনাই বক্তব্য নয়—গভীরে পাওয়া যায় সেই দুজ্ঞের্য় জীবনবারিধির বিস্তার। কবিত্বকে অরবিন্দ বলেছেন, 'Poetry is a self-expressive power of the spirit'। তাঁর 'The Future Poetry'-র 'The Breath of Greater Life'-এ এই মন্তব্যটি পাওয়া যায়। তাঁর একটি প্রিয় কথা সর্বশ্রুত এখন—"All can be done if the God-touch is there"! এই 'God-touch'-ই বোধ হয় বোধিস্পর্শ। তাঁর সাবিত্রী-কাব্যের দুটি ছত্র মনে পড়ে—

The cosmic worker set his secret hand
To turn this frail mud engine to heaven-use.

এই মাটির ইঞ্জিন কবে একদিন বিশ্বপরিচালকের প্রচ্ছন্ন একটু ছোঁয়ায় ঐশী প্রয়োজনে নিযুক্ত হয়ে যায়! বোধ হয়, কোনো এক স্পর্শমণি আছে কোথাও! কবিমনেই তার উদ্ভব ঘটে যায়, শুক্তিতে যেমন মুক্তা ফলে! সংশয় ঘটা স্বাভাবিক। প্রত্যয় কি সহজে হয়? আমাদের বিন্দুপরিমিত জীবনে

কতো লেখা নিরর্থ মনে হয়। কতো কতো রচনা ঘামে ভিজে যায়। জগতের সব সাহিত্য পড়বার সময় কোথায়? জ্ঞানরাজ্যের অপরিমেয় জ্ঞানই বা আহরণ করবার অবকাশ কোথায়? মেধা কোথায়? ভাগবতী ইচ্ছাই আশ্রয়! বোধি সেই ইচ্ছার সঙ্গে যোগ। এই উপলব্ধি যাঁর ঘটেছে, তিনি সংশয়ের পাহাড় ডিঙিয়ে গেছেন। যাঁর ঘটেনি, তিনি শ্রীঅরবিন্দের কথা শুনতে শুনতে রবীন্দ্রনাথের গানের গুঞ্জন শুনুন নিজের মনে—

ওদের কথায় ধাঁধা লাগে
তোমার কথা আমি বুঝি;
তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
এই তো সবি সোজাসুজি।
হৃদয়-কুসুম আপনি ফোটে,
জীবন আমার ভরে ওঠে
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি
হাতের কাছে সকল পুঁজি।[৩৪]

কিন্তু সাহিত্যের স্রষ্টাকেও শব্দ, ছন্দ, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য,—সুখ-দুঃখ ইত্যাদি নানা লক্ষ্যে হাত রাখতে-রাখতে,—হাতড়াতে-হাতড়াতে—একদিন সেই বোধির দরজা খুলে গেলে, হাতের কাছেই সকল পুঁজি পেতে হয়!

আগেই দেখা গেছে, The Future Poetry-র 'The Breath of Greater Life' অধ্যায়ে বোধির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, বর্তমানে আমাদের মন বড়োই চিন্তাভারগ্রস্ত। অতিরিক্ত বুদ্ধিসেবায়, অতিরিক্ত যান্ত্রিক জীবনে আমরা আবদ্ধ হয়ে আছি। তিনি বলেছেন যে, আমাদের পূর্বগামী যাঁরা, তাঁদের চেয়ে আমরা যে কম চিন্তাশীল তা নই, কিন্তু চিন্তা এখন আমাদের ওপর চেপে বসেছে। কবিদের মধ্যে যাঁরা প্রাকৃত জীবনকেই কাব্যের সামগ্রী বলে মেনে নিয়েছেন, তাঁরা হয়তো নিজেদের অজ্ঞাতসারেই একভাবে মননের অতিপীড়ন ঘটাচ্ছেন। তা হলে কি চিন্তা রুদ্ধ করতে হবে? দেহের চাহিদা, জৈব ক্ষুধা, মনের আবেগ ও মনন—মনুষ্য-জীবনের পক্ষে সবই চাই। কিন্তু অতঃপর সেসব সত্ত্বেও অন্য পথে এগুতে হবে। এই কথাগুলি তাঁর নিজের মূল ইংরেজি রচনা থেকে অনুভব করতে হবে।

৩৪। গীতিমাল্য-৭৩ দ্রষ্টব্য।

দেখা যাক তিনি কী লিখেছেন, তিনি কী বলতে চান—"The very school of poetry which insists on actual life as the subject matter of the poet carries into it with or without conscious intention the straining of the thought mind after something quite other than the obvious sense of the things it tries to force into relief, some significance deeper than what either the observing reason or the normal life-sense gives to our first or our second view of existence. The way out lies not in cessation of thinking and the turn to a strenuous description of life, nor even in a more vitally forceful thinking, but in another kind of thought mind. The filled activity of the thinking mind is as much part of life as that of the body and vital and emotional being, and its growth and predominance are a necessary stage of human progress and man's self-evolution. To go back from it is impossible, or, if possible, would be undesirable, a lapse and not a betterment of our spirit"। অর্থাৎ, তথাকথিত প্রতিদিনের বাস্তব জগতের বিষয়চিন্তা তো থাকবেই ; মানবসত্তার বিবর্তনের পথে সাহিত্যকর্মের এও এক প্রকৃতি-নির্ধারিত স্তর,—এই স্তর থেকেও প্রত্যাবর্তন নেই। কিন্তু বুদ্ধি-বিচারের পথে, যুক্তি-তর্কের প্রাধান্য অনুসরণ করেই পূর্ণ মননজীবনে পৌঁছোনো যায় না। তিনি আরো লেখেন—"But the full thought-life does not come by the activity of the intellectual reason and its predominance. That is only a step by which we get above the first immersion in the activity and excitement and vigour of the life and the body and give ourselves a first freedom to turn to a greater and higher reach of the fullness of existence. And that higher reach we gain when we get above the limited crude physical mind, above the vital power and its forceful thought and self-vision, above the intellect and its pondering and measu-

ring, and tread the illumined realm of an intuitive and spiritual thinking, an intuitive feeling, sense and vision"।

বুদ্ধি-বিচার-বিতর্কে নিরত বর্তমান অবস্থা আমাদের গতিপথের সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি পেরিয়ে,—যুক্তির মাপজোখ-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে, বোধির আলোতে পৌঁছোতে হবে—"This is not that vital intuition which is sometimes confused with a much broader, loftier, vaster and more seeing power, but the high original power itself a supraintellectual and spiritual intuition"। 'ভাইটাল' হোলো প্রাণ-ঘটিত তাড়না। শ্রীঅরবিন্দ যে দিব্যবোধির কথা বলেছেন, সে অন্য বেগ, ভিন্ন দৃষ্টি। জৈব প্রাণ-চেতনার বোধি অন্য ব্যাপার। এ আর এক দৃষ্টি,—একে কি 'মহাবোধি' বলবো ? অরবিন্দের মূল ইংরেজির বঙ্গানুবাদে তাকে 'ঐক্যানন্দ' বলতে ইচ্ছা হয়—"The all-informing spirit, when found in all its fullness, heals the scission between thought and life, the need of a just balance between them disappears, instead there begins a new and luminous and joyful fusion and oneness"। সেইঅদ্বৈত ভূমানন্দে পৌঁছোলে স্রষ্টার ভাষা হয়ে ওঠে মন্ত্র। অরবিন্দের এই ধারণাটিকে তাঁর সাহিত্য-চিন্তার পূর্বোক্ত সপ্তম সূত্র বোধি-বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা দরকার। যতক্ষণ সেই দিব্যদর্শন না ঘটছে, ততক্ষণ শ্রবণে, চিন্তনে, আবেগে আবদ্ধ থাকে শব্দ। ততক্ষণ গঠন-কৌশলের যান্ত্রিক ভূমিতেই শিল্পীর পরিক্রমা। ততক্ষণ শব্দার্থের উত্তরণ যৎসামান্য। সে পর্যন্ত রচনা পরমা ব্যঞ্জনার বহির্ভূত। দিব্যদর্শন ঘটা মানে, প্রাণ ও মনের স্তর থেকে বেরিয়ে আত্মার সঙ্গে আত্মার সাক্ষাৎকার। এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। এখানে মনে পড়া স্বাভাবিক যে, রবীন্দ্রনাথও তাঁর শেষ পর্বের কবিতার বই 'আরোগ্য'-তে এই 'মন্ত্র'-ভাষার উদাহরণ রেখে গেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' মহাকাব্য সেই দিব্যদর্শনের সৃষ্টি। তাঁর জীবন ও সাহিত্য-বিচিন্তার পরিণাম তাঁর 'সাবিত্রী' মহাকাব্য। মহাভারতের সাবিত্রী-সত্যবান কাহিনীটুকু অবলম্বন ক'রে এবং তা কিছু পরিবর্তিত ক'রে এ-কাব্যে

তিনি তাঁর সেই দিব্যদর্শন রূপায়িত করেছেন। দেহে ও প্রাণে-মনে আবদ্ধ সাধারণ পাঠককে তিনি জানিয়ে গেছেন—"Savitri is the record of a seeing, of an experience which is not of the common kind and is often very far from what the general human mind sees and experiences. You must not expect appreciation or understanding"। অর্থাৎ 'সাবিত্রী সাধারণের গণমানসিক ব্যাপার নয়। এ এক অলৌকিক অভিজ্ঞতার ফসল। দিব্যদর্শনলব্ধ মন্ত্রের অধিকারী হতে চায় মন; কিন্তু সহজে মনের সংশয় কাটেনা। এই অসন্তোষের জ্বালায় জ্বলতে-জ্বলতে আমরা সাধারণ পাঠকদল একবার শ্রীঅরবিন্দ-কথিত Cosmic worker-এর কথা ভাবি,—আবার রবীন্দ্রনাথের 'গীতালি'র সেই গানটি গুন্ গুন্ করি—

মনকে হেথায় বসিয়ে রাখিস নে।
তোর ফাটল-ধরা ভাঙা ঘরে
ধূলার পরে পড়ে থাকিস নে।
ওরে অবশ, ওরে খেপা,
মাটির পরে ফেলবি রে পা,
তারে নিয়ে গায়ে মাখিস নে।

১৬

অতঃপর পুরোনো কথাই নতুন করে ভাবতে হয়। লেখকদের লেখার কারণ সম্বন্ধে উনিশ শতকের জার্মানির দুঃখবাদী দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের একটি নিবন্ধে এই মন্তব্য ছিল যে, এক শ্রেণীর লেখক আছেন যাঁরা বিষয়ের তাগিদেই কলম ধরেন, আর এক শ্রেণীর আছেন, যাঁরা টাকার জন্যে লেখেন। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশ এখন সকলেই জানেন; তিনি বলেছিলেন—'টাকার জন্য লিখিবেন না'। যাঁরা টাকার জন্যে লেখেন, তাঁরা টাকা দিয়ে যে সুখসম্ভোগের বস্তু পাওয়া যায়, এবং তৎসূত্রে যে যশ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ঘটে, নিশ্চয় সেইসব সুখের জন্যেই কলম ধরেন। ক্রেতার চাহিদা অনুসারেই তাঁদের চলতে হয়। সব লেখকই আত্মপ্রকাশ চান। লেখক-জীবনের

প্রথম পর্বে টাকা না হোক, যশের তৃষ্ণাই লেখকের আসল তাড়না বলে মানতে দ্বিধা নেই। কিন্তু তারপর কোনো বিষয় অবলম্বন ক'রে সে সম্বন্ধে নিজের মনোভাব, ব্যাখ্যা, তর্ক বা সংকল্প ইত্যাদির সূত্র ধরে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছেই লেখককে কাগজ কলম নিয়ে বসতে বাধ্য করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতন শোপেনহাওয়ারও টাকার জন্যে লিখতে নিষেধ করে-ছিলেন। শুধু তাই নয়, 'কপিরাইট' ব্যবস্থাটা যে সাহিত্যের ধ্বংসের অন্যতম কারণ, সে কথাও তিনি বলেছিলেন। ইংরেজি অনুবাদে তাঁর কথাটা এই দাঁড়ায়—'Writing for money and reservation of copyright are, at bottom, the ruin of literature'।

এ মত জর্জ বার্ণার্ড শ মানতেন না, আরো অনেকে মানবেন না। তবে লেখকদের সম্বন্ধে শোপেনহাওয়ারের আর একরকম শ্রেণীবিভাগ স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছিলেন—লেখকদের তিন শ্রেণীর মধ্যে একদল বিশেষ কিছু না ভেবেই লিখতে বসেন—হয় পুরোপুরি নিজের স্মৃতি থেকে লেখেন, কিংবা সোজাসুজি অন্যান্যদের লিখিত মতামতেরই পুনরাবৃত্তি ঘটান; দ্বিতীয় দল ভাবতে ভাবতে লেখেন, কারণ, তাঁরা লেখবার জন্যেই ভাবেন; এবং তৃতীয় দলটি লেখার আগেই কী লিখবেন তা ভেবে রাখেন। দ্বিতীয় দলটিই সর্বাধিক, তৃতীয়টি বিরল। এই তৃতীয় দলের মধ্যেও আবার খুবই অল্প-সংখ্যক লেখক আছেন যাঁরা তাঁদের বক্তব্য বিষয়টির ওপর আরো কী কী লেখা হয়েছে, সে-দিকে মনের সর্বস্ব না দিয়ে গৃহীত বিষয়টির ওপরেই নিজেদের মনকে সমর্পিত হতে দেন। এঁরাই মহৎ ভাবনার শ্রেষ্ঠ লেখক হতে পারেন।

এই কারণেই নতুন বইয়ের টাট্‌কা রঙচঙের দিকে না-তাকিয়ে, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সমর্পিতচিত্ত লেখক যাঁরা, সেইসব গ্রন্থকারের লেখা বেছে নিয়ে পড়া উচিত। পাঠকের প্রতি এই ছিল তাঁর পরামর্শ। একটু ব্যক্তিগত যন্ত্রণা ছিল তাঁর এ পরামর্শের মূলে। বলেছিলেন—যাদের নিজেদের উদ্ভাবনী প্রতিভা নেই, তারাই পরের বইয়ের নাম চুরি করে,—রীতিও চুরি করে। যেমন শোপেনহাওয়ারের নিজের এক আলোচনার নাম ইংরেজি অনুবাদে দাঁড়ায় 'On Will in Nature'; তারপর Oersted-এর একখানি বইয়ের নাম দেওয়া হয়—'On Mind in Nature'।

১৭

সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে নতুন কিছু পড়তে গেলে একজন মোটামুটি শিক্ষিত প্রবীণ পাঠককে নিজের সঙ্গে এই রকম সওয়াল-জবাবের সম্মুখীন হতে হয়—

প্রশ্ন : কেন পড়ছো এই বইটা ?

উত্তর : লেখক বিখ্যাত লোক। আমার কি পড়ে দেখা উচিত নয় তিনি কি ভেবেছেন ?

প্রশ্ন : বিখ্যাত লোকটির খ্যাতি কোন্ কারণে ? তিনি কি একজন সাহিত্যিক সত্যিই ?—নাকি অন্য কিছু ? মনে করো, বিধানচন্দ্র রায় একজন মেধাবী চিকিৎসক ও প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেশ-সেবক ছিলেন বটে, কিন্তু যদি শোনা যায়, তাঁর একটি মহাকাব্যও আছে,—এবং সাহিত্যের শব্দ, ছন্দ, উপায়, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্বন্ধেও তিনি কিছু কিছু লিখে গেছেন। তাহলে, সে সবও পড়ে দেখবার ইচ্ছে হবে তোমার ?

উত্তর : নিশ্চয় হবে। এ তো খুব স্বাভাবিক ইচ্ছে।

প্রশ্ন : আগে কী পড়বে—তাঁর মহাকাব্যটা ? নাকি, তাঁর সাহিত্য-তত্ত্বের ওপর আলোচনাগুলো ?

উত্তর : আগে তাঁর ছোটো কবিতা কিছু আছে কি না দেখবো, তারপর মহাকাব্যটার অন্তত একটা সর্গ পড়ে দেখবো তাতে সত্যিই স্বীকার্য কোনো আনন্দের ঢেউ আছে কিনা,—এবং তা যদি পাই, তা হলে মন দিয়ে অতঃপর তাঁর মৌলিক কাব্য-কবিতাও পড়বো, তাঁর তত্ত্বচিন্তাও অনুসরণ করবার চেষ্টা করবো।

প্রশ্ন : যদি তাঁর তথাকথিত সৃষ্টিমূলক রচনাগুলো আড়ম্বরসর্বস্ব বা অসার হয় ?

উত্তর : তা হলেও একটু কৌতূহল বাকি থাকবে। তাঁর চিন্তামূলক আলোচনাগুলোও সমান অসার কিনা দেখে নিতে হবে।

এই রকম সওয়ালের পরে অরবিন্দের সাহিত্য-সম্পর্কিত মতামত আমি পড়া শুরু করি। তাঁর 'সাবিত্রী' মহাকাব্য কঠিন বই। অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি দু'চার ছত্র। কয়েকজনের অনুবাদ-প্রয়াসও দেখেছি। বাংলায় লেখা বিভিন্ন সমালোচকের কিছু কিছু আলোচনাও দেখবার সুযোগ হয়েছে।

ইএ বইখানির পরিচিতি লিখতে গিয়ে অনেকেই ব্রহ্মতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ইত্যাদি গুরুভার বিষয় এনে ধরেন। কবিতার পাঠক হিসেবে এসব বিশ্লেষণ, বিবরণ ইত্যাদির ফলে কিছু সাহায্য যে না পাই, তা নয়। কিন্তু গ্রন্থ-রচনার ইতিহাস, মহাভারতের কাহিনী থেকে কতটুকু নেওয়া হয়েছে, আর কতটুকুই-বা শ্রীঅরবিন্দের নিজের উদ্ভাবিত—অথবা অশ্বপতি, সাবিত্রী, নারদ, সত্যবান চরিত্রগুলির ইঙ্গিত কী কী, এসব যেমন কোনো আলোচকের মুখ থেকে শুনলে আমাদের তথ্যজ্ঞান-লাভ ঘটে, ব্রহ্মতত্ত্ব জীবতত্ত্ব প্রভৃতিও সেই রকম তথ্যপ্রাপ্তি। সোজাসুজি সাবিত্রী-মহাকাব্যে প্রবেশই বরং অভিপ্রেত। মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্য পড়বার আগে কি আমরা কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হই? নাকি শুধু মেঘনাদ-প্রমীলার কুলজী সন্ধান করি?

না, তা করি না। কারণ, 'মেঘনাদবধ কাব্য' রাম লক্ষ্মণ সীতা, রাবণ-ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলা ইত্যাদি পরিচিত চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের ওপরে যথার্থ নতুন আলোকপাতের কাব্য। ঐ কাহিনীটি যেমন আমাদের পরিচিত, 'সাবিত্রী'র সত্যবান-সাবিত্রীও আমাদের তেমনি পরিচিত। তবে, মধুসূদন বাংলা ভাষায় বাঙালীর প্রিয় কাব্য রামায়ণের অংশবিশেষ লৌকিক সুখ-দুঃখবোধের মধ্যেই সীমিত ও প্রবাহিত হতে দিয়েছেন। অরবিন্দ ইংরেজি ভাষায় আমাদের মহাভারতের প্রিয় একটি কাহিনীকে ধরে তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন অজস্র রূপকে, সংকেতে, ইংরেজি ভাষার শব্দকল্লোলে—গভীর গম্ভীর ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ কঠিন প্রকাশভঙ্গির সাহায্যে—এবং তা পড়বার সময়ে এ কথা আমাদের পূর্বসঞ্চিত শিক্ষাগুণেই মন মেনে নেয় যে—'সাবিত্রী' কাব্যের প্রধান ঘটনা—যুদ্ধে মৃত্যুকে পরাস্ত করে সাবিত্রী কর্তৃক তার কবল থেকে সত্যকে উদ্ধার করা—তবু এই দ্বিতীয় সূত্রটিও মন থেকে তাড়ানো অসম্ভব যে—এ সাধনা হোলো অবচেতনা ও নিশ্চেতনার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে, অতিমানস-প্রকাশের সকল বাধা যেখান থেকে এসেছে, ভগবদ্‌বিরোধী শক্তির সেই মূর্ত বিগ্রহকে জয় করা। এই সব শব্দ—অবচেতনা, নিশ্চেতনা, অতিমানস—এরা তো কবিতা নয়,—কবিতার শব্দও নয়। তথ্যজ্ঞানের উপকরণ এগুলি। তত্ত্বচিন্তার সংকেত এসব। শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' এ সব তত্ত্বজ্ঞানের সংস্পর্শ বাদ দিয়ে আস্বাদন করা কি সম্ভব? এই সংশয়বশেই 'সাবিত্রী' সরিয়ে রেখে তাঁর অন্য ধরনের কয়েকটি ছোটো কবিতার আরো সহজ প্রবেশ্য কবিত্বের দিকে আগে এগিয়ে যেতে হয়। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র—উনিশ শতকের

এই দুজন বাঙালী লেখকেরই বিশেষ অনুরাগী ছিলেন তিনি। পরে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রেরও প্রশংসা করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে তো তাঁর নিজস্ব ধারণা অনুসারে খুব উচ্চস্তরের আত্মিক উপলব্ধির কবিও বলেছেন। আবার, অন্যান্য কবিদের কবিতাও পড়েছেন অনেক। সে কথা থাক। তাঁর নিজের লেখা ১৮৯০-১৯০০ সালের ইংরেজি ছোটো ছোটো কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটির অনুবাদ করতে গিয়ে তাঁর অনুভূতির জগৎ স্পর্শ করার সুযোগ পাওয়া যায়। মাতামহ রাজানারায়ণ বসুর মৃত্যুতে যেটি লেখেন, আগে তাঁর সেই লৌকিক, ঐহিক, ব্যক্তিগত শোক ও বোধের উদাহরণটুকু দেখা যাক। এই কবিতার শিরোনাম ছিল—*Transit, Non Periit*—তার নিচে বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে লেখা—My grandfather Rajnarain Bose, died September 1899—বাংলা অনুবাদে সে-রচনা এই রকম দাঁড়ায়—

নয় বিনষ্টিতে,—নয় অন্ধকারে পলায়িত তুমি
মোদের সান্নিধ্য হতে, আলোর নৈকট্য হতে নয়,
হে সবল সচেতন আত্মা, কোনো বিখ্যাত বা সুখদ নন্দন
অথবা শুদ্ধতা,—না, না, ওরা কেউই নেয়নি তোমায়।

বরং নিখিলচারী যে মননে অঙ্গীভূত ছিলে,
তুমি ও তোমার মর সত্তা,—তারা সেখানেই গত।
প্রত্যাহার করেছে সে শক্তি তার নিজস্ব সে দান।
ফিরে গেছ, হারাওনি সে দীপ্তিতে নিজস্ব যে বিভা।

শক্তি তো তোমারই থাকে এবং সে শুভ ক্ষমতাও
তীব্র জ্যোতি ঢাকে তাকে; আঁধারে সে নয় উঁকিঝুঁকি;
যেমন যখন কোনো পূত নদীস্রোত ডুবে গেলে
বারিধি-অতলে লীন সেই নদী, অদৃশ্য যদিও
অণুমাত্র ক্ষীণ নয়,—বিলীন বিশালে,—কর্মরত।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, এটি একটি কবিতা এবং বিশেষ একজন কবিরই নিজস্ব অনুভূতির রূপ। মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কী অবস্থায় থাকে, সে-বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর চূড়ান্ত রিপোর্ট নয় এটি,—কোনোরকম জীবতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বের তথ্যজ্ঞান ব্যতিরেকেই এটি কাব্যামোদীর আস্বাদন বিষয়।

এই কবিতাটিতে বিষয় অবশ্য অপেক্ষাকৃত বাইরের ঘটনা। আরো আত্মগত আরো অন্তর্মুখী একটি ছোটো কবিতা পাওয়া গেল—যার নাম Revelation। সেটিরও বঙ্গানুবাদ করা গেল—

বাতাসে ওড়া চুলের গুচ্ছে
কে একজন পাহাড় থেকে লাফিয়ে
আমার পাশ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল!
যেন মর চক্ষুতে দৃশ্যমান
চমকিত এক উজ্জ্বল অনুমান।
তার গালে ভয়ের গোলাপ-আভা
হঠাৎ সৌন্দর্যে যা জ্বলে ওঠে;
যেন হাওয়ার মতো পদক্ষেপ—
আর, পিছনে হানা ত্বরিত চাহনি.
এবং তারপর আর কিছুই না;
ধরবার আগেই
মন থেকে বেরিয়ে যাওয়া কোনো ভাবনা যেন,
যেন স্বর্গীয় গতিপথের কেউ
গুণ্ঠনের পিছন থেকে বেরিয়ে—
দৌড়ে হারিয়ে গেল।

ব্রহ্মতত্ত্ব কী? অতিমানস কী?—এইসব প্রশ্ন ব্যতিরেকেও এটিকে চমৎকার কবিতা বলে অনুভব করা যায়। এবং God নামে আরো একটি ছোটো কবিতা দেখতে ইচ্ছে হয়—যেটিরও বঙ্গানুবাদ আগেই দেওয়া হয়েছে। এখানে আর-একভাবে এলো সেটি—

নিচে এই তামাম্ দুনিয়ায় তুমি
বিস্তীর্ণ,—অথচ
ওপরে আসীন।
কাজে ও শাসনে,—জ্ঞানে রত যারা
সকলেই জানে
মমতার তুমি নিয়ত অধীন!
যে কীট অজাত আজো,—

তাকে নয়, নয়,—মাটিকেও নয়,

কাকেও করো না তুচ্ছ।

বিনম্রতাগুণেই তো যাকে চিনি

ঈশ্বর তোমারই নাম—একান্ত তোমারই।

একেই বা 'কবিতা বলবো না কেন? শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' কঠিন বটে' কিন্তু সে রচনাও কবিতা। অপর পক্ষে, ওপরে যে তিনটি নমুনা দেখা গেল, সেগুলিতে বেশ সহজ সুবোধ্য কবিতার আবেগ পাওয়া যাচ্ছে। তাতে তাঁর নিজের সাহিত্যতত্ত্ব-সম্পর্কিত চিন্তাগুলির বিষয়ে অনুসন্ধানের নৈতিক জোর পায় জিজ্ঞাসু পাঠকের মন। ভারতীয় সাহিত্যের নিজস্ব প্রকৃতি কী—এ কথার মীমাংসায় তিনি বলেন যে, ভারতীয় সাহিত্য হোলো ধর্মমুখী। এ সাহিত্যে জড়ের ওপর আত্মার বিজয়-কেতন দেখেন তিনি। তিনি বলেছেন—বুদ্ধ, তুকারাম, কবীর, রামপ্রসাদ ইত্যাদি যা বলেন, অন্য কোন্ দেশের সাধারণ মানুষ তা গ্রহণ করতে উন্মুখ থাকতে পারে? ভারতের জনসাধারণের মন অন্যান্য দেশের জনসাধারণের মনের তুলনায় সত্যিই অন্যরকম। তারা গভীর আত্মিক সত্য বলতে যা বোঝায়, তারা যে সব সময়ে তা দেখছে, তা যদি নাও হয়, তবু এ কথা ঠিক যে, তাদের ভেতরের চোখের আবরণী পর্দাটা অন্যান্যদের তুলনায় বেশ পাৎলা—তাদের চৈতন্য 'less thick veil of ignorance' দিয়ে ঢাকা।

ভারতের সাহিত্য-প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয়ের কাজে নেমে অরবিন্দ মূলত বেদ, উপনিষদ্ রামায়ণ ও মহাভারত—এই চার গ্রন্থের দিকে লক্ষ রাখবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছেন যে, বৈদিক চিত্রকল্পগুলির যে ব্যাখ্যাম আমরা করি না কেন, একথা মানতেই হবে যে, এক অলোকবাদী কাব্য,—mystic poetry;—তাঁর নিজের কথায়—'whatever interpretation we choose to put on its images, is a mystic and symbolic poetry and that is the real veda'। 'ভারতীয় সাহিত্য' (Indian Literature) নামে নিবন্ধের প্রথম অধ্যায়েই তিনি এ কথা জানিয়েছেন। লিখেছেন, আমাদের একালের বুদ্ধি-বিচারশীল মন দিয়ে নয়, আদিকালের বোধিমুখ্য মন দিয়েই বেদ রচিত হয়। এই কারণেই পরবর্তী যুগে বেদ দুর্বোধ্য • হয়ে গেছে। সেই ভাষার বাইরের মানেটা আমরা হয়তো বুঝতে পারি, ভেতরের মানেটা বুঝতে হলে তন্নিষ্ঠ সাক্ষাৎ বোধের

মন চাই। যেসব ঋষির উপলব্ধিতে বেদমন্ত্র ধরা দিয়েছিল, তাঁরা ছিলেন সত্যদ্রষ্টা। কবিরা সত্যদর্শনে, সত্যশ্রবণে অকৃত্রিমভাবে সত্যসাক্ষী হয়েছিলেন সে যুগে। তাঁদের কবিতা হয়ে উঠেছিল মন্ত্র। বৈদিক সাহিত্যে কবিতা ছিল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সংকেতলিপি।

শোপেনহাওয়ার যাকে বলেছিলেন বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হয়ে যাওয়া, শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যচিন্তা-সম্পর্কিত নিবন্ধগুলিতে সেই মেজাজই আসল আবেদনের বিষয়। তিনি অনেকবার কবিতার ভাষার কথা বলয়ত গিয়ে 'মন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বিশেষভাবে প্রতীকী বা সাংকেতিক ভাষার অনুসন্ধানে ভারতীয় কবিমন যে ব্যাপৃত থেকেছে, এই প্রসঙ্গটি তাঁর অন্যতম প্রিয় প্রসঙ্গ। 'A Rationalistic Critic on Indian Culture' নিবন্ধের প্রথম ভাগেই তিনি ভগিনী নিবেদিতার 'Web of Indian Life', ফীল্ডিং-এর বর্মা-সম্পর্কিত বই, সার জন উড্‌রফের তন্ত্র-সম্পর্কিত আলোচনায় ভিন্‌দেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে যোগ্য সমবেদনার মেজাজ যে কী জিনিস তারই উদাহরণ সূচিত করেছেন। 'Perfect thy motion' নামে তাঁর নিজের আর একটি ছোটো কবিতা এই প্রসঙ্গে মনে আসে। অতঃপর সেটির বঙ্গানুবাদ দেওয়া হোলো—

চিত্তের প্রভু, চির অন্তরে মম
করো তব গতি সম্যক্ ত্রুটিহীন।
মস্তিষ্কের পীত, বিদ্যুৎঝলা
উজ্জ্বল সে যে দৃষ্টি রুদ্ধ-করা।
জগৎ সৃজনে এ সকলি যোগ করো
ভাবনার লিপি সোনার কাগজে লেখা
বেগুনী পাড়ে তা ঘেরা।
মস্তিষ্ক তো তোমারই রচনা-পট
হে মোর দিব্য প্রভু,
প্রশান্ত রীতি অথবা মহিমময়
আবেগোচ্ছ্বাসে যেন,
তার পরে হেসে মুছে দাও, মুছে দাও।
আনো নব নব রচনার সাদা পাতা
যেন ঢেউ সব—
উঠে, ডোবে উত্তান।

বুদ্ধি-বিচার-বিশ্লেষণ সবই সর্বব্যাপী অমেয় ঐশ্বরিক শক্তির দান। সেই বিচার-বিশ্লেষণের শক্তিকে পরাশক্তি বলে, চূড়ান্ত বলে মানলে প্রেরণা, বোধি ইত্যাদি শব্দের পৃথক কোনো প্রয়োজনই থাকে না। ভারতীয় মন, তিনি যাকে বলেন,—সে মন যখন কবিতায় নিযুক্ত হয়, তখনো সেই দিব্যের সঙ্গেই তা সংযুক্ত থাকে। এ কথা শ্রীঅরবিন্দের মনের কথা। তাঁর কবিদৃষ্টিতে তাই ব্যাখ্যার চেষ্টা, বিশ্লেষণের ধৈর্য ইত্যাদি গৃহীত হলেও সত্যিকার মূল কথাটা বলা যেতে পারে 'আত্মনিবেদন'। শরীরে ও মর্তভূমিতেই অধিষ্ঠিত আমরা, কিন্তু আকাশের অসীম পরিব্যাপ্তির জন্যেই আমাদের প্রতীক্ষা। 'A Tree' নামে ছ'লাইনের একটি কবিতায় তিনি যা লেখেন, তার বঙ্গানুবাদ দাঁড়ালো এই রকম—

বালি-ঢাকা নদীতটে একটা গাছ দাঁড়িয়ে
উঁচুতে তুলে ধরেছে তার সর্বোচ্চ শাখাগুলো।
যেন যে আকাশে আঙুল পৌঁছোয় না,
আঙুলগুলো সেই দিকেই প্রসারিত।
মাটিতে আবদ্ধ কিন্তু আকাশেরই প্রণয়ী।
মানুষের আত্মা এরই নাম,—দেহ আর মগজ,
মাটির ক্ষুধাতেই আমাদের তরফে শূন্যে লীন হতে দেরি হয়ে যায়।

আমাদের অভ্যস্ত কবিতাবোধের ইন্দ্রিয়ই বলে দেয় যে, এ লেখাটিও স্বাদু। অনুবাদে মূল রচনা যথাসাধ্য অবিকৃত রাখবার চেষ্টা করেও হয়তো কিছু দূরত্ব থেকেই যাচ্ছে। তবু মূলের কাছাকাছি আছি আমরা। গাছের রূপক—পাহাড় থেকে চকিতে নেমে এসে দূরে হারিয়ে-যাওয়া কারও রূপক, এ সবই তাঁর আরো বড়ো সৃষ্টির প্রস্তুতি। তিনি জগতের অনেক কবির রচনা খুঁটিয়ে পড়েছেন,—যথাসাধ্য সকলের কথাই শুনতে উন্মুখ ছিলেন। তিনি বলেছেন যে, ইমার্সন, শোপেনহাওয়ার, নীট্‌শে,—কিংবা কাজিন্‌স্‌ বা শ্লেগেল,—বা টলস্টয়—কে কী বলেছেন সবই শ্রোতব্য; শিল্প সম্বন্ধে ফার্গুসন, ওকাকুরা, লরেন্স বিনিয়ন, এঁদের সকলের কথাই সমাদরণীয়। তবে, তাঁর নিজের একান্ত সত্য,—কবি হিশেবেই তাঁর বিশেষ সত্য তাঁর নিজের কথাতেই দেখা যাক—'The spiritual, the infinite is near and real and the gods are real and the worlds beyond not so much beyond as immanent in our own existence!' কালিদাস, ব্যাসদেব, বাল্মীকি, গ্যেটে, দান্তে,

হোমর, শেক্‌সপীয়র প্রভৃতির চিন্তাও তিনি দেখেছেন আবার সন্ত রামদাসের কথাও তিনি বলেছেন—সেই রামদাস যিনি যোগী ছিলেন। বার বার ভূমার স্বপ্ন মনে জাগে। অরবিন্দের 'ঈশ্বর' শিরোনামের কবিতাটির অনুবাদ দিলীপকুমারও করেছেন। উপস্থিত লেখক উপস্থিত আলোচনায় দু'বার দু'ভাবে তা করলেন—৮২ পৃষ্ঠায় এবং ৯০ পৃষ্ঠাতেও। 'তীর্থংকর' বইয়ে অরবিন্দের সঙ্গে দিলীপকুমারের অনেক আলোচনার কথা আছে। ১৯২০-তে পল রিশারের (Paul Richard) এক বইয়ে অরবিন্দ ঘোষ সম্বন্ধে এক নিবন্ধ পড়ে দিলীপকুমার বিশেষ আকৃষ্ট হন। তাঁর 'এদেশে ওদেশে' বইটিতেও দিলীপকুমার পল রিশারের কথা লিখেছেন। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। এখন থাক সে কথা।

দিব্য প্রেরণা বলতে যে 'ইমাজিনেশন'-এর ধারণা মনে আসে, সেটির সংকেত পাই অরবিন্দের একটি বাংলা রচনায়। সে একটি 'ফ্যান্‌ট্যাসি'। সেই প্রসঙ্গটির উল্লেখ করে, আর-একবার তাঁর প্রিয় শব্দ 'মন্ত্র' কথাটির ইঙ্গিত দেখে নিয়ে এই আলোচনায় ছেদ টানা যেতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলা রচনাবলীর মধ্যে 'স্বপ্ন' নামে সেই নিবন্ধটির কথা মনে পড়ে যাতে হরিমোহন নামে এক দরিদ্রের অভিমানের কথা আছে। হরিমোহন জীবন-যন্ত্রণায় ভুগতে ভুগতে দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁর নিজের মনই তাঁকে বুঝিয়েছিল যে, কর্মফল ব্যাপারটাই তুচ্ছ কবিকল্পনা। ইহজীবনে যারা বেশ ধনসম্পদে সুখভোগের উদাহরণ,—তারা কি তাদের পূর্বজন্মের সুকর্মের ফল পাচ্ছে? কিন্তু সেরকম মানুষের ব্যবহারে ইহজীবনেও 'সু'-এর দিকটা কি একেবারে নিশ্চিহ্ন হতে পারে? তিনকড়ি শীল নামে ঐশ্বর্যবান সুখী লোকটির কথা মনে পড়েছিল হরিমোহনের। তিনকড়ি শীলের শুভভাব কি কারও চোখে পড়ে? না, তিনকড়ি স্থূল, ভোগী মানুষ মাত্র। এসব কি ভগবানের লীলা কেবল? ভগবানকে কাছে পাওয়া গেলে এসব চালাকির উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যায়। হরিমোহন বেশ উৎসাহী সে-বিষয়ে!

ঠিক এই সময়ে হরিমোহনের অন্ধকার ঘর উজ্জ্বল আলোয় ভরে যায়। হাসতে হাসতে চাবুক খেতে এসেছিলেন শ্যামসুন্দর! সেই বালক-ভগবানকে দেখে, একটু সমীহ-ভাব জেগেছিল হরিমোহনের মনে। শ্যামসুন্দরকে ভাল না বেসে কি থাকা যায়?

কৌতূহলী হরিমোহনকে বালকবেশী ভগবান তাঁর নিজের খেলা বুঝিয়ে

দিতে রাজী হয়েছিলেন। নিভৃতে তিনকড়ি শীলের ভেতরকার চেহারা দেখে আঁৎকে উঠেছিলেন হরিমোহন। শ্যামসুন্দরের কৃপাতেই তা সম্ভব হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—"মনের অবস্থায় সুখ, মনের অবস্থায় দুঃখ। সুখ-দুঃখ মনের বিকার মাত্র"। হরিমোহনকে বুঝতে হয়েছিল যে অজ্ঞানজাত সংস্কারে আমরা সবাই বাঁধা পড়েছি। নানা ধর্মের নানা জাতির স্বর্গ নরক দেখিয়ে, হরিমোহনকে শ্যামসুন্দর বলেন—"কর্মবাদ বুঝিলে কি? পুরস্কার বা শাস্তি নহে—কিন্তু অমঙ্গলের দ্বারা অমঙ্গল সৃষ্টি, এবং মঙ্গল দ্বারা মঙ্গল সৃষ্টি। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম।—এই ব্যবস্থা চিত্তশুদ্ধির জন্য, অশুভ বিনাশের জন্য।—যখন পাপ-পুণ্যের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া প্রেমরাজ্যে পদার্পণ কর, তখন এই কার্য হইতে অব্যাহতি পাও। পরজন্মে তুমিও অব্যাহতি পাইবে। আমি আমার প্রিয় ভাগিনী শক্তি ও তাহার সহচর বিদ্যাকে তোমার কাছে পাঠাইব, কিন্তু দেখ এক সর্ত আছে, তুমি আমার খেলার সাথী হইবে, মুক্তি চাহিতে পারিবে না। রাজী?"

বলা বাহুল্য, হরিমোহন রাজী হয়েছিলেন। অতঃপর কৃষ্ণ অন্তর্হিত হন। হরিমোহন সেই বালকের মোহনমূর্তি ভাবতে-ভাবতে বলেন ·'কী সুন্দর! কী সুন্দর!'

অরবিন্দের মুষ্টিমেয় বাংলা রচনার মধ্যে এই বিশেষ রচনাটির রূপক-সৌন্দর্য বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। তাঁর কবিদৃষ্টির মূল ঝোঁক ছিল এইদিকে। এই গদ্য-নিবন্ধটি কবিতা নয়, কিন্তু কবিমনের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যের কথা কে না জানেন? অহংবোধের এই বিশেষ দিকটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। জগৎ-রহস্য ও মানব-চেতনার জিজ্ঞাসাই তাঁকে কবি করেছিল। ইংরেজিতেই লিখেছিলেন তিনি—প্রধানত ইংরেজিতে। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য, রোমক সাহিত্য—বিস্তীর্ণ য়ুরোপীয় সাহিত্য ও সেইসঙ্গে ব্যাস, কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের কবিদের রচনাক্ষেত্র তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছে। বাংলায় তিনি বোধ হয়, একটিও কবিতা লেখেন নি। কিন্তু সে-প্রসঙ্গ অবান্তর। কবি হিশেবে তিনি ছিলেন প্রধানত মননগত আস্বাদনের মানুষ; ইন্দ্রিয়গত সংবেদনে চূড়ান্তভাবে নিমগ্ন থাকবার লক্ষণ তাঁর কবিসত্তার মূল লক্ষণ নয়।

১৮

'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব' প্রভৃতির লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের মতন আত্মবোধ ও নিরন্তর আত্মজিজ্ঞাসাই সাহিত্যিক অরবিন্দের স্থায়ী প্রেরণা ছিল। এই বোধই য়ুরোপীয় শিক্ষা ও পরিবেশের বিপুলতার মধ্যেও তাঁকে ভারত-ঐতিহ্যের অভিমুখী করেছিল। এই বোধই কর্মক্ষেত্রে অরবিন্দকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে স্বতন্ত্র রেখেছিল। পারিবারিক অন্তরঙ্গ সম্পর্কেও তাঁকে স্বপ্রেমী থাকতে বাধ্য করেছিল। এই স্বপ্রেমকে তিনি জ্ঞানের প্রতি প্রেম বলে গেছেন। নিজের স্ত্রীকে লিখেছিলেন—"আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল।"

'জ্ঞানের বল'-এর প্রতি একান্ত বিশ্বাসের চর্চাই তাঁর জীবনযজ্ঞ। কবি অরবিন্দকে এই যজ্ঞের বহির্ভূমিরও যথার্থ রসিক ব'লে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে মনে হয়। সেগুলি ঠিক ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত নয়। প্রবণতার দিক থেকে তিনি মননশীল; রূপচর্চার দিক থেকে তিনি রূপকপ্রিয়। তাঁর কবিদৃষ্টির এই মূলকথা অনস্বীকার্য। ইংরেজি কবিতার ক্ষেত্রে অনেকটা এই কারণেই ব্লেকের প্রতি তাঁর আগ্রহ অকৃত্রিম। 'The Poet and the Yogi'—ইংরেজিতে বলতে গেলে তাঁকে এই অভিধায় চিহ্নিত করবার ইচ্ছে হয়।

হয়তো তাঁর রাজসিক অহংকারই তাঁর কবিকর্মের প্রেরয়িতা ছিল আদি পর্বে। এই প্রেরণাই তাঁকে—আর পাঁচজনে যা করেন, সেরকম ছোটো-বড়ো টুক্‌রো টুক্‌রো অসংখ্য কবিতা রচনায় চির-উদ্যত থাকতে দেয় নি। তাঁকে দিয়ে অভিনব মহাকাব্য লেখবার কঠিন কাজ করিয়েছে। কোনো কোনো আলোচক হয়তো এই 'রাজসিক অহংকার' কথাটা অনুমোদন করবেন না। কিন্তু এ কোনো অবিনয় নয়। এই ভাষার অভিপ্রায়টুকু খুবই সরল। অরবিন্দের পাণ্ডিত্যই তাঁর অনুভূতিকে প্রবাহিত করেছে এবং তাঁর মস্তিষ্কের দুর্জ্ঞেয় কোষে কোষে যেসব চমকপ্রদ চিত্ররূপের উদ্গম মসৃণভাবে ঘটে গেছে, সেসব আর-পাঁচজন সাধারণ কবির পক্ষে তো নয়ই, আমাদের অনেক প্রিয় কবির ক্ষেত্রেও অপ্রত্যাশিত।

তাঁর নিজের মহাকাব্য 'সাবিত্রী' সম্বন্ধে আলোচনায় সহসা প্রবেশ করা এই নিবন্ধের অভিপ্রায় নয়। বিশদভাবে সে-প্রসঙ্গে আলোচনায় এগিয়ে যাওয়া

স্থগিত রেখে, ভবিষ্যতের কবিতা সম্বন্ধে তিনি কি বলে গেছেন, সংক্ষেপে সেটুকু দেখে নেওয়া যাক্। এবং 'সাবিত্রী'র গঠনকৌশল সম্বন্ধে এখানে যৎসামান্য বলা যেতে পারে। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের "শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী" (১৯০০) বইটির প্রথমেই যে 'প্রস্তাবনা' আছে, সেটি লিখেছিলেন প্রথমে অরবিন্দের ফরাসীভাষী এক ভক্ত। পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তার বাংলা অনুবাদ করেন; সেটিকে আবার পরিমার্জিত করেন নলিনীকান্ত। সেই 'প্রস্তাবনা'র শেষ অংশটি দেখে নিলে সংক্ষেপে সে-কাব্যের গঠন-পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। সেটুকুই নিচে তুলে দেওয়া হোলো—

"কাব্যটি তিনখণ্ডে বিভক্ত।

"প্রথম খণ্ডে আবার রয়েছে তিনটি ভাগ। আরম্ভে যে সমস্যাটির স্বরূপ, তাতে এসে গেল অশ্বপতির সাধনার রহস্য। প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগে (The Book of Beginnings) অশ্বপতির ব্যক্তিগত সিদ্ধি। দ্বিতীয় ভাগে তার বিশ্বগত সিদ্ধি (The Book of Traveller of the Worlds) এবং শেষে তৃতীয় ভাগে বিশ্বাতীত সিদ্ধি (The Book of the Divine Mother)। তারপর দ্বিতীয় খণ্ড—এখানে বলা হয়েছে সাবিত্রীর জন্মকথা, প্রেম ও মৃত্যু-রহস্য; সাবিত্রীর ক্রমিক আত্মার প্রকাশ। তৃতীয় খণ্ডে শেষ সিদ্ধি ও বিজয়—বিজয়ের অপরূপ ইতিহাস।"[৩৫]

১৯

ভবিষ্যতের কবিদের কথা-প্রসঙ্গে তিনি বার বার 'মন্ত্র'-ভাষার কথা বলেছেন। চিত্র, প্রতীক, ধ্বনিকৌশল, বর্ণসংকেত ইত্যাদি কবিতার সার্বভৌম শাশ্বত পথই কবি-অরবিন্দের পথ। তাঁর দিব্যজীবনকথা আমাদের লোক-জীবনের মহাদেশ-বহির্ভূত আকাশকুসুম নয়। ভবিষ্যতের কবিতা সম্বন্ধে প্রাক্-কথাতেই তিনি জেম্স্ কাজিনস্-এর New ways in English Literature বইখানির প্রশংসা করেন। ইমার্সন সম্পর্কিত কাজিন্স্-এর নিবন্ধটি উচ্চ প্রশংসিত হয়। ১৩৫ পৃষ্ঠার এই বইটি তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। তবে, কাজিন্স্-এর মতামত তিনি সর্বত্র সমর্থন করেন নি। কাজিন্-সেএর

৩৫। 'শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী', পৃষ্ঠা ২-৩ দ্রষ্টব্য।

বিনাশী বা ধ্বংসাত্মক আলোচনাগুলিকে তিনি বিনাশী-ই বলেছেন—যেমন J. M. Synge সম্বন্ধে লেখা 'The Realist on the Stage' নিবন্ধের প্রসঙ্গে। রিয়ালিজ্‌ম্‌ বা বাস্তবতা ব্যাপারটি সম্বন্ধেও অরবিন্দ তাঁর 'The Future Poetry-'র ভূমিকায় আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, রিয়ালিজ্‌ম্‌ মানে কোনো-না-কোনো ধরনের রোমান্টিক ধারণাই। সকল শিল্পেরই জন্মভূমি এই ইন্দ্রিয়-জগৎ। এই ছোটো বইখানিই তাঁকে কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবিয়েছিল; তিনি ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন—"what the future has to give us through the medium of the poetic mind and its power for creation and interpretation'। সেই ভাবনাসূত্রেই তাঁর এই সম্ভাবনার কথা মনে জেগেছিল যে, জগৎশোভার অস্থায়ী উপকরণ-সমাবেশের মধ্য থেকেই সেই স্থায়ী বা শাশ্বত সত্যের ভাষা দেখা দেবে—যা মন্ত্রেরই সামিল! সেই সৃষ্টির চাপকে তিনি বলেছিলেন – "The fundamental passion of humanity for something beyond itself"—এবং অতীতের কবিতার সঙ্গে ভবিষ্যতের কবিতার প্রকৃতিগত ভেদের কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন—"Poetry in the past has done that in moments of supreme elevation, in the future there seems to be some chance of its making it a more conscious aim and steadfast endeavour."

যাঁরা মনে করেন কবিতা শুধু কল্পনাশক্তির বিনোদনকলা মাত্র,—শুধু কানের আরাম ও মনের সুখ,—অর্থাৎ একটু উন্নত ধরনের বিলাসই শুধু, অরবিন্দ তাঁদের মতন Intelligence, Imagination ও Ear—অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনাশক্তি আর শ্রুতি—এই তিনের তৃষ্ণাই কবিতার জন্মসূত্র বলে চূড়ান্তভাবে মানতে নারাজ। ইংরেজি মূল নিবন্ধে তিনি লিখেছেন 'deeper delight of the soul' চাই।

একদল আছেন—যাঁরা কবিতার কলাকৌশল বা আঙ্গিকের নিখুঁত প্রয়োগের ওপরেই জোর দেন। অরবিন্দ তাঁদের মতও মানেন নি। তাঁর মন্তব্য—আঙ্গিকের ত্রুটি সত্ত্বেও বহু শতাব্দী যা অন্তরে স্পন্দিত হয়, এমন কবিতার সম্ভাবনা তো অস্বীকার করা যায় না—"even a deficient correctness of execution will not prevent an intense aad gifted soul from creating great poetry which keeps its hold on the readers"।

তাঁর মতে, একটি সার্থক কবিতা নিজেই তার নিজস্ব আঙ্গিক সৃষ্টি ক'রে থাকে। সে নিজেই নিজের রূপকার—"it determines itself its own form"। যা দৃশ্যমান তারই মধ্য দিয়ে কবিতায় অরূপের অভিব্যক্তি সাধিত হয়। সংস্কৃত রসশাস্ত্রের ভাষায় বলা যায়—বাচ্যার্থ অতিক্রম ক'রে ব্যঙ্গ্য বা ব্যঞ্জনা সৃষ্টিই কবিতার লক্ষ্য। অর্থাৎ কাব্য অলৌকিক সামগ্রী। কবিতা মানেই মন্ত্র। অরবিন্দের ব্যাখ্যায়—'মন্ত্র' মানে,—"Poetic expression of the deepest spiritual reality."।

২০

"বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠ (১৮৮২) উপন্যাসে যে সহিংস প্রবল জাতীয়তার মন্ত্র সৃষ্টি ক'রে গিয়েছিলেন, তাঁর সে-মন্ত্র প্রথমে বিবেকানন্দের মধ্যে, পরে অরবিন্দের মধ্যে কী বিপুল ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে তা ভেবে দেখা দরকার। আজ-কাল এই জনমতটি বেশ ছড়িয়েছে যে, বাংলার সাহিত্যিকদের মধ্যে বিবেকানন্দও একজন প্রধান সাহিত্যিক ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগীদের অন্যতম; একালে সভ্য মানব-জগতের মানচিত্রে বাংলার—এবং ভারতের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন যাঁরা,—তিনি আমাদের প্রণম্য সেইসব মহাপুরুষদেরই পরিবারভুক্ত। নিজের অল্পসংখ্যক বাংলা রচনাও তিনি রেখে গেছেন। সেইসব রচনায় অথবা তাঁর অসংখ্য ইংরেজি বক্তৃতার বিপুলতার মধ্যে সাহিত্য-ভাবনার,—অর্থাৎ তিনি যে বিশেষভাবে সাহিত্যের রূপ, রীতি, প্রকারভেদ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক ভেবেছিলেন, সেরকম উল্লেখযোগ্য বিস্তার নেই। তাঁর উক্তিতে, ব্যাখ্যানে,—তাঁর বাংলা গদ্যে এবং অজস্র ইংরেজি বক্তৃতায় ব্যক্তিত্বের জোর আছে, সন্দেহ নেই। তা থেকে অনেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছেন,—আরো অনেকে অনুপ্রাণিত হবেন। ইংরেজিতে যাঁরা আত্মপ্রকাশ করেছেন, সেরকম বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে জেরিমি টেলর, কার্ডিন্যাল নিউম্যান, ইমার্সন প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য অনুভবে আসে। কিন্তু অরবিন্দ যে-অর্থে সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্য-সমালোচনার কাজে সুদীর্ঘ তপস্যা দিয়েছেন, বিবেকানন্দের ততো সময়ও ছিল না,—সেদিকে আগ্রহও ছিল না। সে তুলনায় রামমোহনও বরং বেশি 'সাহিত্যিক'!

সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'আনন্দমঠ' লিখ্‌ছিলেন, তখন বিবেকানন্দের বয়স সতেরো থেকে উনিশের মধ্যে, আর অরবিন্দের আট থেকে দশের মধ্যে। বিবেকানন্দ বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৬-৯৪) দিকে তখনো তাঁর নজর পড়েছিল বলে মনে হয় না। অরবিন্দ তাঁর শৈশব থেকেই বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম্‌' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন পারিপার্শ্বিক ও পরবর্তী নানা কারণে। বিবেকানন্দ তা হননি বলা ঠিক হবে না, কিন্তু তাঁর ধাত আলাদা। 'Imitation of Christ' পড়ে মুগ্ধ হয়ে অংশত 'ঈশানুসরণ' লিখলেও সাহিত্যের চেয়ে সমাজচিন্তাই তিনি বেশি করেছেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালায় উনবিংশ শতাব্দী' বইটিতে (১৩৩৪) এই আসল দিকটির ওপরেই জোর দিয়ে গেছেন।

অন্যত্র আমি বিবেকানন্দের সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনাসূত্রে যা লিখেছি,[৩৬] সেখানেও উল্লেখ করেছি যে, হরিপদ মিত্রের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি—ডিকেন্সের 'পিক্‌উইক পেপার্স', জুলে ভার্নের বৈজ্ঞানিক উপন্যাস, কার্লাইলের 'সার্টর রিসার্টস' তিনি পড়েছিলেন তো বটেই, ডিকেন্স থেকে কিছু কিছু মুখস্থও শুনিয়েছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে কালিফোর্নিয়াতে তিনি রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। উপনিষদ, গীতা, বৌদ্ধ সাহিত্য তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল। তাঁর রচনায় সাহিত্যগুণও অবশ্যই বিদ্যমান। কিন্তু অরবিন্দ যে-অর্থে সাহিত্য-ভাবনায় দীর্ঘকাল ব্যাপৃত ছিলেন, বিবেকানন্দ সে-অর্থে ছিলেন না। অথচ, শুধু মৌলিক রচনাই নয়, কিছু অনুবাদের কাজও তিনি করেছিলেন। আগেই তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। 'ইমিটেশন অফ ক্রাইস্ট' জগদ্বিখ্যাত এক সাহিত্যগ্রন্থ। বিবেকানন্দ (তখন তিনি নরেন্দ্রনাথ) এ বই অনুবাদের কাজে নেমেছিলেন এবং ঐ রচনায় গীতার উপদেশের প্রতিধ্বনি অনুভব করেছিলেন, তাও বলা হয়েছে। ১৯০১-এ তিনি বেলুড় মঠে তাঁর এক শিষ্যকে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়ে শুনিয়ে, রাবণের বীরত্বের তারিফ করেন। তিনি যে ছেলেবেলায় মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লস্ট' পড়ে—"শয়তানকেই একমাত্র সৎ ব্যক্তি বলিয়া শ্রদ্ধা" করতেন, সে-কথা তিনি নিজেই বলেছেন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সানফ্রানসিস্কোর এক ভাষণে। অনুমান করতে ইচ্ছে হয় যে, সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যদি আর একটু ভাবনার সুযোগ পেতেন, তাহলে অরবিন্দের মতোই

৩৬। বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা: (১৩৭৫) পৃষ্ঠা ৬০ দ্রষ্টব্য।

মহাকাব্য রচনার উপযোগিতা সম্বন্ধে হয়তো বিশদ কিছু বলতেন। 'ইমিটেশন অফ ক্রাইস্ট'-এর বঙ্গানুবাদ 'ঈশা-অনুসরণ' বইখানিতে,—তাঁর ইংরেজি কবিতাগুলিতে—'কালী দি মাদার', 'সঙ্ অফ দি সন্ন্যাসীন্', 'টু দি অ্যাওয়েক্‌ন্‌ড্ ইণ্ডিয়া', 'হোল্‌ড্ অন ইয়েট্ এ হোয়াইল' ইত্যাদিতে সাহিত্যগুণ অনস্বীকার্য। ১৮৯৪-এর মার্চ মাসে রামকৃষ্ণানন্দকে তিনি যখন লেখেন—আমাদের 'দীনাহীনা' ভাবকে 'কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়াতে' হবে,—তখন সেসব উক্তিতে তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বই উচ্চারিত হয়েছিল। তবে, একথাও স্বীকার্য যে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' (১৯০২), 'বর্তমান ভারত' (১৯০৫), 'পরিব্রাজক' (১৯০৬) ও 'ভাববার কথা' (১৯০৭), এই বইগুলিতে কিংবা 'সখার প্রতি', 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' ইত্যাদি কবিতায় সাহিত্যগুণ থাকলেও সাহিত্যের আদর্শ ও কলাকৌশল সম্বন্ধে অরবিন্দের মতন বিশদ ভাবনার প্রকাশ নেই। অর্থাৎ এদিকে তাঁর মনের গতিই প্রবাহিত হয়নি। তাঁর ব্যক্তিত্বের জোর, অনুভূতির গভীরতা, 'বর্তমান' ভারতের উন্নয়ন-বাসনা, সবই স্বীকার্য ; সাধু ও চলিত বাংলা গদ্যে তাঁর সমান দক্ষতার দিকটিও স্বীকার্য ; তবে এও মানতে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়,—ভাষারীতি-সম্পর্কিত এঁদের একজনের সম্বন্ধেও তিনি যে সজাগ ছিলেন, এরকম কোনো নজীর বিবেকানন্দের রচনায় নেই। কারণ, তিনি কখনোই সজ্ঞানে সাহিত্যিক ছিলেন না,—যে-অর্থে বিপ্লবী ও যোগী হওয়া ছাড়া অরবিন্দ সাহিত্যিকও ছিলেন।

বিবেকানন্দের তুলনায় রামমোহনকেও নিঃসন্দেহে ভাষা-ভাবনা ও সাহিত্য-ভাবনা বেশি ভাবতে হয়েছে। প্রশ্নোত্তর-রীতিতে আলোচনায়,—তর্ক বিতর্কাশ্রিত 'পলেমিক্‌স্'-এ তিনি আমাদের ভাষায় অগ্রণীর ভূমিকা নেন। কয়েকটি গান ছাড়া, বাংলা রসসাহিত্যে তিনি অনুপস্থিত বটে, কিন্তু বিবেকানন্দের চেয়ে নিঃসন্দেহে রামমোহন অনেক বেশি বাংলা লিখে গেছেন। তবুও 'রামমোহনের সাহিত্য' কথাটা তত চালু নয়,—যতো সাবলীল ভাবে বলা হয় 'বিবেকানন্দের সাহিত্য'।

আসল কথা, রামমোহন বা বিবেকানন্দ কেউই ঠিক সাহিত্য পথিক ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ যে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রায় মৌনী, তার একটা কারণ সম্ভবত এই যে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম,—এঁরা প্রত্যেকেই এঁদের পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞতা প্রধানত বাংলায় প্রকাশ ক'রে গেছেন, বিবেকানন্দ

অবশ্যই কিছু কিছু বাংলা লিখলেও প্রধানত ছিলেন ইংরেজি ভাষার বক্তা। আবার বলতে হয়, তাঁর খ্যাতি বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে অনুল্লেখ্য নয় মোটেই, কিন্তু তাঁকে পূর্বোক্ত তিনজনের মধ্যে একজনেরও কাছাকাছি বাঙালী 'সাহিত্যিক' বলে ভাবা যায় না। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রবলতার মিল ছিল,—কিন্তু রামমোহন বা বিবেকানন্দ, কেউই সাহিত্য-সাধক ছিলেন না—যদিও রামমোহনের বাংলা বিতর্করীতি এবং গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ ভোলবার নয় এবং বিবেকানন্দের 'স্বদেশমন্ত্র'-ই কি আমরা ভুলতে পারি ?

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'সহাস্য বিবেকানন্দ' বইখানি চমৎকার। তিনি অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন তাঁর এতৎপ্রাসঙ্গিক আরো সব গ্রন্থে। কিন্তু কেউ-কেউ প্রধানত সাহিত্যিক বিবেকানন্দেরই প্রবক্তা। অথচ, বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে বিষয়টি ভাবতে গেলে সর্বাগ্রে বলতে হয়, রামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত যাঁর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মূলপাণ্ডুলিপি সাহিত্যিক কারণেই জাতীয় সংরক্ষণশালায় রক্ষণীয়। রামকৃষ্ণদেব মূলে ঠিক কী কী বলেছিলেন, আর মহেন্দ্রনাথ হুবহু তাই লিখেছিলেন কি-না, সে-বিষয়ে কৌতূহল ঘটা স্বাভাবিক।

বিবেকানন্দের সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিছু বলেননি। বিবেকানন্দ লোকান্তরিত হন অল্প বয়সে—চল্লিশে পৌছোবার আগেই। বাংলায় কোনো সুবিপুল সাহিত্য-সম্ভার তিনি যদি রেখে যেতেন—যা সর্বসাধারণের অধিগম্য হোতো, তাহলে রবীন্দ্রনাথ সে-বিষয়ে অন্তত বিস্তৃত একটি প্রবন্ধ লিখতেন। কিন্তু ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তা ছিল না—বিবেকানন্দের সব ইংরেজি ভাষণ তখনো গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হয় নি।

অনেকেই জানেন, বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কের কিছু-কিছু বিবরণ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনীতে পাওয়া যায়,—তাছাড়া স্বর্গত কালিদাস নাগ লিখেছিলেন ১৩৬৮ সালের 'উদ্‌বোধন' পত্রিকায়,—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন লেখেন ১৩৭০ সালের ফাল্গুনের 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায়—শ্রীযুক্ত হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দুই মনীষী' বইখানির শেষ অধ্যায়ে,—হেমলতা ঠাকুর তাঁর 'পুরোনো কথা'-তে এবং সর্বাধিক ও সর্বশেষে মৌলিক আলোকপাত করেছেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত

তাঁর একাধিক নিবন্ধে। আরো কেউ কেউ লিখেছেন। ডঃ আদিত্যপ্রসাদ মজুমদার তাঁর "চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ" (১৯৭৪) বইয়ে এইসব সূত্রের একত্র উল্লেখ করেছেন,—দু'একটির মূল বক্তব্যও সংক্ষেপে জানিয়েছেন। সেই বইয়ের ভূমিকা লিখতে গিয়ে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সরলভাবে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গটির এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন—"বিবেকানন্দ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে প্রথম যৌবনে পরিচিত ছিলেন। ধর্মোন্মাদনার প্রথম জলোচ্ছ্বাসের সময়ে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে উপলব্ধি ও ঈশ্বরজ্ঞান-সম্পর্কে একাধিকবার আলাপাদি করেছেন, অন্তরের তীব্র দিব্যজ্বালা দূর করতে তিনি সেকালের স্থিতধী দেবেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে গিয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির উৎসবানুষ্ঠানেও তাঁকে দু'একবার যোগ দিতে দেখা গেছে। বিশ্ববিজয়ের পর স্বদেশে ফিরে তিনি মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আদর্শ ও কর্মৈষণার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক সংযোগ ছিল না। সেই বিরোধ দূর করা স্বামীজীর ভাবাদর্শ ও ব্রাহ্মসমাজের ভাবাদর্শকে একটি মিলনসূত্রে মিলিয়ে দেওয়া যায় কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্য নিবেদিতা চা-চক্রের আয়োজন করেছিলেন, তাতে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হলেও এ-ব্যাপারে নিবেদিতা বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ভগিনীর ঘনিষ্ঠতা স্বামীজীও অনুমোদন করতেন না। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ দু'একবার প্রসঙ্গক্রমে বিবেকানন্দের কর্মপদ্ধতির প্রশংসা করলেও কবির সঙ্গে যে বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর পার্থক্য আছে তা তিনি রোমাঁ রোলাঁকে স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন।"

এই অংশের আলোচনার লক্ষ্য কবিত্ব ও সন্ন্যাসের আদর্শগত ভেদবৈষম্য নয়,—বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কও নয়। সাহিত্য-ভাবনার দিক থেকে বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ, এই দুই সন্ন্যাসীর মধ্যে কে বেশি সাহিত্যিক প্রবণতা বা সাহিত্য-সাধনা মেনে নিয়েছিলেন, সেটাই বিবেচ্য। সেইসূত্রে বলবার জোর পাওয়া যায় যে, এঁদের মধ্যে অরবিন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নমস্কার জানিয়েছিলেন এক পর্বে,—পরে আবার সেই পূর্বোচ্চারিত "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" পুনরুচ্চারিত হয় তাঁর কবিতায় নয়, গদ্যে ; এই সমর্থন ও বন্দনার মূলে হয়তো এই কারণও ছিল যে, অরবিন্দের সঙ্গে নিজের সাহিত্য-ভাবনাগত মিল লক্ষ্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অন্য কারণ অবশ্যই ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনেকদিন তাঁর সাধনায় নিযুক্ত অবস্থায় জীবিতও দেখেছেন।

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সে সুযোগই হয়নি। বিবেকানন্দের বাংলা রচনা-ক'টিও অন্য চিন্তাশ্রিত। সাহিত্য, বা সাহিত্য-সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁর সৃষ্টির স্বল্পতা সুপরিচিত। সতীশ রায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,—এঁরাও স্বল্পায়ু ছিলেন, কিন্তু ক্ষীণতর ব্যক্তিত্বের মানুষ হলেও রবীন্দ্রনাথের এঁরা সমীপবর্তী ছিলেন এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে সাহিত্যিকই ছিলেন, বিবেকানন্দ সেরকম নন।

অরবিন্দের রচনাতেই সুশৃঙ্খলভাবে সাহিত্যচিন্তার সূত্র বেশি পাওয়া যায়। তাছাড়া তিনি ১৮৯০-এর দশক থেকেই নিয়মিত কবিতা ও অন্যান্য রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। বুদ্ধি-বিচারের পথ ধরে এগিয়ে গিয়েই হয়তো তিনি তাঁর শীর্ষতমা বোধিতে পৌঁছেছিলেন। কী রকম অবস্থা সেটা ? এ প্রশ্নের জবাব দ্বিতীয় কোনো শ্রীঅরবিন্দ এসে দিতে পারেন,—অন্যের পক্ষে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। যদি কেউ তা-নিয়ে তর্ক করেন, তাহলে সহজ বুদ্ধির নির্দেশেই চুপ করে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ, সাধনার ক্ষেত্রে যা অনির্বচনীয়, আমাদের পুরোনো দিনের সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের গুরুকুল তাকে বলে গেছেন—'বাক্‌পথাতীত'! সে-উপলব্ধির, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অনির্বচনীয়তা সম্বন্ধে আরো সোজা, আরো, বোধগম্য, আরো কবিত্বময় ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রাচীন বাংলার কী জানি কোন্ পল্লীকবি - "খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কেম্‌নে আইসে যায়, ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম তাহার পা'য়।"

মূল সূত্র আত্মোপলব্ধি,—এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্যে পার্থিব জীবন বলতে যা বোঝায়, সে-জীবন অস্বীকার করে নয়,—সেটিকে ধরেই আত্মোপলব্ধি ঘটে,—এই হোলো সাহিত্যস্রষ্টা অরবিন্দের বিশেষ সূত্র। অর্থাৎ সাহিত্য আমাদের ইহজীবনের সর্বপ্রকার স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই ভূমা বা বিশ্ববোধে এগিয়ে যাবার ভাষানির্ভর উপায়। আগেই দেখানো গেছে, এই সূত্রের সঙ্গে তাঁর আর এক চিন্তা জড়িত—জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের প্রসঙ্গে তিনি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি শ্রেণীর ভাবনা ভেবেছেন। হোমর, শেক্‌স্‌পীয়র, বাল্মীকি প্রথম শ্রেণীর কবি; কালিদাস, ঈস্‌কিলস্, ভার্জিল, মিলটন দ্বিতীয় শ্রেণীর; গ্যেটে তৃতীয় শ্রেণীর। এই ভাবনাটির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সংশয় স্বাভাবিক, কারণ, যে-গ্যেটের প্রসঙ্গে বিষয়বস্তুর অপরিসীম বৈচিত্র্য, অভিজ্ঞতার অমেয় বিস্তার,—তাঁর রচনায় সব মিলিয়ে এক অখণ্ডতার ধারণা,—এবং য়ুরোপে ঐ সময়ে অন্তত (গ্যেটের

আয়ুষ্কাল গেছে ১৭৪৭ থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি যে শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, এমন বিশ্বাসও যখন বিভিন্ন পণ্ডিত-কর্তৃক সমর্থিত, সেই গ্যেটেকে অরবিন্দ তৃতীয় শ্রেণীতে জায়গা দিলেন কেন, এ প্রশ্নের সদুত্তর কোথায় ? গ্যেটে সম্বন্ধে এও সুবিদিত যে, তাঁর সমস্ত রচনার কেন্দ্রীয় উপলব্ধি হোলো ক্রমোত্তরণ,—সকল অস্তিত্বেরই উন্নততর রূপান্তরণ,—ঈশ্বর আছেন বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র,—তিনি বহির্বর্তী নন, অন্তর্বর্তী ! গ্যেটের নাটকে, কবিতায়, প্রবন্ধে তিনি যে শ্রেষ্ঠ চক্ষুষ্মান্ সাহিত্যিকদের পংক্তিতেই জায়গা পেয়েছেন, একথাও অস্বীকার করা যায় না। গ্যেটে যে চিরজীবন আলোকার্থী ছিলেন, এ-সত্য আমাদের রবীন্দ্রনাথকেও আকৃষ্ট করেছিল এবং ঐ সূত্র ধরেই ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একখানি চিঠিতে লেখেন—"আকাশও দুই হাত বাড়িয়ে ডাকে, এবং গৃহও দুই হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে। উভচর জীব হয়ে আমি মুশকিলে পড়েছি।"[৩৭] আবার, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের আর এক চিঠিতে গ্যেটের "খুব সাদাসিধে কিন্তু আমার কাছে বড়ো গভীর" এই কথা তিনি উল্লেখ করেন যে, "কেবল হৃদয়ের আহার নয়, বাইরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিসপত্রও আমাদের অসাড় করে দেয়—বাইরের সমস্ত যখন বিরল তখন নিজেকে ভালোরকমে পাওয়া যায়।"[৩৮] আরো অনেকদিন পরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে তাঁর নিজের জীবনের দীর্ঘ পর্বটির কথা-প্রসঙ্গে তিনি যখন বলেন—"বীজ থেকে গাছ কেন হয় কে জানে। দুয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। প্রাণের ভিতর যখন আহ্বান আসে তখন তার চরম অর্থ কেউ জানে না।"—অথবা—"মানুষ আপনাকে বিশুদ্ধভাবে আবিষ্কার করে এমন কর্মের যোগে যার সঙ্গে সাংসারিক দেনাপাওনার হিসাব নেই"—এইসব উক্তি যেন গ্যেটেরই প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়।[৩৯] অথচ শ্রীঅরবিন্দ কেন তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীতে রাখলেন, সে-বিষয়ে বোধগম্য ব্যাখ্যা কোথায় ? এই শ্রেণীবিভাগ ঘটেছিল ১৯৩২-এর এক চিঠিতে। সে চিঠির তারিখ ৩১এ মার্চ, ১৯৩২। রবীন্দ্রনাথকে তিনি কোন্ শ্রেণীতে জায়গা দিতেন, তা জানতে ইচ্ছা হয়। নিঃসন্দেহে খুবই উঁচু জায়গা দিয়ে গেছেন,—তবে সে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কথা নেই। সে কথা তিনি অন্যত্র জানিয়েছেন আগেই দেখা গেছে, তিনি প্রথম শ্রেণীতে হোমর, শেকস্পীয়র, বাল্মীকি এই তিনজনকে জায়গা দেন এবং এঁদের সম্বন্ধে

৩৭। ছিন্নপত্রাবলী ১৫৫ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

৩৮। ছিন্নপত্রাবলী, ২৩৬ সংখ্যক পত্র।

৩৯। 'বিশ্বভারতী' ১৪ দ্রষ্টব্য।

বলেন যে, কল্পনার মৌলিকতা, কবিত্বের পরাকাষ্ঠা এবং সৃজনী প্রতিভার অসাধারণত্ব—এই তিনগুণে এঁরা ধন্য। বলা বাহুল্য, এসব গুণ 'দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত' দান্তে, মিল্‌টন, কালিদাস প্রভৃতির কোন্ অর্থে ছিল না, সে কৌতূহল অতৃপ্তই থেকে যায়।

অরবিন্দের সাহিত্য-চিন্তায় এরকম কিছু কিছু ফাঁক ভরিয়ে দিতে পারেন কেবল তাঁরাই যাঁরা বিশেষভাবে সাহিত্যের দিক থেকেই তাঁর রচনা পড়ে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। কাব্যের রমণীধর্ম ও পৌরুষধর্ম সম্পর্কিত কোল্‌রিজ-কথিত বিভেদচিন্তা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, তাও দেখা গেছে। অলঙ্কার, আবেগ, যুক্তির চেয়ে অনুভূতির দাপটে নত হওয়া, রূপগত চর্চার প্রতি মনোযোগ ইত্যাদি প্রবণতা যে রমণী-স্বভাব—সৃজনী প্রতিভার এই রমণীগুণের কথাটি মূলে কোল্‌রিজের; অরবিন্দ তা মেনেছিলেন।[৪০] এবং অনেক বরণীয় কবির এইসব প্রবণতার বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী যে আমাদের মহাভারত-রচয়িতা ব্যাসদেব, একথা বিশেষ জোর দিয়ে বলে গেছেন তিনি। ব্যাসের বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্বের তুলনা কোথায়? অথচ রোমান্টিক কল্পনাশক্তিতেও তিনি তো সর্বাগ্রগণ্য! বাল্মীকিকে প্রথম শ্রেণীতে জায়গা দিয়েছিলেন যে-চিঠিতে, তাতে কিন্তু এর উল্লেখ নেই। এই ব্যাস-সম্পর্কিত চিন্তা অন্যত্র পাওয়া যায়।[৪১] অর্থাৎ ব্যাস ও বাল্মীকির প্রকৃতিভেদ সম্পর্কে আলোচনা ও উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ উচ্চারিত হয়েছে বটে,—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও প্রশংসার কথা বলে গেছেন তিনি, কিন্তু তাঁর এসব মতামত সর্বত্র ঠিক বিশদ ব্যাখ্যার মেজাজে লিখিত বা উচ্চারিত নয়। অজস্র প্রবন্ধ, কবিতা, চিঠিপত্রের মধ্যে বিশেষ কোনো জায়গায় তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল,—একথা বলা হঠকারিতা হবে। তাঁর চিন্তাসূত্রগুলি সম্যক অধ্যয়নের সাহায্যেই তাঁর সিদ্ধান্ত ধরবার চেষ্টা করতে হয় এবং আমাদের নিজেদের অরবিন্দ-পাঠ কেবলি শুধ্‌রে নিতে হয়।

ব্যাস-বাল্মীকি-হোমর ইত্যাদি কবিদের প্রসঙ্গ ধরেই দেখা গেছে মহাকাব্যের প্রতি তাঁর সর্বাধিক আগ্রহ। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব সেই কারণেই তিনি খুব বড়ো ঘটনা বলে চিহ্নিত ক'রে গেছেন।

সে ধারাটি বাংলায় চললো না, তাও তাঁর নজরে পড়েছিল। কিন্তু তাতে কী? তিনি স্থির বিশ্বাস করে গেছেন যে, আরো উপযুক্ত বিষয়, আরো গভীর ও সূক্ষ্ম প্রকৃতি নিয়ে মহাকাব্য দেখা দেবেই। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা-র সুপ্রসিদ্ধ বিপরীত উক্তি এইসূত্রে পাঠকের মনে আসা প্রত্যাশিত। রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য লিখলেন না; অথচ তাঁরই সমকালীন অনুজ সাহিত্যিক শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন তাঁর 'সাবিত্রী।' অরবিন্দের সাহিত্য-চিন্তার ধারাতেই সৃষ্টি ও পর্যালোচনার দিক থেকে বিশ্বসাহিত্যের দিকে তাঁর আগ্রহের প্রসঙ্গটি ধর্তব্য। 'বিশ্বসাহিত্য' কথাটি গ্যেটের রবীন্দ্রনাথ-কৃত বঙ্গানুবাদ একথা এখন সকলেই জানেন। ১৯২৯-এ প্রকাশিত অরবিন্দের ইংরেজি বই 'Kalidasa' যাঁরা দেখেছেন, বিশ্বসাহিত্যে তাঁর সমীক্ষা ও অনুরাগ সম্বন্ধে তাঁদের কাছে বিস্তৃততর নিবেদন নিষ্প্রয়োজন। দিব্যদর্শন,—বোধির আবাহন, সাহিত্য সৃষ্টি সম্বন্ধে—এই তাঁর আসল কথা –তাঁর শেষ কথা। এই 'বোধি' মানে intuition,—একথা সকলেই জানেন। কিন্তু 'ইনট্যুইশন' কি বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যার বিষয়? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্য-দর্শন মিলিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয় এই সূত্রেই।

২১

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। একটি ইংরেজি নিবন্ধে সমকালীন ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকের মতামতের সঙ্গে অন্যতম 'দার্শনিক' কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছিলেন—

> 'Mere information of facts, mere discovery of power belongs to the outside and not to the inner soul of things. Gladness is the one criterion of truth as we know when we have touched Truth by the music it gives, by the joy of the greeting it sends forth to the truth in us. That is the true foundation of all religions, it is not in dogma. As I have said before, it is not as either waves that we receive light, the morning does not

wait for some scientist for its introduction to us. In the same way, we touch the infinite reality immediately within us only when we perceive the pure truth of love or goodness, not through the explanation of theologians, not through the erudite discussion of ethical doctrines' ।

এই আনন্দবাদ কবির নিজস্ব পথ। সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্য-ভাবনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ এই আনন্দ-সত্যের কথাই বারবার বলেছেন। সত্য আর আনন্দ দুইয়ে এক, একে দুই! 'সত্য', 'আনন্দ', 'প্রেম'—এই সব বহুপ্রচলিত শব্দের নিগূঢ় ইঙ্গিত বুঝে দেখা দরকার। রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মও এই আনন্দধর্ম—অরবিন্দের সঙ্গে এক্ষেত্রে তাঁর ঐক্যের দিকটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লেখেন—

'I have already confessed that my religion is a poet's relgion ; all that I feel about it, is from vision and not from knowledge. I frankly say that I cannot satisfactorily answer questions about the problem of evil, or about what happens after death. And yet I am sure that there have come moments when my soul has touched the infinite and has become intensely conscious of it through the illumination of joy. It has been said in our Upanisads that our minds and our words come away baffled from the Supreme Truth, but he who knows that, through the immediate joy of his soul, is saved from all doubts and fears ।'[৪২]

শ্রীঅরবিন্দকে অসার্থক বিপ্লবী ও পরিশেষে যোগসাধক বলে চিহ্নিত করার এক ধরনের জনমত বা জনপ্রবণতা অস্বীকার করে লাভ নেই। সে বিতর্কে প্রবেশ করা বর্তমান লেখকের সাধ্যও নয়, অভিপ্রায়ও নয়। তবে, সাহিত্য-ভাবনার ক্ষেত্রে,—যিনি একদা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন,—পরে

৪২। Contemporary Indian Philosophy : Edited by Radhakrishnan and Muirhead (১৯৫৮), পৃষ্ঠা ৩৩ দ্রষ্টব্য।

যিনি 'পূর্ণযোগের' পথ ব্যাখ্যা করে গেছেন—তিনিও আনন্দবাদেরই প্রবক্তা! তাঁর কথা হোলো—

> "Delight is the soul of existence, beauty the intense impression, the concentrated form of delight; and these two fundamental things tend to be one for the mind of the artist and the poet, though they are often enough separated in our cruder vital and mental experience.
>
> For the poet the moon of beauty and delight is a greater godhead even than the sun of truth or breath of life, as in the symbolic image of the Vedic moon-god *Some*, whose plant of intoxication has to be gathered on lonely mountain heights in the moonlight and whose purified juice and essence is sacred wine and nectar of sweetness, *rasa, madhu amrta*, without which the gods themselves could not be immortal।[৪৩]

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ, উভয়েরই ইংরেজি উক্তি পাশাপাশি মিলিয়ে দেখবার এই সুযোগে লক্ষ্য করা গেল যে, রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগে 'gladness' আর শ্রীঅরবিন্দের প্রয়োগে 'delight',—সমার্থক এই দুটি শব্দের ইঙ্গিতে 'সত্য' ব্যাপারটি যে অনুভূতিবেদ্য, সেই অনুভবের অদ্বিতীয় ও একমাত্র পথেই পৌঁছোনো যাচ্ছে। সে পথ আনন্দের পথ।

সাহিত্যও মানবচেতনার অন্যতম পথ! পথ, আর পথের শেষ,—দুটিকে এক বলতে পারার ন্যায়শাস্ত্র আমাদের জানা নেই। 'সাহিত্য'-কে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় 'ইন্দ্রিয়' বলেছেন।[৪৪] সেও এই অর্থেই। বিবেকানন্দ প্রধানত এ পথ দিয়ে হাঁটেন নি, শ্রীঅরবিন্দ অনেকদিন হেঁটেছেন,—এবং রবীন্দ্রনাথের চির-জীবনের সর্বাধিক পথ তো ঐ পথই। ১৩১৪ সালে অরবিন্দের প্রতি 'নমস্কার' জানাতে গিয়ে তিনি যখন লেখেন—

৪৩। The Future Poetry, Sri Aurobindo: Birth Centenary Library, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৫ দ্রষ্টব্য।

৪৪। বর্তমান লেখকের 'রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ' (প্রথম) দ্রষ্টব্য।

ভারতের বীণাপাণি,
হে কবি, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়েছেন বিপুল ঝঙ্কার—[৪৫]

তখন যোগী অরবিন্দকে তিনি শুধু কি তাঁর অখণ্ড বিশ্বাসের জন্যেই 'কবি' বলেছিলেন,—না-কি কবি অরবিন্দের মৌলিক কাব্য-কবিতা ও তাঁর সাহিত্য ভাবনার জন্যেও,—যাতে ভারতের বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, কালিদাস-ভবভূতির সকল গৌরব, সকল বাণী-সাধনা নিহিত ছিল ?

ঐ প্রথম নমস্কারে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁকে 'কবি' বলেছিলেন, 'সাবিত্রী তার অনেক পরের রচনা। অরবিন্দের সাহিত্য-চিন্তাও ছাপা প্রবন্ধের পাত্রে পরিবেশিত হবার সময় নয় সেটা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সম্ভাষণ দুই দিক থেকেই সফল হয়েছিল। তাঁকে কবি ও মনীষী বলতে দ্বিধা হবে কেন ?

২২

অরবিন্দের বিপ্লবী জীবন,—তাঁর সাহিত্য,—তাঁর যোগ,—জীবনের শেষ চল্লিশ বছর পণ্ডিচেরিতে তাঁর স্বেচ্ছানির্বাসন—এসবের মোট ফল কী ? ফুটে ওঠা, ফলে যাওয়া—এছাড়া আবার কী ? পল রিশারের বিষাদ দেখে এক সময়ে দিলীপকুমার পরমহংসদেবের কথা ভাবেননি কি ? পরমহংসদেব বলে গেছেন —ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য। পল রিশারের একটি উক্তি শুনে একদিন শ্রীদিলীপকুমার রায়ের মনে পড়েছিল সে-কথা।

মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাবের মিলন তো বটেই, সবমানবিক বিশ্বগত ঐক্যের প্রসঙ্গ শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'দি আইডিয়াল অফ হিউম্যান ইউনিটি' বইটির ভূমিকায় জানিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতোই 'ধী' ও 'আনন্দ'—এই দুই শক্তি জাগিয়ে রাখবার শপথ ছিল তাঁর। ভারতের দর্শন ও অধ্যাত্মবোধের প্রবাহ সম্বন্ধে ইংরেজিভাষী বা ইংরেজি-অভিজ্ঞ আধুনিক য়ুরোপ-আমেরিকার জিজ্ঞাসুরা তাঁর বিচিত্র শ্রেণীর রচনা থেকে বেশ বিস্তৃতভাবে জানতে পারেন।

৪৫। 'নমস্কার' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী (পশ্চিম-বঙ্গ সরকার) ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৫ দ্রষ্টব্য।

তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল নানামুখী। তাঁর দেশপ্রেম ও রাজনীতি,—সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টি ও সমালোচনা,—তৃতীয়ত তাঁর দার্শনিক চিন্তা ও উপলব্ধি এবং পূর্ণযোগ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা ও ইঙ্গিত, প্রধানত এই তিন দিক থেকে তাঁকে বোঝবার চেষ্টা চলেছে। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, এই বর্তমান যুগে এঁরা প্রত্যেকেই শব্দশিল্পী। তিনজনকেই চলতি আলাপের ভাষায় 'সন্ন্যাসী' বলা হয় বটে, কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণও ঠিক সন্ন্যাসব্রতী ছিলেন না, শ্রীঅরবিন্দও না,—সাধারণভাবে বলা যায়, কেবল বিবেকানন্দই সন্ন্যাসীর জীবনযাপন ক'রে গেছেন। কবিত্ব ছিল তিনজনেরই মনের স্বরূপে নিহিত। তিনজনেই ছিলেন অসামান্য দরদী, পরিশ্রমী, কল্যাণব্রতী পুরুষ। 'দি আইডিয়াল অফ হিউম্যান ইউনিটি'র পূর্বোক্ত ভূমিকায় অরবিন্দ এই প্রশ্ন তুলেছেন যে, মানব-বিকাশের ধারায় নেশন বা জাতির পরে—ততঃ কিম্? মানুষের সমাজ ও সংঘজীবনের অতঃপর কোন্ বৃহত্তর সম্ভাবনা? ইতিহাসে মানবগোষ্ঠীর সাম্রাজ্য-একক আর জাতিগত-একক তুল্যমূল্য ও প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিল বা উঠেছে। কিন্তু এই আমাদের সাম্প্রতিক মানবসমাজ থেকে ওয়ার্ল্ড্-স্টেট বা বিশ্বরাষ্ট্র আরো কতো দূরে? সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদও কি অভিপ্রেত পূর্ণ স্বাধীনতায় ও সার্বিক মমতায় মানুষকে নিয়ে যেতে পারছে? তাঁর সারা জীবনের বিচিত্র কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে তিনি অনুভব করে গেছেন যে, যথার্থ আস্তিকতার দিকে গতিই মানুষের নিয়তি। এই নিয়তি শুধু শিক্ষিত, সম্পত্তিশালীদেরই সুযোগ নয়। এই একটি দাবিই আমাদের মন ও চৈতন্যের পুরোভাগে নিজেকে উত্তরোত্তর ব্যক্ত করছে। মানুষকে আস্তিকতায় পূর্ণ হয়ে উঠতেই হবে। বাধা নেই, বাধা নেই;—দেয়াল কোথাও দুর্ভেদ্য নয়। পথ অতিক্রম করতেই হবে। বিনয়, বিচার, বিশ্বাস এবং প্রকৃতির অনভিব্যক্ত ইঙ্গিত বুঝে কাজ করলেই আমাদের যাত্রা সার্থক হবে।

শ্রী কে. ডি. শেঠ্না প্রণীত 'দি পোয়েটিক্ জীনিয়স্ অফ্ শ্রীঅরবিন্দ' বইটির কথাপ্রসঙ্গে একদা এক চিঠিতে অরবিন্দ লেখেন—যেসব কবি তাঁদের নিজেদের কবিতার বিশেষ কোনো মূল্যই দেন না, তাঁরা কেনই বা কবিতা লেখেন? এই মন্তব্য থেকে একথা বেশ বোঝা যায় যে, কবি হিশেবেও অরবিন্দ তাঁর কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন। বিপ্লবী অরবিন্দ, সাহিত্যিক অরবিন্দ, পূর্ণযোগী অরবিন্দ—সাধারণ মানুষ এঁদের আলাদা-আলাদা অরবিন্দ ভাবেন হয়তো, কিন্তু এঁরা একই অরবিন্দ,—তাঁর ব্যক্তিত্ব

অভিন্নতায় এক! জীবনে বেদান্ত ও যোগের প্রয়োগকেই তিনি বলেন কর্মযোগ। তাঁর অভ্যুদয়ের আগেই স্বামী বিবেকানন্দ প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তের পথ দেখিয়ে গেছেন। অরবিন্দ তাঁর বিভিন্ন রচনায় বারবার গীতার সমর্পণের কথাই বলেছেন। তাঁর 'The Mother' বইখানিতেও সেই কথাই পাওয়া যায়,—শ্রীদিলীপকুমার যার বঙ্গানুবাদে লিখেছেন—"আমাদের করতেই হবে পরম ও চরম আত্মসমর্পণ; আমাদের নিজেদেরকে তুলে ধরতে হবে কেবল সেই দিব্য-শক্তির কাছে; সব সময়ে এবং সব দিক দিয়ে আমাদের অঙ্গীকার করতে হবে শুধু সেই সত্যকে যা নামল বলে।"[৪৬] শ্রীমৎ অনির্বাণকে তিনি নিজে একদা বলেন—"আমার জীবন? বাইরে থেকে ধরা-ছোঁয়ার কিছু তো তাতে নেই।"[৪৭] এসব কথা আগেই বলা হয়েছে। দিলীপকুমারের অরবিন্দ-সাহচর্য ও অরবিন্দ-জিজ্ঞাসা সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ সম্বন্ধে অনির্বাণ লিখেছেন—"যদিও মহা-জীবনকে কোনোক্রমে বাঁধা যায় না, তবুও শ্রীঅরবিন্দকে তিনি দেখেছেন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের একটি ক্রম অনুসারে—ঋষিরূপে, জ্ঞানীরূপে, প্রেমীরূপে, যোগীরূপে, গুরুরূপে এবং অবশেষে কবিরূপে।"[৪৮]

সর্বসাধারণের চোখে ঋষি, জ্ঞানী ও যোগী—অন্তত এই তিনটি রূপ এক ও অভিন্ন মনে হতে পারে। তেমনি প্রেমী ও কবিরূপও খুব কাছাকাছি। অনেকে হয়তো গুরুর মধ্যে এসবই এক হয়ে যাওয়া কাঙ্ক্ষিত কোনো আশ্রয় অনুভব করেন। এগুলির ভিন্নতার আস্বাদন যার-তার কাজ নয়। তাছাড়া একথাও মনে জাগতে পারে যে, ঋষি, জ্ঞানী, প্রেমী, যোগী, গুরু ও কবি—এই ছটি স্তর বা এই ক্রমটিই চূড়ান্ত নয়। হয়তো এরকম আরো পরিচয়ক্রম দেখানো যেতে পারে। তিনি তাঁর 'The Life Heavens' কবিতাটিতে এবং তাঁর ছোটো-বড়ো নানা রচনাতেই মানব-চেতনার অনন্ত যাত্রার কথা তুলেছেন—"By the last finite, yearning strives / To reach the last infinity's unknown"!

অরবিন্দের নিজের কাব্যে তাঁর এই বিশেষ মন্তব্য সম্বন্ধে এক প্রশ্নের উত্তরে

দিলীপকুমারকে তিনি যা জানান, দিলীপকুমারের নিজের বঙ্গানুবাদে সে মন্তব্যটি এই : "ভগবান বাঁধা পড়েছেন পঙ্কের পঙ্কজালে—পঙ্ক মহিমময় নয়, বটেই তো—কিন্তু সেই জন্যেই না চাই এ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে ঊর্ধ্বে আরোহণ।"[৪৯]

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের অরবিন্দ-সম্পর্কিত একটি রচনা মনে পড়ে। অরবিন্দের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন—"একটা গোটা খাঁটি মানুষ"। ১৯০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে সাপ্তাহিক 'দি কর্মযোগিন' পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষ নিজে লিখেছিলেন যে, ভারতে নতুন এক জাতি ('নেশন') গড়ে উঠ্‌ছে। সে-অভ্যুদয় বাইরের তাড়নায় বা প্রভাবে ঘটেনি, ভারতের নিজস্ব জাগৃতি সেটি ;—এবং বিশ্বের প্রয়োজনেই ভারতের সেই নবজাগরণ সম্ভব হচ্ছে। তাঁর এই উপলব্ধিতে কোনো কৃত্রিমতা বা মিথ্যার জায়গা ছিল না। ব্রহ্মবান্ধব সেই অকৃত্রিম ব্রহ্মভাবনা দেখে লেখেন—"অমল-শুভ্র অরবিন্দ দেখিয়াছ কি ? ভারত-মানস-সরোবরে প্রস্ফুটিত শতদল ? এ ফিরিঙ্গীর আঁদাড়ে-পাঁদাড়ের লিলি ড্যাফোডিল নহে নির্গন্ধ ! শুধু রঙের বাহার ! কেবল বর্ণবিলাস ! দেবতার পূজায় লাগে না। যাগ-যজ্ঞে অনাবশ্যক। শুধু সাহেববিবির সাহেবিয়ানার আড়ম্বর ! আমাদের এই অরবিন্দ জগৎদুর্লভ। হিমশুভ্র বর্ণে সাত্ত্বিকতার দিব্যশ্রী ! বৃহৎ ও মহৎ ! হৃদয়ের প্রসারতায় বৃহৎ ! হিন্দুর স্বধর্ম মহিমায় মহৎ !! এমন একটা গোটা ও খাঁটি মানুষ—এমন বজ্রের মত বহ্নিগর্ভ, আবার কমল-পর্ণের ন্যায় কান্ত-পেলব, এ হেন জ্ঞানাঢ্য, এমন ধ্যান-সমাহিত মানুষ তোমরা ত্রিভুবনে খুঁজিয়া পাইবে না। দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য ইনি ফিরিঙ্গীর সভ্যতার মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়া, ইহলোকের সুখ-সাধ বিসর্জন দিয়া মায়ের-ছেলে-অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' পত্রের সম্পাদনায় ব্রতী হইয়াছেন। ইনি ঋষি বঙ্কিমের ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দস্বামী।"

অনির্বাণের উক্তিতে যেমন দেখা গেছে, অরবিন্দের অন্তর্জীবনই যে তাঁর আসল জীবন, সে কথা কি লোকসাধারণের পক্ষে অধিগম্য ? শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়কেও অরবিন্দ এক চিঠিতে লেখেন—"No one can write about my life because it has not been on the surface for man to see"! সেকথাও আগেই বলা হয়েছে। তাঁকে বুঝতে হলে তাঁর জীবন ও রচনার পথ ধরেই এগুতে হবে।

৪৯। তদেব, পৃঃ ৫ দ্রষ্টব্য।

২৩

রোনাল্ড্ নিক্সন, যিনি পরে হন সন্ন্যাসী কৃষ্ণপ্রেম, তিনিই দিলীপকুমারকে প্রথম অরবিন্দের গীতার কথা শোনান। তারপর দিলীপকুমার অরবিন্দের "Essays on the Gita", "Synthesis of Yoga", "Future Poetry", "Life Divine" ও "Mother" পড়েন। এসব ছাড়াও তাঁর অজস্র রচনা রয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক লেখাগুলিও প্রসিদ্ধ। রাজনীতি, সমাজচিন্তা, সাহিত্যসৃষ্টি, দার্শনিক আলোচনা ইত্যাদি বিবিধ চর্চায় তাঁর মর্ত্যজীবন অতিবাহিত হয়। বিভিন্ন জিজ্ঞাসু তাঁকে নিজেদেরই বিভিন্ন কৌতূহল-মাফিক দেখেছেন। যাঁরা তাঁর সমকালে বিদ্যমান ছিলেন, সময় ও সুযোগ অনুসারে তাঁদের কেউ কেউ তাঁকে খুব কাছ থেকেও দেখেছেন। দিলীপকুমার তাঁর পূর্বোক্ত বইগুলি পড়বার পরে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫-এ জানুয়ারি পণ্ডিচেরিতেই শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পান। সেই সকালে তাঁর সৌম্য, প্রশান্ত মূর্তির সামনে বসেছিলেন দিলীপকুমার। তখন তাঁকে তিনি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেননি যে তিনি কী চান। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন: "আমাকে আগে গুছিয়ে বলো ঠিক কী চাও তুমি, আর কেনইবা আমার যোগে দীক্ষা চাইছ?"

দিলীপকুমার বলেন—"আমি জানতে চাই—জীবনের—সংসারের—দুঃখ-দৈন্য আধিব্যাধির—কোনো মীমাংসা যোগে মেলে কিনা।" বলা বাহুল্য, লোকসাধারণও এই কথা জানতে চান। অরবিন্দ বলেন—"জ্ঞান ও আনন্দ তুমি যোগে নিশ্চয়ই পেতে পারো।" তিনি দীক্ষাও দিতে রাজী হন—যদি শিষ্যের যোগতৃষ্ণা প্রবল হয় এবং যোগের শর্তে শিষ্য যদি সত্যিই রাজী থাকেন—"Provided your call is strong"।

যোগের শর্ত কী কী, সে-বিষয়ে অরবিন্দ যখন ব্যাখ্যা করতে উদ্যত, সেই সময়ে দিলীকুমার বলেন—"আপনার 'Yogic Sadhan' বইটিতে আপনি নিজেকে 'তান্ত্রিক' বলেছেন"—অর্থাৎ মায়াবাদী বৈদান্তিক নন, লীলাবাদী সাধক। আপনার Life Divine বইটিতে লিখেছেন: "To fulfil God in life is man's manhood. We must acccpt the manysidedness of the manifestation even while we assert the unity of the

manifested. All problms in life are essentially problems of harmony"।

সাধারণ মানুষ জগতে অহরহ এই 'হার্মনি' বা সৌষম্যের পিপাসায় যথার্থ সন্ধানে খুবই কাতর হয়ে আছেন, একথা এখনো কি বলা যায়? যিনি যেখানে আছেন, সাধারণত দেখা যায়, প্রত্যেকেই অসন্তোষ ও ক্ষোভের শিকার! কামনার অন্ত নেই। এ জীবনে মানুষের মন কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না।

যোগের ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ কখনোই ব্যক্তিগত মুক্তির ওপর জোর দেননি। তাঁর "Synthesis of Yoga" যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের কাছে এ-তথ্য সুপরিচিত। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'escapism'—অর্থাৎ পলায়নী মনোভাব, তাঁর আধ্যাত্মিকতা মোটেই সে-রকম কিছু নয়। তিনি বলেছেন, পৃথিবীর জন্মচক্র থেকে মুক্তি সন্ধানের দিকে ঝোঁক নিঃসন্দেহে পলায়ন মাত্র। সে-অর্থে তাঁর কোনোরকম পলায়নী ভাব ছিল না। দিলীপকুমারের ভাষা অংশত ব্যবহার করে বলতে ইচ্ছে করে—অরবিন্দের সমর্পণ-চিন্তা মোটেই ইহ-সংসারের 'বিসর্জনবাদ' নয়। "The Life Divine" বইখানির এক জায়গায় ["The Evoluton of the Spiritual"] তিনি মানুষের আত্মবিকাশের পর পর এই প্রয়োজনবোধগুলি উল্লেখ করেছেন যে, প্রথমত মানুষকে নিজের অন্তর্নিহিত প্রবণতা ও সম্ভাবনাগুলির জ্ঞান অর্জন করতে হবে; দ্বিতীয়ত আমাদের বাইরের মন যেহেতু বড়ো বেশি ব্যস্ত ও চঞ্চল, মানুষকে তার নিগূঢ়তম মনোলোকের সঙ্গে যোগ রাখতে হবে—যাকে তিনি বলেন 'Occultism' এবং যাকে বাংলায় দিলীপকুমার বলেন 'নেপথ্য তত্ত্ব'; সেই তাড়না থেকেই একদিন দেখা দেয় মানুষের ধর্মানুষ্ঠান—অর্থাৎ যাতে রক্তমাংসের সত্তার আত্মতত্ত্ববিকাশের চেষ্টা নির্বিঘ্ন হয়, তারই পথ-সন্ধান; চতুর্থত দেহ-প্রাণ-মনকে পূর্বোক্ত পথে প্রস্তুত ক'রে, শুধু কোনরকমে বিধিবদ্ধতায় সন্তুষ্ট না থেকে যথার্থ আধ্যাত্মিক দর্শনে উত্তরণ। এই পথ আমাদের মতন সাধারণ মানুষের পক্ষেও দুর্বোধ্য নয়। বিতর্ক, বিচার, সংশয় ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে নয়,—এ সবের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে।

তবে, বিচার-বিতর্কের সম্পূর্ণ পরিহার না চাইলেও তথাকথিত যুক্তির সীমাও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। যুক্তি বেশিদূর দৌড়োতে পারে না—একথা তিনিই তাঁর 'The Life Divine' গ্রন্থে লিখে গেছেন। মানুষকে পেতে হবে দিব্যজীবন। এটিই তাঁর চূড়ান্ত নির্দেশ। তাঁর সাহিত্য-সমালোচনায় এবং

সাহিত্য-সৃষ্টিতেও তাঁর এই বাণীই প্রতিফলিত। ভোগ নয়, দিব্যতাই মানুষের লক্ষ্য। এই কথাই শ্রীঅরবিন্দের কথা। সাধারণ মানুষ হয়তো একথা ভাবতে নারাজ; কিন্তু জীবনের নানা ঢেউয়ের তাড়নায় তাড়িত হতে-হতে এসব ভাবনার মুখোমুখি হতেই হয়। এ-ভাবনা এড়িয়ে বেঁচে থাকার উপায় নেই। এই লক্ষ্য অর্জনের পথ হোলো যোগ। 'যোগ' মানে ম্যাজিক নয়। নিজের ভেতরকার আধ্যাত্মসত্তার উদ্বোধন ঘটিয়ে তোলার জন্যেই চাই 'যোগ' এবং তাঁর কল্পনা ও যুক্তির সার্থক অন্বয়ী শক্তিই 'Who' নামে একটি রচনায় তাঁকে দিয়ে এই যোগের অভিজ্ঞতাই ব্যক্ত করিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি লিখে গেছেন: "All music is only the sound of His laughter"। এ শুধু তাঁর একটি বিশেষ কবিতারই মর্মকথা নয়—একথা বোধহয় তাঁর সব রচনারই শেষ কথা।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে সমুদ্রপথে বসে লেখা রবীন্দ্রনাথের শ্রীঅরবিন্দ-সম্পর্কিত চিন্তা ১৩৩৫ সালের শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছিল। সে রচনায় কথায়-কথায় রামচন্দ্র ও সীতার প্রসঙ্গ ওঠে। রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"সুদীর্ঘ নির্বাসন ব্যাপ্ত করে রামচন্দ্রের একটি সাধনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। যতই দুঃখ পেয়েছেন ততই গাঢ়তর করে উপলব্ধি করেছেন সীতার প্রেম। তাঁর সেই উপলব্ধি নিবিড়ভাবে সার্থক হয়েছিল যেদিন প্রাণপণ যুদ্ধে সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করে আনলেন।" তারপর—"কিন্তু রাবণের চেয়ে শত্রু দেখা দিল তাঁর নিজেরই মধ্যে। রাজ্যে ফিরে এসে রামচন্দ্র সীতার মহিমাকে রাষ্ট্রনীতিক আশু প্রয়োজনে খর্ব করতে চাইলেন—তাঁকে বললেন, সর্বজনসমক্ষে অগ্নিপরীক্ষায় অনতিকালেই তোমার সত্যের পরিচয় দাও। কিন্তু এক মুহূর্তে যাদুর কৌশলে সত্যের পরীক্ষা হয় না, তার অপমান ঘটে। সত্যকে যদি দশজন না স্বীকার করে, তবে সেটা দশজনেরই দুর্ভাগ্য। সত্যকে যে সেই দশজনের ক্ষুদ্রমনের বিকৃতি অনুসারে আপনার অসম্মান করতে হবে এ যেন না ঘটে। সীতা বললেন: আমি মুহূর্তকালের দাবি মেটাবার অসম্মান মানব না, চিরকালের মতো বিদায় নেব। রামচন্দ্র এক নিমেষে সিদ্ধি চেয়েছেন, এক মুহূর্তে সীতাকে হারিয়েছেন। ইতিহাসের যে উত্তর কাণ্ডে আমরা এসেছি এই কাণ্ডে আমরা তাড়াতাড়ি দশের-মন-ভোলানো সিদ্ধি লোভে সত্যকে হারাবার পালা আরম্ভ করছি।"

এই চিন্তাসূত্রেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহন সেনের কাছে পাওয়া লালন

ফকিরের সেই গানটির উল্লেখ করেন—'নিঠুর গরজী, তুই কি মানস মুকুল ভাজবি আগুনে!' তিব্বতের মন্ত্রজপের চাকার কথা মনে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের; তিনি জানিয়েছিলেন: "তিব্বতে মন্ত্রজপের ঘূর্ণিচাকা আছে। এর মধ্যে মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় বলেই আমাদের মনে অবজ্ঞা আসে। সত্যকার মন্ত্রজপ একটুও সহজ নয়। সেটা সুদ্ধমাত্র আচার নয়, তার সঙ্গে আছে চিত্ত, আছে ইচ্ছাশক্তির একাগ্রতা।"

রবীন্দ্রনাথের অনুভবে এই কথাই গ্রাহ্য বলে উচ্চারিত হয় যে, মানব-প্রকৃতি জটিল। তাঁর কথায়—"অধিককে বাদ দিয়ে সহজ করা মানুষের নয়, সমস্তকে নিয়ে সামঞ্জস্য করাই তার।" তিনি বলেন—"প্রকৃতি পশুকেই সহজ করেছে, তারই জন্য স্বল্পতা; মানুষকে করেছে জটিল, তার জন্যে পূর্ণতা।"

এই রকম মানসিক আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ সেবার ফরাসী জাহাজে পণ্ডিচেরিতে পৌঁছে শ্রীঅরবিন্দকে দেখে এসেছিলেন। এ উল্লেখ উপস্থিত আলোচনায় আগেই অংশত করা হয়েছে পরে আরো কথা আছে। তিনি লেখেন—প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম—ইনি [অরবিন্দ] আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য ক'রে চেয়েছেন, সত্য ক'রে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত।...মধ্যযুগের খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেননি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন: যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার।" অরবিন্দের আত্মিক শক্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আরো কিছু কথা ছিল সেই স্বল্পায়তন লেখাটির মধ্যে। সে-অংশ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২৪

মনের দিক থেকে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দেই সাধারণ মানববুদ্ধির অব্যবহিত উচ্চতর স্তরটিতে তাঁর প্রবেশ ঘটেছিল,—একথা অরবিন্দ নিজেই লিখে গেছেন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার স্তর থেকে সেই অসাধারণ মানসিক বা আত্মিক শক্তির বিশ্লেষণ কি সম্ভব? সে তো অন্য উপলব্ধির ক্ষেত্র। অপর-পক্ষে, সাধারণ মানুষের প্রবণতাই অন্যরকম। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় তাঁকে জিজ্ঞেশ করেছিলেন—যাকে বলা হয়,—'অতিমানসিক অভিজ্ঞতা' (Supramental) সে কি সত্যি? ঐসব ব্যাপার কী রকম যেন যাদুবিদ্যা বলতে ইচ্ছে করা কি অসঙ্গত?

এই রকম সন্দেহ খুবই স্বাভাবিক। অরবিন্দ জবাব দেন—

"There is no question of jugglery about it. What is not true is not Supramental. As for calm and silence, there is no need of the Supramental to get that. One gets it even on the level of the Higher Mind which is the next, above the human intelligence. I got these things in 1908 twenty-seven years ago, and I can assure you they were solid and marvellous enough in all conscience without any need of Supramentality to make them more so!"

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের এই অভিজ্ঞার কথা বলতে গিয়েই তিনি জানান যে, সম্পূর্ণ স্তব্ধ ও শান্ত এক মানসিক অবস্থাতেই তিনি পুরো চার মাস 'বন্দেমাতরম্' সম্পাদনা করেন, 'আর্য' ছয় খণ্ড রচনা করেন এবং আরো অনেক চিঠিপত্র লেখেন। তাঁর রাজনৈতিক কাজও মনের সেই শান্ততার ফসল। তাঁর আশ্রম সংগঠন ও পরিচালনাও সেই একই মানসিকতার চাষ। হাঁ, এই সূত্রে চাষ-আবাদ শব্দটিই বেশ উপযোগী মনে হয়। শ্রীঅরবিন্দ ফসলের দিকে লক্ষ্য রেখেই অনুশীলনে গভীর নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি শারীরিক সুখ থেকে ব্রহ্মানন্দ পর্যন্ত আনন্দের বিচিত্র স্তরগুলি অনুভব ক'রে গেছেন। তবে চেতনার সেই রূপান্তরসাধন যাতে গভীর ভাবে হয়, যাতে সত্যিই লক্ষণীয় গঠনের কাজ

চলতে থাকে, সেটা তাঁর গোচরীভূত হয়েছিল এই মর্ত্যচেতনার মধ্যেই ;—শুধু নিত্যানন্দ-ভূমি থেকেই নয়।

সাধারণ মানুষ যে বোধ-বুদ্ধি-বিচার-বেদনার মন নিয়ে বিদ্যমান, সেই মনকে পুরোপুরি অস্বীকার করে মানসিক স্তরের জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়া কি অবিশ্বাস্য বা অসম্ভব ব্যাপার নয় ?—ঠিক এই প্রশ্নই তাঁকে করা হয়েছিল এবং এই প্রশ্নের জবাবে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের উল্লেখ করে বলেন, রামকৃষ্ণ তো হাজার হাজার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি যা করেছেন এবং শ্রীঅরবিন্দ নিজেও এই ব্যাপারে যে ভাবস্তরে বিরাজ করতেন, তাঁর নিজের কথায়, সে হোলো—"a higher spiritual experience, a deeper source of knowledge and not lucubrations of the logical intellect trying to co-ordinate its ignorance"।

এই ইংরেজি মন্তব্যে তিনি যাকে বলেছেন 'Divine truth' অর্থাৎ দিব্য সত্য, তাকে কখনোই সাধারণ বুদ্ধিমার্গের অধিগম্য বা বুদ্ধিবিচারের বিচার্য বলে মানেন নি। সমুচিত বিনয় ব্যতিরেকে এ সত্যের ধারণা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা বড়োই সীমিত। ভাগ্যগুণে সেই সীমা যদি বা কখনো কারও পক্ষে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়, তখনি শ্রীঅরবিন্দের এইসব ঘোষণার জন্যে তাঁর নিজস্ব তৃষ্ণা উন্মুখ হয়ে উঠতে পারে। 'অতিমানস' বিষয়ে যথার্থ কৌতূহলের অঙ্কুরোদগম যতক্ষণ না ঘটে, সে পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু সে কৌতূহল জাগাবার পথ তো অন্ধ গুরুবাদের পথই নয়,—সংশয়, অস্বীকার, বিতর্ক,—এমন কি পরিহাস ও কৌতুকের পথেও চিরনিহিত প্রশ্ন ও উত্তর জেগে উঠতে পারে। দিলীপকুমারকে একদা তিনি সাধনার পথে শূন্যতা-ভীতির কথাপ্রসঙ্গে জানান—"It was on what you call emptiness, on the Silence that my whole Yoga was founded and it was through it there came afterwards all the inexhaustible riches of a greater Knowledge, Will and Joy, all the experience of greater mental, Psychic and Vital realms, all the ranges up to overmind and beyond"॥

এই সব মন্তব্য খুবই শান্তভাবে ভেবে দেখা দরকার। ভারতীয় ধর্মচেতনার গভীর ও চিরায়ত প্রবাহে ডুব দিয়ে অরবিন্দ অন্ধ সমর্পণমন্ত্রটুকুই তুলে এনে-

ছিলেন, একথা ভাবা ঠিক হবে না। তিনি অতীন্দ্রিয়বাদী, সন্ধ্যাভাষী, অলোকবাদী অর্থাৎ মিষ্টিক মাত্র ছিলেন না। তাঁর প্রজ্ঞা ও উপলব্ধি সাধারণ মানব-মানসিকতার যোগসূত্রহীন কোনোরকম প্রক্ষেপ নয়। স্পিনোজা, কাণ্ট, হেগেল প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকরা যে-অর্থে গভীর মননধর্মী মনীষী, তিনিও তাই ছিলেন,—তাঁদেরই মতন তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী অন্বেষণ ছিল তাঁর। হয়তো, ততোধিক যা,--সে তাঁর ভারতীয় অদ্বৈত-উপলব্ধির সহজাত সংস্কার। সেই সব গুণেই নিজস্ব এই সত্যবোধ তিনি জানিয়ে গেছেন যে, চিরচাঞ্চল্যই মানুষের নিয়তি নয় ;—আত্মসমাহিত হওয়া মানে তমিস্রাময় বিচ্ছিন্নতাও নয়। বিশ্ব-মানব-মিলনই মানুষের ভবিষ্যৎ। সাহিত্য, রাজনীতির পথ, ইতিহাসের বোধ —এইসব পথেরই গতি সাধারণ মানুষের অনাস্বাদিত ভবিষ্যতের অভিমুখে।

২৫

ইহসংসারে দেব-দৈত্যের দ্বন্দ্বের শেষ নেই। এক পক্ষে কল্যাণের চেষ্টা, অন্য পক্ষে প্রবৃত্তি বা অন্ধ রিপুর আকর্ষণ—এই কুরুক্ষেত্র চলছেই। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছিলেন—

কেন দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে
—বল দেখি দাদা।
কারণ দেবতা খেতো লাল পানি, আর
দৈত্য খেত সাদা।

তাহলে দেব-দৈত্য দু' পক্ষই কি একই মাধ্যাকর্ষণের শিকার? শক্তির লোভ, প্রতাপের অহংকার এবং ক্রমবর্ধমান দম্ভের খাজনা দিতে দিতে দু'পক্ষের ভেদ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? যাঁরা শাস্ত্রব্যাখ্যাতা, তাঁদের মধ্যে অনেক সময়ে সরল কথা জটিলভাবে প্রকাশের অভ্যাস দেখা যায়। একদল আছেন যাঁরা কেবল অপতর্ক বা সরল কথার দুরূহ আলোচনা করে থাকেন। দ্বিজেন্দ্রলালেরই চণ্ডীচরণের কথা মনে পড়ে—

চণ্ডীচরণ ছিলেন একটি ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থকার
এমি তিনি হিন্দুধর্মের কর্তেন মর্ম ব্যক্ত,

দিনের মত জিনিষ হত রাতের মত অন্ধকার
জলের মত বিষয় হত ইঁটের মত শক্ত।

চণ্ডীচরণদের এই প্রসঙ্গ পরিহাসের ব্যাপার। বিরোধ ও মীমাংসার সূত্র আরো শান্তভাবে দেখা যাক।

শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কঠিন বটে, কিন্তু তা অনুসরণ করতে অসুবিধা হয় না। মানুষ যে যুগ যুগ ধরে আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন আছে, সেটাই ঐতিহাসিক সত্য। জর্জ ইভানোভিচ্ গার্ডিজেফ (George Ivanovitch Gurdijeff) নামে এক রুশ দার্শনিকের শিষ্য পি. ডি. আউস্পেন্স্কির (P. D. Ouspensky) নাম অরবিন্দ একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য—এই ছয় রিপুর একান্ত বশংবদ অবস্থা থেকে মানুষকে যথার্থ মুক্তি ও উত্তরণের পথে এগুতেই হবে। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, মুক্ত যেথা প্রাণ'—সেই স্বাধীনতা-স্পৃহার কথাই মনে জাগে। মানবত্ব থেকে অতিমানবত্বের দিকে যাত্রা সম্পর্কে আউস্পেন্স্কি তাঁর একখানি বইয়ে[৫০] অতিমানব সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করেন। সেই বইয়ের 'সুপারম্যান' নামে একটি অধ্যায়ে তিনি লেখেন—অতিমানবের চিন্তা মানুষের মনে মনে নিহিত থাকলেও পাশ্চাত্ত্য জগতে গত কয়েক শতকে এ-বিষয়ে ধারণা ক্ষীণ হয়ে যায়। তারপর নীট্শে যখন সেই অতিমানব-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তখন সে ধারণা অপ্রত্যাশিত রকম মৌলিক ব'লে মনে হয়েছিল। আউসপেন্স্কির মতে কাউন্ট-অফ্-মন্টিক্রিস্টো, রোকাম্বোল, শার্লক হোম্স্ প্রভৃতির অবিশ্বাস্য বিচিত্র সামর্থ্যের কাহিনী যে পাশ্চাত্ত্য জগতে ছড়িয়েছে, তা থেকে বোঝা যায়—এ জগতে মনুষ্যদেহধারী জীবের মধ্যেই অসামান্য, অবিশ্বাস্য, অতিমানব-সামর্থ্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আশা টিঁকেই আছে। ঐ বইয়ের ১১৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, ইতিহাসে গৌতম বুদ্ধ যখন দেখা দেন, তখন থেকেই দেবত্বের জায়গায় অতিমানবত্ব চিহ্নিত হতে দেখা যায়। বৌদ্ধধর্মে 'অতিমানব' এসে দেবতার জায়গা দখল করেছেন। নীট্শের জরথুষ্ট্র বলে গেছেন—মানুষের মধ্যে যথার্থ মহত্ত্ব যা, তা এই যে, মানুষ চূড়ান্ত কোনো ছেদ নয়,—মানুষ হোলো সেতু ("he is

৫০। A New Model of the Universe (London : Routledge & Kegan Paul Ltd.)

a bridge and not a goal")—মানুষের যথার্থ আকর্ষণ এইখানে যে, সে উর্ধ্বগতি এবং নিম্নগতি, দু'দিকেই সঞ্চরণশীল। এই ধরনের আলোচনার মধ্যেই তিনি বলেন—যাকে বেশ স্পষ্টভাবে নির্দেশিত করা যায়, এইরকম এক সত্তাই তো অতিমানব,—সেই রকমই হওয়া উচিত। তাঁর মধ্যে আভ্যন্তরীণ কোনো দ্বিধা বা সংঘর্ষ—যা নাকি দেবতাদেরও অদৃষ্ট, বিধিলিপি বা দুর্দৈব,—সে রকম কিছু থাকতে পারেনা—"In reality superman must be a clearly defined being. He cannot have within him that eternal inner conflict, that painful inner division which men continually feel and which they ascribe even to gods"।[৫১] মানুষের ভেতরকার অবিনশ্বর পরিবর্তনধর্মই সর্বাধিক লক্ষণীয়। মানুষের মন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। সে কেবলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যায়,—সে হয়ে উঠছে কেবলি,—সে বদলে যাচ্ছে নিরন্তর!

নীট্শের বিশেষ গুণগ্রাহী এই রুশী লেখক দেখিয়েছেন যে, নীট্শেকে ঠিক ঠিক বোঝা হয়নি বলেই তাঁকে জার্মানির সেনাতন্ত্রবাদী জুলুমসর্বস্বতার অধিনায়ক মনে করা হয়েছে। নীট্শে খ্রীষ্টধর্ম বুঝেছিলেন রেনানের চিন্তামাফিক। খ্রীষ্টধর্ম হোলো শোষিত-পীড়িত-দুর্বলের ধর্ম—এই ধারণার ফলেই তিনি সে ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যীশুখ্রীষ্টের প্রতিদ্বন্দ্বী হিশেবে সুপারম্যান বা অতিমানবের কল্পনা করেছিলেন। খ্রীষ্ট যে নিজেই এক অতিমানবতার উদাহরণ,—তা যে নীট্শের নিজেরই ধ্যানের সঙ্গে মিলে যায়, সে-বিষয়ে খেয়াল ছিল না তাঁর!

শক্তি-পূজার এক অভিব্যক্তি হোলো এই অতিমানব-ধারণা। কিন্তু 'শক্তি' ব্যাপারটির সঙ্গে প্রায়ই দেবতার ধ্যানের সঙ্গে দৈত্যপূজাও জড়িত হয়ে যায়। ফলে, উর্ধ্বগতির বদলে নিম্নগতি ঘটে যায়। অটুট সততার জায়গা দখল করতে এগিয়ে যায় কৌশল বা চালাকি। খ্রীষ্টের জীবন-কাহিনীতে বিচারক পন্টিয়াস পাইলেট এদিক থেকে স্মরণযোগ্য। সে ছিল খুবই চালাক-চতুর, বেশ বিদ্বান মানুষ। বিচারক হিশেবে ন্যায়দৃষ্টির গুণে যীশুকে সে অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিতেও চেয়েছিল। কিন্তু পন্টিয়াস পাইলেট যখন বুঝতে পারে যে, যীশুর পক্ষে অভিযোগকারীদের কৃপালাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব, তখন সে নিজের হাত ধুয়ে ফেলে তাঁকে ইহুদীদের হাতে তুলে দেয়। মানব-সভ্যতায়

৫১। ঐ গ্রন্থের ১১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এইরকম হাত-ধুয়ে ফেলার ব্যাপারই চালাকি! বিবেকানন্দ বলেছিলেন—চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম হয় না। যে মানুষের অন্তর পরিষ্কার, সে কি কখনো এভাবে হাত ধুয়ে ফেলতে পারে? তথাকথিত সভ্য-শিক্ষিত মানুষের পক্ষেই এ স্বভাব সম্ভব। এইরকম বাধাই অতিমানসত্বে উত্তরণের বাধা। লেখক বলেছেন—"In relation to the evolution of spirit, Pilate is a stop. Real growth consists in the harmonious development of mind, feeling and will."[৫২]

অরবিন্দ যাকে বলেন—"Self-adaptation to the orchestral whole"—বিশ্ব-ঐকতানে নিজেকে সংযোজিত করা, অর্থাৎ বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে মেলানো,—মৃত্যুর অল্পকাল আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ বয়সের 'সানাই' কবিতায় (৪. ১. ১৯৪০) তাঁরও সেই একই ধ্যানের সত্য প্রকাশ করেন—

সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি-মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান
কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান
কোন্ উদ্‌ভ্রান্তের কাছে
বুঝিবার সময় কি আছে?

বিভিন্ন বিরোধের অন্তর্লীন সে ঐকতান অনুভবের প্রয়াস মানবমনের চিরসাধনা। অরবিন্দের নিজের লেখা থেকেই জানা যায় যে, আত্মজাগরণের বা আত্মজ্ঞানের সন্ধানে গত কয়েক শতাব্দীর তুলনায় অতীতে কোনো কোনো দেশে কোনো কোনো পর্বে অনেক বেশি ঘটেছে। বৈদিক যুগে অথবা প্রাচীন মিশরে আত্মিক কোনো প্রাপ্তি বা নিগূঢ় জ্ঞান ছিল মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যেই সীমিত। মানবসাধারণ বলতে যে বিপুলতা বোঝায়, তার বিবর্তন ঘটে ধীরে ধীরে—জড় থেকে প্রাণের স্তরে,—প্রাণ থেকে মনে। সেই সুবিপুলতার মধ্য থেকেই দু' পাঁচজন বাধা ভেদ ক'রে আত্মিক উপলব্ধির দরজা খুলতে পেরেছেন, যাতে মানবিক স্তর থেকে আত্মিক ও অতিমানসিক সত্তার বিবর্তন সম্ভব হয়। ইতিহাসে কখনো কখনো সে স্বল্পসংখ্যক মানুষই তাঁদের নিজেদের জনসমাজে বিপুল প্রভাব সঞ্চারিত করেছেন—যেমন ঘটেছিল বৈদিক ভারতে,* মিশরে—অথবা জনশ্রুতি অনুসারে প্রাচীন আটলান্টিস অঞ্চলে।

৫২। পূর্বোক্ত গ্রন্থের ১৩০-৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কখনো আবার এই জ্ঞানী সত্যদ্রষ্টারা জড়বাদে আবদ্ধ তাঁদের সমকালের সমাজের বাইরে নিজেদের গোষ্ঠীবেষ্টনীতেই আত্মরক্ষা করে গেছেন।

সব সময়েই বিবর্তন হোলো উর্ধ্বগতি বা উর্ধ্বায়ন, কিন্তু তার গতি সরল রেখায় হবেই যে, তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। উর্ধ্বগতি ও নিম্নগতির সমাবেশ-জাত এক পর্যায়ের ধারণা জাগে। কিছুদিনের জন্যে তা বিশেষ বাধায় ব্যাহত ও স্থগিত বলে মনে হলেও বিবর্তন সুনিশ্চিতভাবে ঘটবেই। নতুন যুগে পুনরুদ্দীপিত শক্তিতে তা জেগে উঠবেই। যখন জড়জগৎ সৃষ্ট হয়েছে তখন অতিমানস থেকে নিম্নমুখে জড়স্তর অবধি সত্তার সকল অবস্থার মধ্য দিয়েই সৃষ্টিকে নামতে হয়েছে।

কিন্তু কঠিনতম অজ্ঞানের মধ্যেও নিত্যজাগ্রত চেতনার কাজ চলে। এক অবস্থা থেকে ভিন্ন অবস্থায়—এক স্তর থেকে স্তরান্তরে সেই চেতনা কাজ করে যাচ্ছে তার সংশ্লিষ্ট অথচ নিহিত স্বজ্ঞার সাহায্যে। শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথায়—"But even in the Inconscience there is a secret consciousness, which works, one may say, by an involved and hidden intuition proper to itself"। জড় বা প্রাণের—সকল স্তরেই এই সহজ জ্ঞানের বা স্বজ্ঞার বা ইনটুইশনের কাজ চলছে!

একদিকে জড় থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে মনে—অন্যদিকে, সুপ্রাচীন আর এক বিবর্তন মানসিকতা থেকে অতিমানসে বা আত্মিকতার উন্নয়নে—এই দুই অভিব্যক্তিধারার কথা তিনি বলে গেছেন। Intuition-কে তিনি Intellect-এর চেয়ে বেশি শক্তিধর বলেছেন। কিন্তু মানবচিত্তে সে বোধি বা স্বজ্ঞা জাগবে কখন? জবাবে তিনি লিখেছেন—"But Intuition takes its proper form only when one goes beyond the mental into the spiritual domain for there only it comes fully forward behind the veil and reveals its true and complete nature!" [৫৩]

একদিকে আমাদের দৃষ্টিপথের বাইরে জড়ের দ্বারা আবৃত জগৎ আবিষ্কারের শক্তি, অন্যদিকে প্রকৃতির গূঢ় গোপন শক্তির অধিকারে মানুষকে অধিষ্ঠিত করে

৫৩। Letters on Yoga: The Supramental Evolution—শ্রীঅরবিন্দের জন্মশত বার্ষিক গ্রন্থমালার ২২শ খণ্ডের ১-৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

থাকে এই Intuition। অন্যদিকে সেই Intuition আমাদের আত্মিক অর্থেই আত্মাবিষ্কারের সাহায্যপ্রদ। ভারতে অলৌকিক বিদ্যার (occult knoledge) বদলে আত্মজ্ঞানের দিকেই আমাদের স্বাভাবিক গতি গেছে। আগে ঘটে স্বজ্ঞার শাসন, তারপর ঘটেছে বুদ্ধির রাজ্য। তবে বৈদিক যুগে এদেশে সব মানুষই যে অন্তর্মুখী ছিলেন, সেরকম ধারণা ঠিক নয়।

মানুষের সে-যুগেরও এই গতি সম্বন্ধে অরবিন্দের আর একটি উক্তি—"The mass of men at the time, is quite evident, lived entirely on the material plane"। এবং যাঁরা বৈদিক যুগের সাধক বা তপস্বী ছিলেন তাঁরা মন্ত্রগুপ্তির ওপর খুবই জোর দিয়েছেন। মন্ত্রগুপ্তির একটি কারণ হয়তো এই ছিল যে, সর্বসাধারণ জড় জগতের স্তরেই আবদ্ধ ছিলেন, তাঁরা মনের উচ্চতর স্তর সম্বন্ধে নিস্পৃহ বা অবিশ্বাসী ছিলেন বলেই সবকথা তাঁদের বোধে পৌঁছোনো সম্ভব ছিল না। হয়তো সেই কারণেই গূঢ়জ্ঞানের ভাষা যথাসাধ্য সাংকেতিক, প্রতীকী বা অনতিব্যক্ত করে রাখতে চেয়েছিলেন সাধকরা।

২৬

অরবিন্দকে যাঁরা চিরগম্ভীব সন্ত্রাসবাদী থেকে চিরগম্ভীর যোগীতে পরিণত সরসতাবর্জিত বিদ্যা-বুদ্ধির জাহাজ মাত্র ভাবেন, তাঁরা তাঁর মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাণখোলা হাসির ঢেউ থেকে অরবিন্দকে বড়োই বিচ্ছিন্ন করে দেখেন। রাজনারায়ণের বড়ো ছেলে সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁর বন্ধু সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়কে বলেছিলেন—"বাবা যখন দ্বিজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে গল্প করেন, আর দুই বন্ধুতে হাসিতে থাকেন তখন মনে হয় বাড়ির ছাদটা বুঝি হাসির তরঙ্গে আসিয়া যাইবে।" জীবনের শেষ অধ্যায় অবধি রাজনারায়ণের সেই হাসির মেজাজ অটুট ছিল।

অরবিন্দ যখন বরোদায় ছিলেন, সেই পর্বে সেখানে তাঁর এক গুজরাটী পরিচালক ছিল। তার নাম কেষ্টা। একদিন বিখ্যাত চিত্রকর শশীকুমার হেশ ও অন্যান্য কয়েকজন বন্ধুকে আহারের আমন্ত্রণ জানিয়ে কেষ্টাকে ঘি মশলা ইত্যাদি প্রচুর উপকরণ সংগ্রহের হুকুম দেওয়া হয়। তিনি নিজে যদিও অম্লানবদনে গুজরাটী খাদ্য খেতে পারতেন, তবু সেদিন বাঁকুড়া থেকে বরোদায় নিয়ে যাওয়া নতুন বাঙ্গালী ঠাকুরটিকে গল্‌দা চিংড়ি ইত্যাদি রান্নার ফরমাস দেওয়া হয়। সেই বাঁকুড়ার পাচকটি সবকিছুই ঘিয়ে ভেজে পরিবেশন করে। যাঁরা আহারে বসেছিলেন, সেই অখাদ্যের স্বাদে তাঁরা হাত গুটিয়ে উঠে পড়তে বাধ্য হন, কিন্তু—দীনেন্দ্রকুমারের কথায়—"অরবিন্দ তাহার রন্ধন-কৌশলের পরিচয়ে হাসিয়াই অস্থির।"

সেই বাঁকুড়ার ঠাকুরটি সুদূর বরোদায় গিয়ে বড়োই দুঃখে দিন কাটাচ্ছিল। দেশে ফেরবার জন্যে তার মন আঁকুপাঁকু করে। বিকেলে সেই বাড়ির বাগানে এক চন্দন-গাছের নিচে বসে সে গলা ছেড়ে গান ধরতো—"যা রে কোকিলা আমার প্রাণ-বঁধু যেখানে।"

এদিকে কেষ্টা সার্থকনামা ব্যক্তি। তার গায়ের রঙ্‌ ঘোর কৃষ্ণ, তার দুই প্রকোষ্ঠে রূপোর বালা, কানে মাকড়ি, দাঁতগুলি খুবই বড়ো বড়ো। অরবিন্দর তরিতরকারির বাজার করতে গিয়ে যথারীতি বেশ দুপয়সা রোজগার করতো সেই কেষ্টা।

বাপুভাই মজ্‌মুমদার নামে এক গুজরাটী ব্রাহ্মণ ব্যারিস্টার অরবিন্দের অতিথি হিশেবে কিছুদিন ছিলেন সেখানে। গম্ভীরপ্রকৃতি অরবিন্দ তাঁর মজার মজার গল্প শুনে হো হো করে হাসতেন।

পরে তাঁর পুরোপুরি যোগী-জীবনের পর্বেও তাঁর রসিকতার অন্ত ছিলনা। পণ্ডিচেরিতে তাঁর ভক্ত ও গুণগ্রাহীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের মধ্যে অনেক জটিল আলোচনাতেও তাঁর সরস মন্তব্য পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত, নলিনীকান্ত সরকার, দিলীপকুমার রায় প্রভৃতির মুখ থেকে সোজাসুজি সে-বিষয়ে শোনবার সুযোগ আছে এখনো। তাছাড়া পণ্ডিচেরির 'শ্রীঅরবিন্দ ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার অফ এডুকেশন' থেকে প্রকাশিত 'Sri Aurobindo's Humour' (Correspondence Part III) এই বিষয়ে নানা তথ্যের এক আকরগ্রন্থ।[৫৪] নীরদবরণ এই বইয়ের ভূমিকায় ইংরেজিতে যা লিখেছেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশের বঙ্গানুবাদে এই বলা যায় যে, ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮-এর

৫৪। প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৭৪।

মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রের যে সংগ্রহ অনেকদিন আগে ছাপা হয়, এটিতে বিশেষভাবে সে-বইয়ের কৌতুকহাস্যপরিহাসের প্রসঙ্গগুলিই গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। এই ভূমিকাতেই দেখা যায়, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এক শিষ্যকে লেখেন—কৌতুকবোধের কথা? সে তো অস্তিত্বের মূল! ওটা না থাকলে জগতের ভারসাম্য পুরোপুরি নষ্ট হোতো—ইতিমধ্যে তো দুনিয়া বেসামাল হয়ে পড়েছে অনেকটা—এবং জ্বলতে পুড়তে ছুটতো অনেক আগেই![৫৫] নীরদবরণ বলেছেন অরবিন্দ নিজেই ছিলেন রসস্বরূপ—রসো বৈ সঃ। যাঁরা দিলীপকুমারের 'তীর্থংকর' (তৃতীয় সংস্করণ—পরিবর্ধিত; ১৩৫৮; কালচার পাবলিশার্স) বইটি পড়েছেন, তাঁরা সে-বইয়ের ২০৮ থেকে ২৯৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শেষ অধ্যায়টি পুরো পড়ে দেখলে অরবিন্দের অসামান্য পরিহাসবোধ ও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অকৃত্রিম সরসতার স্বাদ পাবেন।

শুধু সমবেদনাময় পরিহাস নয়, ব্যঙ্গবিদ্রূপেও অরবিন্দের চিত্তের ঘাটতি ছিলনা কোথাও। দিলীপকুমারের 'স্মৃতির শেষ পাতায়' (বৈশাখ, ১৩৫৮) বইয়ের 'সাবিত্রী' অংশ (২'১০) থেকে এই ছত্রগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে—সেইসঙ্গে দিলীপকুমারেরই বঙ্গানুবাদ—

An inconclusive play in Reason's toil.
Each strong idea can use her as its tool;
Accepting every brief she pleads her case.
Open to every thought she cannot know.
The eternal advocate, seated as judge.
Armours in logic's invulnerable mail
A thousand combatants for truth's veiled throne
And sets on a high horseback of argument
To tilt for ever with a wordy lance
In a mock tournament where none can win.

দিলীপকুমারের অনুবাদ—

বিচিত্র বুদ্ধির লীলা খেলা! তার বাঙ্ময় যুক্তির
বহু প্রয়াসেরো অন্তে পায় না সে নিশ্চিন্তির দিশা।

৫৫। "Sense of humour? It is the salt of existence. Without it the world would have got out of balance—it is unbalanced enough already—and rushed to blazes long ago."

প্রতি দীপ্ত ভাবধারা করে তাকে নিত্য আজ্ঞাবাহী।
বরণ করে সে প্রতি চিন্তা—তবু লভে না তো জ্ঞান।
একাধারে চিরন্তন ব্যবহারাজীব বিচারক
সত্যের-প্রচ্ছন্ন-সিংহাসন লুব্ধ লক্ষ যুধ্যমানে
ন্যায়ের দুর্ভেদ্য বর্মে সুরক্ষিয়া—করিয়া আসীন
তুঙ্গ-তর্ক-তুরঙ্গম পৃষ্ঠে করে উদ্দীপিত শুধু
তাদের অসাঙ্গ কথা কথাসার মল্লযুদ্ধে—এক
মায়ারণাঙ্গনে—যেথা পারে না কেহই হতে জয়ী।

দিলীপকুমারের কথায়—"এ মৃদু ব্যঙ্গের নিশানা মানুষের মগজী বুদ্ধির অনপনেয় অভিমান।"[৫৬]

সাহিত্যের স্বরূপ বিচারের ক্ষেত্রেও তাঁর অনেক রকম গভীর চিন্তার মধ্যে তাঁর চকিত হাসির ঝিলিক দেখা দেয় ক্ষণে ক্ষণে। যোগের অভিজ্ঞতার দিক,—আবার মনের অগোছালো অবস্থা, এই দুয়ের কথায়-কথায় সাহিত্যের প্রসঙ্গও ঢুকে পড়েছে—যেমন 'সুররিয়ালিজ্‌ম'-এর প্রসঙ্গে কখনো কখনো ঘটেছে। নীরদবরণের 'স্বপ্নদীপ' (২১, ফেব্রুয়ারি, ১৩৫৮) নামে কবিতার বইটি—যা তিনি 'মা ও শ্রীঅরবিন্দের চরণকমলে' নিবেদন করেন,—সেটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা 'ভূমিকা' থেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে ১৯৩৫-৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত সেই কবিতাগুলি "শ্রীঅরবিন্দের যোগশক্তির প্রেরণায়' দেখা দেয়; নীরদবরণ তাঁর তরুণ বয়সে সাহিত্যে অনুরাগী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর নিজের কথায়—"ডাক্তারী শিক্ষার সেই নির্দয় চাপে বাল্য-আকর্ষণও বীতরাগে পরিণত হল। পণ্ডিচেরী আসার দুতিন বছর পরে মনের আকাশে কবিতা লিখবার বাসনা খণ্ড সাদা মেঘের মত দেখা দিল। এখন আশ্রমের শিল্পযুগ: নলিনী গুপ্ত, সুরেশ চক্রবর্তী, দিলীপ রায়, সাহানা দেবী প্রমুখ খ্যাত ও অখ্যাতনামা অনেকে যোগের অঙ্গ হিসাবে সাহিত্যের গানের শিল্পের আরাধনায় তৎপর। মা ও অরবিন্দ তাঁদের অন্তঃপ্রেরণা ত দিচ্ছেনই, উপরন্তু বাইরেও আলাপে, আলোচনায় উৎসাহ দিচ্ছেন। এই রসের হাওয়ায় আমার প্রাণও দুল্‌ল এবং সাদা মেঘে আস্তে আস্তে রঙের ছাপ লাগল।" বছর দেড়েক শিক্ষানবীশী পর্বের পরে—"কলম দিয়ে স্রোতের মত কবিতা বের হতে লাগল।" একে তিনি 'মিরাকল্‌' বলেছেন। শ্রীঅরবিন্দকে সেইসব রচনার সত্যিকার কাব্যমূল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন জানানো এ-অবস্থায় খুবই স্বাভাবিক।

৫৬। 'স্মৃতির শেষ পাতায়'; পৃষ্ঠা ৪২-৪৩ দ্রষ্টব্য।

শ্রীঅরবিন্দ বল্লেন—কতকটা ঠাট্টা করেই বলেছিলেন,—সেসব হোলো সুররিয়ালিস্ট কবিতা,—তবে সেটা পুরোপুরি ঠাট্টা নয়। সেও তাঁর নিজের ভাষাতেই দেখা যেতে পারে—"My labelling him (Nirodbaran) as surrealist is partly—though not altogether—a joke.।"[৫৭] অরবিন্দের রসিকতার এরকম নমুনাও অনেক আছে। নীরদবরণ অভিমান করে তাঁকে জিগেশ করেছিলেন—যখনি আমার লেখায় প্রকাশের কোনো কাঠিন্য বা দুর্বোধ্যতা ঘটে—এক ভাব বা ছবি থেকে অন্য ভাবের বা চিত্রের দিকে গতিপথে কোনো অসুবিধা হয় তখনি আপনি বলেন, ও কিছু নয়, 'সুররিয়ালিস্ট'!—তার মানে কী? আমাকে বোকার মতন মুখ করে থাকতে হয় যে! তার উত্তরে অরবিন্দ বলেন—"Why foolish? Make a mystic face and say "it means too much for owls"। এই ছিল কৌতুকপ্রিয় অরবিন্দের স্বভাব। কবিতার দুর্বোধ্যতা প্রসঙ্গে তিনি সেই ভাবনাতে লেখেন—"Obscurity and unintellgibility are not the essence of any poetry—except for unconscious or semi-conscious humourists like the Dadaists—cannot be its aim or principle।"[৫৮]

এসব কথা সুররিয়ালিজ্‌ম্‌ বা ডাডাইজ্‌ম্‌ প্রসঙ্গে অরবিন্দের বিস্তৃততর মতামতের জন্যে নয়—তাঁর কৌতুক-স্বভাবের প্রসঙ্গেই দেখা গেল। সুর-রিয়ালিস্ট কবিতা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের নিজের চিন্তা বাংলায় কিছু কিছু অনূদিত হয়েছে। ১৩৮০ সালের প্রথম সংখ্যার 'শৃণ্বন্তু' পত্রিকায় এই বঙ্গানুবাদের আংশিক কিস্তিতে 'সুর-রিয়ালিস্ট' কবিতাকে 'অধিবাস্তবী' কবিতা বলা হয়। অন্যত্র 'পরাবাস্তব' শব্দটি 'সুর-রিয়ালিস্ট' অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় 'স্বপ্ন-চেতনা' শব্দটি এই সূত্রে এসে পড়ে। ফরাসী কবি বোদলেয়র, ভালেরি, ভেয়ারলেন, র‍্যাবো প্রভৃতির নাম শোনা যায় এই সূত্রে—তবে, এঁরা প্রত্যেকেই পরাবাস্তববাদী বা অধিবাস্তববাদী ছিলেন না। শ্রীঅরবিন্দের উক্তির বঙ্গানুবাদে দেখা যায়—"বাহ্য চেতনার হাত থেকে ইউরোপীয় মনের যে ক্রমবর্ধমান মুক্তি-প্রয়াস শুধু কাব্যে নয় চিত্রাঙ্কনে এবং চিন্তাধারাতেও; বস্তুর একটা গভীরতর সত্যের যাকে স্থূল স্তরে পাওয়া যায় না—তার জন্য যে অনুসন্ধান, তারই একটা অংশ হ'ল এই Surrealism।

৫৭। 'স্বপ্নদীপ': নীরদবরণ, ভূমিকা—পৃষ্ঠা ৩ দ্রষ্টব্য।

৫৮। তদেব।

যাকে স্বপ্ন-চেতনা নাম দেওয়া হয় তার অর্থ—তা যে স্বপ্নেই শুধু দেখা যায় তা নয়, তা হ'ল আন্তর চেতনায় যেখানে আমরা স্পর্শ লাভ করি সেইসব গভীরতর জগৎ যার তলদেশে রয়েছে, যা আমাদের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং অনেকখানি তার ব্যাখ্যা করতে পারে। মনোবিজ্ঞানীরা যাকে বলেন মগ্নস্তর বা অবচেতনা (অবচেতন কথাটি যদিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়) তা হল পলায়ন-পর্বের প্রথম পথ আর Sur-realist-রা এই পথই কেটে চলতে চেয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ নিজে যখন এ-আলোচনা করেন, সেই ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'সুররিয়ালিজম্' সম্বন্ধে তিনি মোটেই অকুণ্ঠ প্রশংসার কথা বলেন নি, বরং একে এক ধরনের অস্পষ্টতার ভঙ্গিই মনে হয়েছিল তাঁর। তিনি আরো যা লেখেন তার বঙ্গানুবাদে পাই—"অস্পষ্টতা এবং অবোধ্যতা কোন কবিতারই সারবস্তু হতে পারে না, এক হয়তো দাদা-দলের (dadaist) মত অচেতন অথবা অর্ধচেতন রসিকজন ছাড়া; তা কখনোই কবিতার মোক্ষ এবং মূলসূত্র হতে পারে না।"

কিন্তু এখনো অনেক দিক দেখা দরকার। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্বে ১৯১০-এর পরে ১৯১৪ পর্যন্ত গেছে এক ধরনের সাধনা, তারপর আরো অন্য ধরনের,—আরো গহন, গভীর, নির্বাকপ্রায়! ইতিমধ্যে শ্রীমা এসেছেন আশ্রমে। পণ্ডিচেরির মায়ের কথার কিছু কিছু ইশারা আগেই দেওয়া হয়েছে। পল রিশারের পত্নী ছিলেন তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই বহু দূর দেশ থেকে শ্রীঅরবিন্দকে দেখেছেন তিনি। ১৯১৪ থেকে শুরু করে শ্রীঅরবিন্দের তিরোধানকাল ১৯৫০ পেরিয়ে, মায়ের তিরোধান ১৯৭০ পর্যন্ত বাহ্য প্রকাশে, আধ্যাত্মিক মমতায় শ্রীঅরবিন্দ আর শ্রীমা অভিন্ন সত্তা—সকলেই জানেন একথা। এই বইয়ের প্রথম খণ্ডেই আরো কিছু কথা বলে নিয়ে, তারপরে মায়ের প্রসঙ্গ দেখা যাবে। তার আগে ১৯০৮-১০ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার ফেরা যাক। বিপ্লবী অরবিন্দের যোগ-দর্শনের বিশেষ প্রহর গেছে তখন।

২৭

চারুচন্দ্র দত্তের (১৮৭৬-১৯৭২) পুরানো কথা থেকে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের সঙ্গে অরবিন্দের যোগের বিবরণ এর আগেই কতকটা দেখা গেছে। এইবার তাঁর নিজের বাংলা রচনা 'কারাকাহিনী' থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য দেখা দরকার। তিনি ঐ আলোচনার সূচনাতেই লিখে গেছেন—"১৯০৮ সনের

শুক্রবার ১লা মে আমি "বন্দেমাতরম্" আফিসে বসিয়াছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী আমার হাতে মজঃফরপুরের একটি টেলিগ্রাম দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম মজঃফরপুরে বোমা ফাটিয়াছে, দুটি য়ুরোপীয়ান স্ত্রীলোক হত। সেদিনের "এম্পায়ার" কাগজে আরও পড়িলাম, পুলিশ কমিশনার বলিয়াছেন আমরা জানি কে কে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এবং তাহারা শীঘ্র গ্রেপ্তার হইবে। জানিতাম না তখন যে আমি এই সন্দেহের মুখ্য লক্ষ্যস্থল, আমিই পুলিসের বিবেচনায় প্রধান হত্যাকারী, রাষ্ট্রবিপ্লবপ্রয়াসী যুবকদলের মন্ত্রদাতা ও গুপ্ত নেতা। জানিতাম না যে এই দিনই আমার জীবনের একটা অঙ্কের শেষ পাতা, আমার সম্মুখে এক বৎসরের কারাবাস, এই সময়ের জন্য মানুষের জীবনের সঙ্গে যতই বন্ধন ছিল, সবই ছিন্ন হইবে, এক বৎসরকাল মানব-সমাজের বাহিরে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত থাকিতে হইবে। আবার যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব, তথায় সেই পুরাতন পরিচিত অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে না, কিন্তু একটি নূতন মানুষ নূতন চরিত্র, নূতন বুদ্ধি, নূতন প্রাণ, নূতন মন লইয়া নূতন কর্মভার গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইবে।"

সম্প্রতি এ. বি. পুরানি সম্পাদিত শ্রীঅরবিন্দের জীবনের ঘটনাবলীর সাল-তারিখ সমেত যে বিশেষ নির্ভরযোগ্য এক গবেষণা গ্রন্থের মতো বিস্তৃত সারকথা ইংরেজিতে বেরিয়েছে, সেটি পড়ে দেখলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক অরবিন্দ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য আরো নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাবেন।[৫৯] তবে এখানে যতোটা সে-বই থেকে ততোধিক অন্যান্য বই থেকে তাঁর এই রূপান্তরের দিকটিতে চোখ রাখা যাক।

তাঁর এই কারাবাসই তাঁর পূর্বজীবনের সঙ্গে পরবর্তী আয়ুষ্কালের বিভেদ-সীমা। পুরো 'কারাকাহিনী'-ই এজন্যে পড়ে দেখা উচিত,—সেই সঙ্গে ইংরেজিতে রচিত তাঁর প্রসিদ্ধ উত্তরপাড়া-ভাষণ। তবে কংগ্রেসের সুরাট-অধিবেশনের পরে অরবিন্দ যখন বরোদায় যান, সেই সময়ে অরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্রের তার পেয়ে জয়পুরের অধিবাসী দক্ষিণী ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভাস্কর লেলে বরোদায় আসেন। সাখরিয়া স্বামী নামে আর এক সাধুও সুরাট-কংগ্রেসের সময়ে অরবিন্দের অনুচর বারীন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে জুটে যান। সে যাই হোক, সেইবার বরোদাতে যা ঘটেছিল এই সূত্রে সে-তথ্য খুবই প্রাসঙ্গিক :

৫৯। The Life of Sri Aurobindo : (1872-1926) A. B. Purani বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২১ এর ফেব্রুয়ারীতে।

—"বরোদা যাত্রার পূর্বেই আমি লেলেকে তার করি যে, অরবিন্দ তাঁর দর্শনাভিলাষী। বেলা ৮৷৯ টায় লেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাতে ও অরবিন্দ একান্তে আধঘণ্টা আলাপ হইল, আমরা তখন স্যার সুবা খাসিরাও যাদবের বাড়িতে। লেলের সহিত সেই প্রথম আলাপের পর বরোদায় তিনটি সভায় অরবিন্দ বক্তৃতা দেন, একবার মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহার পর আর কেহ অরবিন্দকে পায় নাই। তখন দেশময় তাঁহাকে চায়। বরোদায় কত মানুষ তাঁহাকে দেখিতে উন্মুখ! লেলে কিন্তু বলিলেন, "আমার সাধনা তোমায় দেব, কিন্তু একান্তে সাত দিন আমার সঙ্গে থাক'—অরবিন্দ বলিলেন, "কোথায়?"

"লেলে—আমি গোপন স্থানের ব্যবস্থা করবো। তাহাই হইল। হঠাৎ অরবিন্দ উধাও হইলেন। চারিদিকে পাগলের মত শহর সমেত মানুষ যাঁহাকে খুঁজিতেছে, তিনি কোথাও নাই! যেখানে লেলের নির্দেশে আমরা গেলাম সে এক বিরাট জনহীন পুরী। সেখানে লেলের স্ত্রী রাঁধেন, অরবিন্দ, লেলে ও আমি খাই। তাঁহারা দুজনেই দিবারাত্র মুখোমুখী ধ্যানে কাটান। আমায়ও লেলে বসিবার জন্ত পীড়াপীড়ি করেন, আমি মাঝে মাঝে বসি বটে কিন্তু মাথায় তখন বিপ্লবের পোকা গজ গজ করিতেছে, তাহারা আমায় স্থির হইয়া বসিতে দিবে কেন? লেলে র কাছে পথ পাবার পরে অরবিন্দ কি করলেন? বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন—"অরবিন্দ স্বভাবযোগী ও ধীরপ্রকৃতি, বরোদায় সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি পুস্তকের রাশির মধ্যে ডুবিয়া সে অসাধ্য জ্ঞানের তপস্যা তাঁহাকে করিতে দেখিয়াছি, তাহাতেই বেশ স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল যে তিনি কোন্ অসাধারণ ধাতুর তৈয়ারী। কয়েকদিনের অনন্যমন সাধনায় লেলের সমস্ত যোগবল অরবিন্দে সঞ্চারিত হইয়া গেল, মাত্র তিনদিনে তিনি অচল নীরব ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিলেন। বরোদা হইতে বোম্বাইয়ে আসিলে এই অপূর্ব সাধনা আরও ফুটিল, স্বতঃস্ফূর্ত মন্ত্র আপনি উঠিতে লাগিল।"[৬০]

"পুণায় বক্তৃতাকালে অরবিন্দ লেলের উপদেশে আগে কর্তব্য বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া বক্তৃতা দেওয়া ছাড়িয়া দিলেন। শান্ত হইয়া শূন্য মন নিয়া বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইবা মাত্র, আপনি অনর্গল কথার পর কথা কে যেন অন্তরে বসিয়া, যোগাইয়া দিত। তাঁহার পর তাঁহার কলিকাতা যাত্রা; যাইবার পূর্বে তিনি

লেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, "এখন তো আমি আপনাকে সঙ্গে পাব না, কিরূপ কি প্রণালীতে সাধনায় চলতে হবে আমায় বলে দিন।" লেলে প্রথমে সাধনার নানা উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ থামিয়া বলিলেন, "তোমার কাছে যে বাণী এসেছে, তাতে অকপট বিশ্বাস স্থাপন করে চলতে পারবে?"

অর—হ্যাঁ, তা সহজেই পারবো।

লে—তবে তাই করো তা' হ'লে আর কোন উপদেশই দরকার হবে না। ঐ বাণীই তোমায় সব বুঝাবে ও করাবে।

তাহার পর আমার কলিকাতা প্রত্যাবর্তন ও অরবিন্দের পুণার দিকে যাত্রা। তাঁর পথ মুক্ত, সহজ রাজনীতি; আমার পথ গুপ্ত, কুটিল বিদ্রোহ, কাজেই কতদিন আর একসঙ্গে চলে? অত বড় স্বদেশী বয়কটী যুগ গিয়াছে, তাঁর সঙ্গে যে আমার মাত্র ক'দিন দেখা হইয়াছে ভাবতে গেলে আশ্চর্য হইতে হয়। অথচ জ্ঞানতঃই হউক বা অজ্ঞানতঃই হউক, আমার কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়কালের তিনিই নেতা বল, আদর্শ বল, গুরু বল—সবই।"[৬১]

বারীন্দ্র, উল্লাসকর দত্ত, চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যেরকম গুপ্ত সন্ত্রাসবাদের পথে ছিলেন, অরবিন্দ দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে হয়তো ততোধিক আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু তাঁর পথ শুরু থেকেই পূর্ণভাবে না হলেও অস্ফুটভাবে ছিল রাজনৈতিক-আধ্যাত্মিক।

'কারাকাহিনী'-তে তাঁর আত্মকথা এইরকম—"বলিয়াছি এক বৎসর কারাবাস, বলা উচিত ছিল এক বৎসর বনবাস, এক বৎসর আশ্রমবাস। অনেক দিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলাম; উৎকট আশা পোষণ করিয়াছিলাম জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে, প্রভুভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কর্মে আসক্তি, অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহা পারি নাই। শেষে পরম দয়ালু সর্বমঙ্গলময় শ্রীহরি সেই সকল শত্রুকে এক কোপে নিহত করিয়া তাহার সুবিধা করিলেন, যোগাশ্রম দেখাইলেন, স্বয়ং গুরুরূপে, সখারূপে সেই ক্ষুদ্র সাধন কুটীরে অবস্থান করিলেন। সেই ইংরাজের কারাগার।"

তিনি আরো লেখেন—"বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোপ-দৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পাইলাম।" এই কারাবাসের যন্ত্রণার বিবরণ তিনি রেখে

৬১। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪ দ্রষ্টব্য।

গেছেন, কিন্তু তাঁর ততোধিক উপলব্ধি হোলো—"কষ্ট যে ছিলনা তাহা বলা যায় না, কিন্তু অধিকাংশকাল আনন্দেই কাটিয়া গিয়াছে।"

যে ১৯০৮-এর পয়লা মে শুক্রবার শেষ রাত্রে ৪৮ নম্বর গ্রে-ষ্ট্রীটের বাড়িতে তিনি গ্রেপ্তার হন, সেই নিশিশেষ তাঁর ভাষাতেই দেখে নেবার প্রলোভন স্বাভাবিক। অতএব পুনরায় ঐ একই রচনার উদ্ধৃতি দেওয়া হোলো —"শুক্রবার রাত্রিতে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছিলাম, ভোরে প্রায় ৫ টার সময় আমার ভগিনী সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, জাগিয়া উঠিলাম। পরমুহূর্তে ক্ষুদ্র ঘরটি সশস্ত্র পুলিসে ভরিয়া উঠিল; সুপারিন্টেডেণ্ট ক্রেগান, ২৪ পরগণার ক্লার্ক সাহেব, সুপরিচিত শ্রীমান বিনোদকুমার গুপ্তের লাবণ্যময় ও আনন্দদায়ক মূর্তি, (এও অরবিন্দের নির্মল পরিহাসের দীপ্তি) আর কয়েকজন ইনস্পেক্টার, লাল পাগড়ি, গোয়েন্দা, খানাতল্লাসীর সাক্ষী।" হাতে পিস্তল নিয়ে পুলিশ এসেছিল; অরবিন্দের বোনের বুকের ওপরেও নাকি পিস্তল ধরেছিল। ক্রেগান জিগেশ করে—তিনি অরবিন্দ ঘোষ কিনা। অরবিন্দের 'হাঁ' উত্তর শুনে ক্রেগান তাঁকে গ্রেপ্তারের হুকুম দেয়,— "তাহার পর ক্রেগানের একটি অতিশয় অভদ্র কথায় দুজনের অল্প ক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডা হইল।" ওয়ারেণ্ট দেখে অরবিন্দ নিজের স্বাক্ষর দেন এবং বোঝেন যে—"এই পুলিস সৈন্যের আবির্ভাব মজঃফরপুরের খুনের সহিত সংশ্লিষ্ট।"—"কেবল, বুঝিলাম না আমার বাড়িতে বোমা বা অন্য কোন স্ফোটক পদার্থ পাইবার আগেই বডি-ওয়ারেণ্ট-এর অভাবে কেন আমাকে গ্রেপ্তার করে। তবে সেই সম্বন্ধে বৃথা আপত্তি করলাম না। তাহার পরেই ক্রেগানের হুকুমে আমার হাতে হাতকড়ি কোমরে দড়ি দেওয়া হইল। একজন হিন্দুস্থানী কনস্টেবল সেই দড়ি ধরিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই সময়েই শ্রীযুক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র বসুকে পুলিস উপরে আনে, তাহাদের হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি। প্রায় আধ ঘণ্টার পর কাহার কথায় জানি না, তাহারা হাতকড়ি ও দড়ি খুলিয়া লয়।"

অরবিন্দের এই লেখাটির মধ্যে নিখুঁত তথ্য, দেশী ও ইংরেজ পুলিসের কর্মচারীদের সম্বন্ধে সংগত ব্যঙ্গবাণ এবং তাঁর চেনা-অচেনা অনেকের—যেমন পূর্বোক্ত অবিনাশচন্দ্র, শৈলেন্দ্র,—নিরাপদ, দীনদয়াল, হেমচন্দ্র দাস প্রভৃতির নামোল্লেখ পাওয়া যায়। শনিবার সকাল প্রায় সাড়ে এগারোটার সময়ে তাঁদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়; সে সময়ে ফটকের সামনে তাঁর মেশোমশাই ছিলেন, ভূপেন্দ্রনাথ বসুও ছিলেন। নরহত্যার মামলা আনা হয়েছিল অরবিন্দের—

বিরুদ্ধে। তাঁদের গ্রে-স্ট্রীটের বাড়ির নিচের তলায় 'নবশক্তি' আপিশেও খানাতল্লাশী চলে। তাঁর নিজের কথায়—"পরে শুনিলাম আমার সলিসিটর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রে ষ্ট্রীটে আসিয়া খানাতল্লাসীতে আমার পক্ষে উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পুলিস তাঁহাকে ফিরাইয়া দেয়।" থানা থেকে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের। রামসদয় মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী, মৌলবী শাম্‌স্‌-উল আলম, পুলিস-কমিশনার হ্যালিডে সাহেব, নর্টন ইত্যাদি সরকার-পক্ষের ব্যক্তিদের ক্রিয়াকলাপের প্রসঙ্গও তিনি উল্লেখ করেছেন। গ্রেপ্তারের প্রায় দেড়মাস আগে যে অপরিচিত হিতৈষী অরবিন্দকে গোপনে বলে গিয়েছিলেন—"ইহার পর কোন্নগরের কাহারও সহিত দেখা করিবেন না, আপনার ও আপনার ভাই বারীন্দ্রের বিরুদ্ধে দুষ্টেরা ষড়যন্ত্র করিতেছে, শীঘ্রই আপনাদিগকে তাহারা বিপদে ফেলিবে"—তাঁর উল্লেখও এই 'কারাকাহিনী'তে পাওয়া যায়। রবিবার হাজতে থাকবার পরে সোমবার কমিশনার-এর কাছে আসামীদের পৃথক পৃথক দলে নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার ম্যাজিস্ট্রেট থর্নহিল-এর এজলাসে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন কুমারকৃষ্ণ দত্ত, ম্যানুয়েল সাহেব ও অরবিন্দের এক আত্মীয়ের সঙ্গে অরবিন্দের দেখা হয়। সেই আত্মীয়কে অরবিন্দ বলেন—"বাড়িতে বোলো কোনো ভয় যেন না করে, আমার নির্দোষিতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইবে।" থর্নহিল সাহেবের এজলাস থেকে সোজা পুলিশের গাড়িতে অরবিন্দ ও অন্যান্য আসামীদের আলিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর ক'টি উক্তি পর-পর সাজিয়ে দেখা যাক্—(১) "প্রথম নির্জন কারাবাসে মন একটু বিচলিত হয় কিন্তু তিন দিন প্রার্থনা ও ধ্যানে কাটানর ফলে নিশ্চলা শান্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস পুনঃ প্রাণকে অভিভূত করে।" (২) "৫ই মে আলিপুরের কারাবাস আরম্ভ। পরবৎসর ৬ই নিষ্কৃতি পাই। আমার নির্জন কারা-গৃহটি নয় ফুট দীর্ঘ, পাঁচ ছয় ফুট প্রস্থ ছিল; ইহার জানালা নাই সম্মুখভাগে বৃহৎ লোহার গরাদ, এই পিঞ্জরই আমার নির্দিষ্ট বাসস্থান হইল। ঘরের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র উঠান, পাথরের জমি, ইটের উচ্চ দেওয়াল, সামনে কাঠের দরজা। সেই দরজায় উপরিভাগে মানুষের চক্ষুর সমান উচ্চতায় ক্ষুদ্র গোলাকার রন্ধ্র, দরজা বন্ধ হইলে শান্ত্রী এই রন্ধ্রে চক্ষু লাগাইয়া সময় সময় দেখে, কয়েদী কি করিতেছে। কিন্তু আমার উঠানের দরজা প্রায়ই খোলা থাকিত।"—(৩) "আলিপুর গবর্নমেণ্ট হোটেলের (অর্থাৎ জেলখানার) যে বর্ণনা

করিলাম এবং ভবিষ্যতে আরও করিব, তাহা নিজের কষ্টভোগ জ্ঞাপন করিবার জন্য নয়; সুসভ্য বৃটিশ রাজ্যে মোকদ্দমার আসামীর জন্য কি অদ্ভুত ব্যবস্থা, নির্দোষীর দীর্ঘকালব্যাপী কি যন্ত্রণা হইতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্য এই বর্ণনা। যে সব কষ্টের কারণ দেখাইয়াছি, সে সব ছিল বটে, কিন্তু ভগবানের দয়া দৃঢ় ছিল বলিয়া কয়েকদিন মাত্র এই কষ্ট অনুভব করিয়াছিলাম, তাহার পরে—কি উপায়ে তাহা পরে বলিব—মন সেই দুঃখের অতীত হইয়া কষ্ট অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। সেই জন্য জেলের স্মৃতি মনে উদয় হইলে ক্রোধ বা দুঃখ না হইয়া হাসিই পায়।'' এও অরবিন্দের সরসতার উদাহরণ!

এই তিনটি উক্তিতে তাঁর সেই যন্ত্রণার মধ্যেও মনের সরসতা ও আত্মিক প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি পাই। এই প্রত্যয়ের বিশদতর উদাহরণের জন্যে এইবার চতুর্থ আর একটি বক্তব্য দেখা যাক। (৪) "আমার কিন্তু তখন বিরক্তিভাব মনে স্থান পায় নাই, বরং আমার ও দেশের সাধারণ অশিক্ষিত লোকের মধ্যে কোন প্রভেদ হয় নাই দেখিয়া একটু আনন্দিত হইয়াছিলাম, অধিকন্তু এই ব্যবস্থা মাতৃভক্তির প্রেমভাবে আহুতি দান করিল। এক বুঝিলাম যোগ শিক্ষা ও দ্বন্দ্বজয়ে অপূর্ব উপকরণ ও অনুকূল অবস্থা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমি চরমপন্থী দলের একজন, যাহাদের মতে প্রজাতন্ত্র এবং ধনী-দরিদ্রে সাম্য জাতীয় ভাবের একটি প্রধান অঙ্গ। মনে পড়িল সেই মতকে কার্যে পরিণত করা কর্তব্য বলিয়া সুরাট যাত্রার সময় সকলে একসঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হইয়াছিলাম, ক্যাম্পে নেতারা নিজেদের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত না করিয়া সকলের সঙ্গে একভাবে এক ঘরে শুইতাম। ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, বাঙালী, মারাঠা, পাঞ্জাবী, গুজরাটি দিব্য ভ্রাতৃভাবে এক সঙ্গে থাকিতাম, শুইতাম, খাইতাম। মাটিতে শয্যা, ডাল-ভাত দহিই আহার, সর্ববিষয়ে স্বদেশী ধরনের পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। কলিকাতা ও বোম্বে সহরের বিলাত-ফেরত ও মাদ্রাজের তিলক-কাটা ব্রাহ্মণ সন্তান একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। এই আলিপুর জেলে বাসকালীন আমার দেশের চাষা, লোহার, কুমার, ডোম-বাগ্দীর সমান আহার, সমান থাকা, সমান কষ্ট, সমান মানমর্যাদা লাভ করিয়া বুঝিলাম সর্বশরীরবাসী নারায়ণ এই সাম্যবাদ, এই একতা, এই দেশব্যাপী ভ্রাতৃভাবে সম্মত হইয়া যেন আমার জীবনব্রতে স্বাক্ষর দিয়াছেন।"

লোকবিশ্রুত সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়িত অরবিন্দের কাছে কারাবাস

শ্রেণীবৈষম্যহীন বিশেষ গণ্ডীবদ্ধ সমাজের সাম্যপ্রাপ্তি ও ভগবৎসান্নিধ্য হয়ে ওঠে। এতে এবং তাঁর দিব্যচেতনার প্রতি আগ্রহের জন্যে অনেকের অনেক সমালোচনা শুনতে বা পড়তে হয়েছে তাঁকে। আমাদের প্রিয় লেখক শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তী ১৯২০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে, তাঁর 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি', 'অপ্রিয় সত্য ও প্রিয় অসত্য,' 'সুপার-ম্যানিয়া' প্রভৃতি উত্তেজক প্রবন্ধগুলি লেখেন। এইসব প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতির আলোচনার বিরুদ্ধে হলেও মূলত অরবিন্দের উপলব্ধি সম্বন্ধেই শিবরামের যৌবনোচিত অকৃত্রিম সংশয় ও উগ্র বিরোধিতা ব্যক্ত হয়। 'অপ্রিয় ও প্রিয় সত্য' [৬২] নিবন্ধটিতে প্রথম বাক্যেই শিবরাম লেখেন—"সুভাষচন্দ্র বসু যখন বলেছিলেন, পণ্ডিচেরির চিন্তাধারার দ্বারা ভারতের কর্মশক্তি অভিভূত হবার আশঙ্কা আছে; তখন কথাটা তিনি মুখরোচক করে বলেন নি, এইজন্যে তার ভিতরে অপ্রিয়তা, অনেকখানি আছে"।[৬৩] নলিনীকান্ত আত্মশক্তির পৃষ্ঠায় 'তরুণের স্বদেশ সাধনা' সম্বন্ধে লিখেছেন তখন। শিবরামের তখন বয়স প্রায় পঁচিশ। প্রাচীন ঐতিহ্য যে অনড় নয়, সময়ের ধারায় তা যে নতুন প্রয়োজনে সমুচিতভাবে বদলে নেওয়া যায়,—রুশদেশের সাম্যবাদী বিপ্লব তুচ্ছ নয়,—শিবরাম এইসব কথাই বলেন, যেমন তাঁর পূর্বোক্ত নিবন্ধের একটি উক্তি—"সাম্যবাদকে যাঁরা রাশিয়ার আমদানি ভারতের পক্ষে পরধর্ম বলেন তাঁরা গোড়াতেই একটা ভুল করেন। বর্ণাশ্রম লোপ করে বুদ্ধদেবের সাম্য স্থাপনের চেষ্টা তাঁরা প্রথমেই বিস্মৃত হন। অতীতের কথা ছেড়েই দিই, বর্তমানে মুসলমানরাও যে এই ভারতেরই অধিবাসী এবং তাদের মধ্যে সাম্যবাদ কোনো না কোনো রূপে অত্যন্ত সহজভাবেই বিদ্যমান—একথাও তাঁরা ভুলে যান। তারপর হিন্দুদের সনাতন যৌথ পরিবার তার ভেতরে আমরা কী দেখি?—কমিউনিজ্‌মের মূল সূত্র, সাধ্যমতো উপার্জন পরিবারে দেবে এবং প্রয়োজন মত তার থেকে নেবে। গৃহ থেকে গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী থেকে গ্রামের মধ্যে কমিউনিজ্‌মেরই প্রাচীন রূপের একটা ক্রমবিবর্তিত বিকাশ ঘটেছিল—আজ যদি তাকেই আধুনিক জীবনের ও সমস্যার উপযোগী করে বৃহত্তর সমাজে (অর্থাৎ সারা দেশের মধ্যে) বিরচনা করা যায় তাহলেই মহাভারত অশুদ্ধ হবে?" শিবরাম তাঁর ঐ

বইয়েরই 'দো রোখা' নিবন্ধে মহেন্দ্রনাথ রায় ও শচীন সেনেরও কঠোর সমালোচনা করেন।[৬৪] এখানে এসব প্রসঙ্গের বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। তবে এটুকু খুবই স্পষ্ট যে, কমিউনিজমের শ্রেণীবিরোধী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আদর্শের মূল সূত্রের অতিসরলীকরণ ঘটেছিল শিবরামের সেকালের ওই নিবন্ধে। শিবরাম 'আধ্যাত্মিকতা' ব্যাপারটিকে হয়তো তাঁর সেই তারুণ্যের উত্তেজনায় পলায়নী মনোভাব ভেবে কটাক্ষ করতে চেয়েছিলেন মাত্র।

এখানে এই কথাই নিবেদনীয় যে, 'কারাকাহিনী'তে অরবিন্দকেও কলম ধরতে হয়েছিল এক ধরনের ব্যঙ্গবাণের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন—"সেদিন দেখিলাম পুনার "Indian Social Reformer" আমার একটি বোধগম্য উক্তি লইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, জেলে ভগবৎসান্নিধ্যের বড় ছড়াছড়ি হইল দেখিতেছি!"—"হায়, মানসম্ভ্রমান্বেষী অল্প বিদ্যায়, অল্প সদ্‌গুণে গর্বিত মানুষের অহংকার ও অল্পতা! জেলে, কুটীরে, আশ্রমে, দুঃখীর হৃদয়ে ভগবৎ প্রকাশ না হইয়া বুঝি ধনীর বিলাস-মন্দিরে বা সুখান্বেষী, স্বার্থান্ধ সংসারীর আরাম-শয্যায় তাহা সম্ভব?"[৬৫]

এই 'কারাকাহিনী' নিবন্ধের অঙ্গীভূত তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ,—মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর পুলিশের বিশেষ নির্ভরের কথা-প্রসঙ্গে এই উপমা—"হলিংশেদ হল ও প্লুটার্ক যেমন সেক্‌স্‌পিয়রের জন্য ঐতিহাসিক নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, পুলিস তেমনি এই মোকদ্দমা নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল। আমাদের নাটকের সেক্‌সপিয়র ছিলেন নর্টন সাহেব"—ইত্যাদি হোলো স্বাদু সাহিত্যগুণান্বিত তথ্যসতর্কতার উদাহরণ। সরকার-পক্ষে কৌঁসলী নর্টন ছিলেন 'মাদ্রাজী' সাহেব। ম্যাজিস্ট্রেট বার্লি সাহেবের দীর্ঘ দেহ ও অল্প বুদ্ধির কথাও চমৎকার উপমার সাহায্যে অরবিন্দ প্রকাশ করেন। নিজের মুক্তির কথাসূত্রে লিখেছেন—"বেরসিক বীচক্রফ্‌ট হ্যামলেট নাটক হইতে হ্যামলেটকে বাদ দিয়া বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্যকে হতশ্রী করিয়া গেলেন।"[৬৬] নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী যখন অ্যাপ্রুভার-এর ভূমিকায় পৌঁছোয়, তখন আলিপুর জেলে মুরারিপুকুর বাগানের বোমার ব্যাপারে ও

৬৪। তদেব, পৃষ্ঠা ২৮-২৯ দ্রষ্টব্য।

৬৫। 'কারাকাহিনী' "শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী", পৃষ্ঠা ২৯২ দ্রষ্টব্য।

৬৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৩০৯ দ্রষ্টব্য।

আনুষঙ্গিক অন্যান্য কারণে জেলের সেইসব বন্দী-সম্মেলনটিতে বাধা পড়ে। অরবিন্দের নির্জন সাধনা আরো অনুকূল পরিবেশ পায়। তার আগে জেলে সবাই যখন একসঙ্গে ছিলেন, তখন বন্দীদের অধিকাংশই উৎসাহে-উদ্দীপনায়, স্ফূর্তিতে, কলরবে বিভোর ছিলেন। সেই অবস্থায় অরবিন্দ অন্যান্য বিপ্লবী বন্দীদের মধ্যে একত্রবাসের অবস্থায় এসে পড়তে বাধ্য হন—যদিও তিনি নিজে অনেকটা স্বতন্ত্র ও শান্ত ছিলেন, একথা বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। সেই অবস্থাটি ভেঙ্গে গেল। জেলের আইন আরো কড়াভাবে পালিত হতে থাকে। দুই অবস্থার কথাই এখন সুবিদিত। তাঁর নিজের কথায়—"তখন বুঝিতাম না যে আমার সাধনের পূর্ণতার জন্য বিপরীত ভাবের উদ্রেক আবশ্যক ছিল, সেইজন্য অন্তর্যামী আমাকে হঠাৎ আমার প্রিয় নির্জনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া উদ্দাম রজোগুণের স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন।"৬৭ 'রজোগুণের স্রোত' কেন? কারণ, সেই একসঙ্গে সবাই থাকবার সুযোগ পেয়ে বন্দী বিপ্লবীরা গানে আড্ডায়, ফুর্তিতে মশগুল হন! সারা রাত ওয়ার্ডে সেই আনন্দ-উৎসব চলে। তারপর অবস্থা বদলে যায়।

২৮

'কারাকাহিনী'র প্রসঙ্গ থেকে আবার কিছুক্ষণের জন্যে সরে দাঁড়িয়ে, তাঁর ও তাঁর রাজনৈতিক সতীর্থদের সমাবেশ থেকে তাঁর উপলব্ধির শেষ ফলটুকু আলাদা করে তুলে ধরা যাক—অরবিন্দ-রচনাবলীর পাঠক মাত্রই জানেন যে, তাঁর চিন্তায় দেখা যায়—বস্তু বা 'ম্যাটার' প্রকৃতির নিয়মপ্রভাবে বিবর্তন অনুসারে যথাক্রমে প্রাণ, সূক্ষ্ম শরীর ও মন পর্যন্ত অবস্থান্তরে এসে পৌছেচে। প্রকৃতি অতঃপর বাইরে থেকে এই গতিধারা চালনা করবেন কি? মন থেকে অতিমন-এর অবস্থায় মানুষকে নিজের উদ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। 'অতিমানস' কি তাহলে কেবল ব্যক্তিমনের সন্ধান ও প্রয়াসের দ্বারা লভ্য? এই প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়—নিজের তপস্যা এবং সচ্চিদানন্দের অনুগ্রহ—দুইটি চাই। আগেই বলা হয়েছে,—তবু পুনর্বার বলা যেতে পারে, শ্রীঅরবিন্দ ম্যাটার থেকে সংবোধ বা শুদ্ধ অস্তিত্ব অবধি উধ্বর্ক্রমে এই সিঁড়িগুলি দেখিয়েছেন:

৬৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৬২২ দ্রষ্টব্য।

সৎ

চিৎ

আনন্দ

↑ অতিমানস

মন

সাইকি বা সূক্ষ্ম শরীর বা চৈত্যপুরুষ

প্রাণ

বস্তু

বৈদিক ঋষিরা সারা দুনিয়ার মানুষের অধিগম্য অতিমানসভূমি পাননি। ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো সাধক বিজ্ঞানভূমিতে ওঠবার চেষ্টা করলেও ব্যাপক অতিমানসের অবতরণ তাঁদের দ্বারা সাধিত হয়নি। উপনিষদে বলা হয়েছে—পার্থিব শরীরে সূর্যতোরণে যাওয়া যায় না। 'সূর্য' সেখানে 'অতিমানস'-এর প্রতীক। শ্রীঅংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শ্রীঅরবিন্দ-সম্পর্কিত ছোটো বইটির নাম দিয়েছেন—'সূর্যপথিক শ্রীঅরবিন্দ'। মানুষের পক্ষে গতানুগতিক জড়তায়, বা জৈব প্রবৃত্তিমাত্র অবলম্বন করে বেঁচে থাকা নিরর্থক—এই ধরনের বোধকে শুধু বিশেষ এক ধরনের সমাজবোধ নয়—একে আরো ব্যাপক ও বৃহত্তর অবস্থানভূমির প্রতি উন্মুখতা ও প্রগতি-পিপাসা বলতে ইচ্ছে হয়। সে মোটেই দেব-দৈত্যের ব্যাপার নয়। সম্ভবত সব দেশে সকল মানুষই এই বাসনার দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য। আমাদের দেশে গীতা যখন প্রচারিত হয়, সেও তো সত্যিই এই মানব-জীবনের আধ্যাত্মিক বাসনার প্রথম সূচনার কাল নয়। এদেশে তার আগেই বেদ ছিল, সাংখ্য ছিল, উপনিষদ ছিল। বেদের কর্মবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ, উপনিষদের ব্রহ্মবাদ—সব মিলিয়ে গীতাকার এক সমন্বয়ের প্রেরণা ভাষিত করেন। যাকে বলা হয় সনাতন ধর্ম, গীতাই তার আদিগ্রন্থ। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের স্তবস্তুতি বা বন্দনার মন্ত্র। এঁরা সকলে আলাদা দেবতা বলে গৃহীত হলেও এঁদের মূল ঐক্য ও নিত্যতা সম্বন্ধে ধ্যান পাওয়া যায় ঋগ্বেদেই—'যো দেবানাং নামধা এক এব' (ঋক্ ১০।৮২।৩)—এই ঐক্যের ধারণা ঋগ্বেদের ঋষিদেরই ধ্যান!

কিন্তু ধ্যানের চেয়ে অনুষ্ঠানের দিকে ঝোঁকই ব্যাপক হয়ে ওঠে। উত্তরকালে বৈদিকধর্মে যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়া-কর্মের প্রাধান্য দেখা দেয়। ঋক্, যজুঃ, সাম—বৈদিক সাহিত্যের এই ত্রয়ীর ব্রাহ্মণ-অংশে যাগ-যজ্ঞের বিশদ বিবরণ পাওয়া

যায়। জৈমিনি সূত্র বা পূর্বমীমাংসা দর্শন হোলো নানা ব্রাহ্মণগ্রন্থে বর্ণিত বিধি-নিষেধ বিরোধ দুর ক'রে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা। এসব কথা অনেকে অনেকবার বলেছেন এবং লিখেছেন। এই ধারাবিবরণীর কচ্‌কচি বন্ধ ক'রে শ্রীঅরবিন্দের একটি কবিতা দেখা যাক্। তাতে অনেক বেশি কাজ হবে। 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের তিন পর্বের প্রথমটির শেষ অর্থাৎ চতুর্থ সর্গের নাম 'The Vision and the Moon'। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় এই সর্গটির বাংলা অনুবাদ করেছেন এবং তাঁর সেই পুস্তিকায় ভূমিকায় একথাও আছে যে, শ্রীঅরবিন্দ নিজে তা পড়ে খুশি হয়েছিলেন, আবার একথাও আছে যে, স্বামী বিবেকানন্দের মতে কঠোপনিষদের "ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ" ইত্যাদি অংশে যেমন, শ্রীঅরবিন্দের মতে আইরিশ কবি এ. ই.-র কৃষ্ণস্তোত্রেও সেই রকম অপরূপ কাব্যাবেগ ধ্বনিত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'র পূর্বোক্ত অংশের কয়েক ছত্র দিলীপকুমারের অনুবাদেই দেখা যাক্—

সুদূর রহস্যময় আলোক-সন্ধানী যাযাবর,
বিশাল ব্যাপ্তির বুকে ভাগবত স্ফুলিঙ্গ স্ফুরৎ।
আত্মার বিরুদ্ধে তার চক্রান্ত-সংহত চরাচর,
ভূমামুখী দৃষ্টি তার আসুরিক প্রভাবে ব্যাহত।
নিষ্করুণ শূন্য তার চারিধারে বুভুক্ষু বিরাজে,
তমিস্রা সুচিরন্তনী চায় করকবলিতে তারে,
দুর্জ্ঞেয় শক্তিরা করে তার প্রণোদিত, প্রবঞ্চিত,
অতিকায় দুরারাধ্য দেবগণ তার প্রতিরোধী।

যেমন দেবতারা, তেমনি দৈত্যদলও যাযাবর আলোক-সন্ধানীকে কেবলি বাধা দেয়। তবু সে এগিয়েই যায়। দেখা দেয় স্বতোবিরোধ, দেখা দেয় নাস্তিবাদ— তবু সে থামেনা—

চাই দুঃখ ক্ষণ আনন্দের তরে
চাই মৃত্যু মহত্তর জীবনের আবিষ্কার তরে।
চারিদিকে দৃষ্টি তার—প্রতি ডাকে চায় দিতে সাড়া,
নাই ধ্রুবলোক তার গতিপথে দেখাতে সরণি।
লুকোচুরি জীবনের লীলাছন্দ তার—আপনারে
করি অন্বেষণ ধায় দূরে আপনার সত্তা হতে।

আত্মারে দেখিয়া মনে করে—দেখেছে সে আর কারে।
নিরন্তর করে সৃষ্টি—কিন্তু নাই স্থির ভিত্তি তার।[৬৮]

তাঁর কারাবাসের মধ্যেই সেই সুখ-দুঃখের পরপারে অবস্থানের যোগ চলছিল।

৩০

১৯১২-তে নয়াদিল্লীর ওরিয়েণ্টাল বুক্‌স্ রিপ্রিন্টিং কর্পোরেশন থেকে প্রকাশিত 'Patanjalis Yoga Sutras' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ভূমিকায় পাদটীকায় ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পতঞ্জলির যোগসূত্র সম্পর্কিত আলোচনার উল্লেখ আছে। পতঞ্জলি পাণিনি-ব্যাকরণের মহাভাষ্য রেখে গেছেন, আয়ুর্বেদের গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং যোগদর্শনেও তাঁর অধিকারের কথা সুবিদিত। পূর্বোক্ত বইটির ভূমিকায় রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু লেখেন, পতঞ্জলির দর্শন মূলত দ্বৈতবাদী—জীব, পুরুষ বা পৃথক পৃথক মানবসত্তা একদিকে—ঈশ্বর অন্যদিকে—এঁরা নিত্যই বিদ্যমান। আবার প্রকৃতিও অনিত্যা নন। মন হোলো জড়েরই শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি; মনের অন্য নাম 'চিত্ত' যাতে মনঃ, অহঙ্কার, বুদ্ধি তিনই নিহিত। সাংখ্যদর্শনের সংকেত বুঝিয়ে ইংরেজিতে বলা হয় 'মনঃ' হোলো *thought-vehicle*; 'অহংকার' হোলো *I-vehicle* এবং বুদ্ধি হোলো *pure reason vehicle*। যোগের লক্ষ্য হোলো মানুষকে জড়ের সূক্ষ্মতম রূপ 'চিত্ত' থেকে মুক্ত করে দেওয়া। এইসব বাহনের বন্ধন থেকে মুক্ত মানুষ আপন স্বরূপে অবস্থান করেন। সেই স্ব-স্বরূপ জড়োৎপন্ন বা জড়জাত নয়। তা সুখ-দুঃখের অতীত।[৬৯]

চিত্তের ভাবাবেগ ও যুক্তিবিচারের ছট্‌ফটানি অভ্যাসে অভ্যাসে শান্ত করতে হবে। মনকে এক লক্ষ্যে নিবদ্ধ রাখা চাই। পূর্বোক্ত ভূমিকার মধ্যেই

৬৮। সাবিত্রী (প্রথম ভাগ, ৩য় সর্গ, ৪র্থ পর্ব; প্রকাশক: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী (জুন, ১৯৪৯) পৃষ্ঠা ২৩ দ্রষ্টব্য।

৬৯। "The philosophy of Patanjali is essentially Dualistic. The Jivas or purusas or human egos are separate individual entities and exist from eternity; so is also Prakriti and so also Isvara or God. It thus believes in three Eternal co-existent principles, the God, the Man and the Matter."

বিবেক প্রয়োগের দ্বারা বৈরাগ্য অর্জনের কথা বলা হয়েছে। স্বস্বরূপের সঙ্গে অস্বরূপ মিশে আছে আমাদের সাধারণ বোধে—মানে self-এর সঙ্গে non-self। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জড় ও চিত্তের সমাবেশ ভেঙ্গে স্বরূপে পৌঁছোতে হবে; অবিদ্যাই ঐ সমাবেশের নিমিত্ত। অবিদ্যার ইংরেজি অনুবাদ হোলো wrong notion—শব্দান্তরে Nescience। অবিদ্যা ঘুচলেই বিবেকখ্যাতির গুণে right notion দেখা দেবে।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার হোলো বহিরঙ্গ যোগের ধারণা, —ধ্যান, সমাধি হোলো অন্তরঙ্গ। এক কথায় এই তিনের নাম সংযম। সংযমের ফলে সমাধি—এবং সমাধির অবস্থায় প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ইহজীবনে কৃত কর্মের বৃত্ত বা প্রবাহ রোধ করা সম্ভব।

'কারাকাহিনী' থেকে যোগের প্রসঙ্গ ধরেই অন্য আলোচনায় সরে আসা গেছে। পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের সান্ধ্য বৈঠকে যাঁরা যোগ দিতেন তাঁদের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের ও শ্রীমায়ের যে আলাপ-আলোচনা হোতো, এ. বি. পুরাণী সেসব ইংরেজিতে লিখে 'Evening Talks with Sri Aurobindo' দু'খণ্ডে প্রকাশ করেন এবং পরে তা বাংলায় অনুবাদ করেন ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য। ১৯২৩ থেকে ১৯২৬-এর মধ্যে স্থায়ী ভাবে যে চোদ্দজন বৈঠকে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের নাম বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, বিজয়কুমার নাগ, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (মণি), কে, অমৃত, বি, পি, বর্মা (সত্যেন), তিরুপতি, ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত,—এ. বি, পুরানী নিজে,—পি. বি. সান্তিলিয়ার (পবিত্র), চম্পকলাল, পুনমচাঁদ ও কানাই। ঐ সময়ে সাময়িক ভাবে যোগদান করেছেন যাঁরা, তাঁদের তালিকায় আটজনের মধ্যে রজনীকান্ত পালিত, অনিলবরণ রায়,—এস. ডোরাইস্বামী আইয়ার, পুরুষোত্তম প্যাটেল, নরেন দাশগুপ্ত, শ্রীশ গোস্বামী প্রভৃতির নাম আছে। ১৯৩৮ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে স্থায়ী ছিলেন নীরদবরণ, চম্পকলাল, সত্যেন্দ্র ঠাকোর, মূলশঙ্কর,—আবার এ. বি. পুরানি স্বয়ং—ও বেচারলাল। অস্থায়ী তিনজন হলেন ডাক্তার মণিলাল পারিখ, ডাক্তার শ্রীনিবাস রাও ও ডাক্তার মাথুর।

১৯১০ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে রাজনৈতিক কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি যোগ-সাধনায় ও আশ্রম গঠনে ব্রতী হওয়ায় যাঁরা তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন, পুরানি নিজে তাঁর এই সিদ্ধান্ত বলেন—তাদের মধ্যেও সে ভুল ভাঙতে শুরু হয় ১৯২৭-এ যখন শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন থেকে,—এবং

এই সূত্রে পুরানির কথা ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যের অনুবাদে দেখা দরকার,—'Sri Aurobindo and His Ashram' বইটিও দেখা উচিত। এই শেষোক্ত বইটি 'অরবিন্দেরই রচনা—তৃতীয় পুরুষের জবানিতে।' পুরানির উক্তিতে এবং ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যের বঙ্গানুবাদে শ্রীঅরবিন্দেরই নিজের কথা পাই—"তাঁর যোগের লক্ষ্যই নয় কেবল ভগবৎ উপলব্ধি ও পূর্ণ আধ্যাত্মিক চেতনায় ডুবে থাকা, কিন্তু সেই সঙ্গে আরো বিশেষ করে চাই যে সমগ্র জীবন ও জগৎক্রিয়া সেই চেতনার অন্তর্ভুক্ত হবে, এবং তারই উপর ভিত্তি করে জীবনের একটা আধ্যাত্মিক অর্থ মিলবে। নিভৃতবাস থেকে শ্রীঅরবিন্দ নিত্যই লক্ষ্য রেখে গেছেন জগতের ও ভারতবর্ষের তাবৎ সকল ঘটনার উপর এবং প্রয়োজন দেখলেই তার উপর কিছু ক্রিয়া প্রয়োগ করেছেন, যদিও তা নীরব আধ্যাত্মিক শক্তি সহকারে; যোগের পথে যারা এগিয়েছে তাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা এই যে, জড় জগতের উপর মন প্রাণ ও সাধারণ শক্তির ক্রিয়া ছাড়াও আরো অনেক রকমের শক্তি আছে যা অন্তরাল থেকে এবং উর্ধ্ব থেকে তার উপরে ক্রিয়া করতে পারে।"[৭০] এর পরে কথা এগিয়েছে শ্রীঅরবিন্দের অবতারত্ব সম্বন্ধে ও অন্যান্য প্রসঙ্গে। তারপর আসল সান্ধ্য বৈঠকের প্রসঙ্গগুলিতে এগিয়ে গেলে পাওয়া যায় নানা ভক্তের নানা প্রশ্ন, নানান্ কথা এবং শ্রীঅরবিন্দের বিচিত্র উত্তর। তাতে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রসঙ্গও আছে। কিন্তু 'কারাকাহিনী'তে যে যোগের সূচনা দেখা গিয়েছিল এবং পরে নানা সূত্রে যে অবস্থার কথা উঠেছে, সেটি মনে রেখে দেখা যাক ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ইংরেজি রচনা শ্রীঅরবিন্দের 'Cosmic Consciousness' নামে একটি সনেট। বাংলায় তার চরণান্তিক মিল রক্ষা করা গেল না, কিন্তু তার অনুবাদে এই স্বাধীনতাটুকু মাত্র বর্তমান লেখকের পক্ষে অনিবার্য হলেও সেটি বাংলাতেই পরিবেশিত হোলো, কারণ, তা থেকে যোগীর চেতনার কতকটা আঁচ পাওয়া যাবে—

> ব্যাপ্ততর সত্তা দিয়ে বিস্তীর্ণ জগৎ ঢেকেছি তো
> সমস্ত বিস্তার, কাল—সে আমার আত্মার দর্শন
> আমিই দেবতা দৈত্য ভূত প্রেত সমস্ত, সমস্ত।
> আমিই বায়ুর বেগ, জ্বলন্ত নক্ষত্র।

। "শ্রীঅরবিন্দের সান্ধ্য বৈঠক" ১ম খণ্ড, 'অবতরণিকা' দ্রষ্টব্য।

সকল নিসর্গ যা. সে আমারই তো আদরের ধন,
আমিই সংগ্রাম তার, আমি তার চিরবিরতিও।
জগতের স্ত্রী-হিল্লোল আমাতেই নিত্যশিহরণ,
লক্ষ লক্ষ বুকে যতো দুঃখ সব সহি একা একা।
সকলের সাযুজ্যের একাত্মতা শিখেছি হৃদয়ে,
কিন্তু যা হয়েছি, হই,—তাতে নই অণুমাত্র বাঁধা।
বিশ্বের আহ্বান নিয়ে এ আমার আপন অন্তরে
উঠে যাই, উঠে যাই অবিনাশী নিজ উর্ধ্বধামে।
অমেয় ডানায় উড়ে পার হই কাল আর আয়ু
তবু এক হয়ে আছি জাত ও অ-জাত সর্বসনে।[৭১]

এই সূত্রে যোগের পথ যে কতো কঠিন এবং প্রত্যয় কতো সুদৃঢ় হলে তবে সাধকের পক্ষে ফলাফল-ভাবনা ব্যতিরেকে এপথে এগুনো যায়, সেটির নমুনা দেখে নেবার জন্যে কবি নিশিকান্তের কথা কিঞ্চিৎ স্মরণীয়।

চেতনার এই ব্যাপ্তি প্রসঙ্গে এখানে কবিতার কথা উঠলো বলেই অরবিন্দ-আশ্রমের কবি নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কথা মনে আসে। তিনি জন্ম গ্রহণ করেন ২৪ এ মার্চ, ১৯০৯ তারিখে। বাল্যকালেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের স্নেহ লাভ করেন তিনি এবং বেশ কিছু কবিতা লেখেন। 'টুকরি' 'অলকানন্দা' প্রভৃতি কবিতার বই নিশিকান্তের কবিখ্যাতির নিদর্শন। ১৯৩৪-এর ফেব্রুয়ারিতে তিনি প্রথম পণ্ডিচেরিতে যান। সেখানে রান্নার কাজ করেছেন, ছবি এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা দেখে প্রথমে বলেছিলেন—"আমার পক্ষে এসব বড় বেশি যৌগিক"। পরে তাঁর মত বদলায়। নিশিকান্তের প্রথম কবিতার বই 'অলকানন্দা' বেরোয় ১৯৪০-এর জানুয়ারিতে। তখন রবীন্দ্রনাথ সেগুলির প্রশংসা করেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কবিতার খাতায় নিজের হাতে ইংরেজিতে অনেক সব সংক্ষিপ্ত প্রশংসাবাণী রেখে গেছেন। তাঁর মনে অনেক রকম স্বপ্নাভিজ্ঞতা ঘটতো। তাঁর একমাত্র ইংরেজি কবিতার বই 'Dream Cadences' বেরোয় ১৯৪৬-এর এপ্রিলে। শ্রীঅরবিন্দ, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কে. ডি. শেঠনা (অমলকিরণ), আর্যব (Arjava) প্রভৃতির কবিতা

৭১। Collected Poems, পৃষ্ঠা ১৩৪ দ্রষ্টব্য।

তিনি বাংলায় অনুবাদও করেছেন। ১৯৭৩-এর ২০এ মে পণ্ডিচেরি-আশ্রমেই রাত দশটায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সেই নিশিকান্তের কষ্টের অন্ত ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই দিলীপকুমার রায়ের মধ্যস্থতায় তাঁকে তা জানিয়েছিলেন। সাধক নিশিকান্তের অদৃষ্টে যে এই নিদারুণ কষ্টভোগ লেখা ছিল, সেই ভবিষ্যৎ-বাণী কবির আশ্রমে প্রথম পদক্ষেপেই গুরু করে রেখেছিলেন। তিনি দিলীপকুমার রায়কে লেখেন, "আমাদের যোগের পথ নিশিকান্তের নয়; তাকে অন্যত্র যেতে বল।" কিন্তু নিশিকান্ত ছিলেন নাছোড়বান্দা। তখন গুরু বললেন, "তাহলে তাকে বলো যে তাকে এখানে ভয়ানক কষ্ট পেতে হবে।" নিশিকান্ত বিধাতার বাণী মাথা পেতে নিলেন; অশেষ অমানুষিক কষ্ট পেলেন কিন্তু তপস্যা করে গেলেন হাসি-মুখে, সকলকে হাসিয়ে কাঁদিয়ে। কোনদিন অভিযোগ শুনিনি, গুরুর প্রতি বিশ্বাস টলেনি। কেউ সমবেদনা জানালে তিনি বলতেন, গুরু তো আমায় আগেই সাবধান করে দিয়েছেন।" নীরদবরণ আরো লেখেন—"কেবল সাবধান করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি। শিষ্যের প্রথম দিন থেকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত সাহায্য করেছেন, রক্ষা করেছেন, মৃত্যুর দুয়ার থেকে তাকে ফিরিয়ে এনেছেন।"[৭২] নিশিকান্ত কবি ছিলেন। তাঁর ছবি আঁকা, কবিতা লেখার স্বভাব তাঁর সাধনার সহায়ক হবে কি না হবে, সে বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ যেকথা জানান, অংশত তার বঙ্গানুবাদ এই—"এটা স্পষ্ট যে কবিতা কখনো সাধনার প্রতিকল্প (substitute) হিসাবে স্থান নিতে পারে না! বড়জোর সাধনার সহগামী হতে পারে।"[৭৩] সাধনা মানে—প্রকৃতির শোধন, সত্তার ঊর্ধ্বগতি, সর্বভূতে ভগবদ্দর্শন।

'সৈনিক-কবি নিশিকান্ত' প্রবন্ধে অবনী সিংহ লেখেন—নিশিকান্তের 'বৈজয়ন্তী' কাব্যগ্রন্থের 'সৈনিক' কবিতাটির কথা। সেই কবিতা থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃতি দিয়ে, তাঁর 'দিগন্ত' কাব্যগ্রন্থের 'নির্ভীক' কবিতারও তিনি উল্লেখ করেন এবং ঐ বইয়ের 'নিষ্ঠুর প্রেম' থেকেও কয়েকছত্র তুলে দেখান। সেই আলোচনার মধ্যে এই মন্তব্যটি দেখা যায়—"শ্রীঅরবিন্দের যোগের দুটি পথ। একটি হল যাকে "শ্রীঅরবিন্দ বলেন Sunlit path অর্থাৎ জ্যোতির্ময়

পথ। এ পথের সাধক নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় প্রথম থেকে শেষ অবধি মহাশক্তি মায়ের ছত্রচ্ছায়ায় সোজা পথে নিরাপদে চরম লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হন। দ্বিতীয় হল আলো-আঁধারী উত্থান-পতনময় বিপজ্জনক পার্বত্য পথ। সৈনিক-কবি নিশিকান্তের অন্তরাত্মা এই দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিয়েছে।"[৭৪]

মন, প্রাণ, চৈত্যসত্তা, আত্মা এই শব্দগুলি অরবিন্দের আলাপ-আলোচনার মধ্যে প্রায়ই পাওয়া যায়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ মার্চ 'সান্ধ্য বৈঠকে' এ বিষয়ে তাঁর নিজের উক্তির বঙ্গানুবাদ দেখা যেতে পারে—"প্রথম কথা, চৈত্যসত্তা জাগলে তুমি আপন আত্মাকে জানবে, জানবে যে কোন্‌টি তোমার প্রকৃত সত্তা। তোমার মনকে বা প্রাণকে আর আমি বলে ভুল করবে না। দ্বিতীয় কথা, চৈত্যসত্তা জাগলে তখন সাধকের মধ্যে আপনিই আসবে ভগবানের প্রতি বা গুরুর প্রতি প্রকৃত ভক্তি। মনের বা প্রাণের ভক্তির চেয়ে এ একেবারে আলাদা।" তারপর—"মনে কতটা হয়? বিশেষ একজন কারো বুদ্ধি বা জ্ঞান সম্বন্ধে খানিক মুগ্ধ বিস্ময় তোমার থাকতে পারে, বিরাট বুদ্ধি দেখলে মন তার তারিফ করতে পারে। কিন্তু তা ঐ পর্যন্তই থাকে, বেশি দূর যায় না।" এবং—"প্রাণের যে ভক্তি সে থাকে কেবল চাওয়ার তালে।"—' আবার মনও অদীপ্ত থাকলে যদিও সে সত্যের কাছে সমর্পিত হয় তবু তারও থাকে নিজের দাবি। সত্যকে সে বলে: 'আমার বিচার আর আমার মতামতই সত্য হোক।' সে চায় যে সত্য যেন তারই মনের আকারে প্রকাশ পায়। প্রাণসত্তা চায় যে সত্য যেন তারই শক্তির ক্রিয়াতে সাড়া দেয়। উচ্চতর শক্তিকে সে টেনে আনতে চায়, গুরুর প্রাণ-সত্তাকে টেনে আনতে চায়। প্রাণ মন দুই-এরই সমর্পণের মধ্যে মানসিক শর্ত থাকে। কিন্তু চৈত্য-ভক্তি অমন নয়। আত্মার পিছনেই দেবতা আছেন বলে সেখানে প্রকৃত ভক্তি জন্মায়। চৈত্যসত্তার ভক্তি তাই অহৈতুকী ভক্তি: তার কোনো মতলব নেই, কোনো দাবি নেই, তার সমর্পণে কোনো শর্ত নেই। চৈত্যসত্তাই কেবল জানে কেমন করে সত্যকে সঠিকভাবে গ্রহণ করতে হয় এবং মেনে চলতে হয়। ভগবানের কাছে বা গুরুর কাছে সে পূর্ণভাবে নিজেকে দিয়ে দিতে পারে; আর যথার্থভাবে দিতে পারে বলে যথার্থভাবে পেতেও পারে।" এবং—"চৈত্যসত্তা যখন বাইরে বেরিয়ে আসে তখন মন ও প্রাণের যত নির্বোধের মতো কাজগুলো দেখে সে বিমর্ষ হয়।"—মনের

৭৪। 'শৃণ্বন্তু' ভাদ্র, ১৩৮০, পৃঃ ১৭৮-৮২ দ্রষ্টব্য।

অসন্তোষ বা প্রাণের ক্ষোভ বা দৈহিক উৎসাহমান্দ্য নয় চৈত্য বিমর্ষতা। আত্মা আর চৈত্য অভিন্ন নয়, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় soul 'চৈত্য' হোলো তাই-ই। 'আত্মা' মানে spirit। উপনিষদে যাকে বলা হয় 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ'— যিনি হৃদ্দেশে বিদ্যমান, তিনিই চৈত্যসত্তা। আবার একথাও বলা হয়েছে যে, 'চৈত্যসত্তা' আর 'জীব' অভিন্ন নয়। শ্রীঅরবিন্দের কথায়—"জীব বলতে ওর চেয়েও বড়ো কিছু। চৈত্য রয়েছে হৃদয়ের অন্তরালে, আর জীব রয়েছেন উপরে, কেন্দ্রসত্তার সঙ্গে সংযুক্ত। এই জীব চেতনার সকল স্তরে পুরুষ হয়, প্রকৃতি হয়, প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব হয়। চৈত্যসত্তা হোলো ব্যক্তি-আত্মা; মন প্রাণ দেহ এই নিম্নত্রয়ীর মধ্যে ইনিই ভগবানের বিশুদ্ধ প্রতিফলন। উচ্চে চারটি স্তর আছে—সৎ, চিৎ, আনন্দ ও বিজ্ঞান; এগুলি হোলো জ্ঞানলোকে। নিম্নে তিনটি স্তর আছে—মন, প্রাণ, দেহ,—এখানে জ্ঞান ও অজ্ঞান মিশ্রিত। চৈত্যসত্তা থাকে এই তিনের পিছনে; উচ্চতর সত্যের দিকে এটি থাকে উন্মীলিত হয়ে; তাই ভগবৎ-অভিব্যক্তির পক্ষে এটি অপরিহার্যরূপে দরকার।

সকল ধর্মানুসন্ধানের প্রবাহেই এই উচ্চতর সত্যের দিকে আগ্রহ সুপরিচিত। অরবিন্দের এই জ্ঞানানুসন্ধান-প্রয়াস কাব্যরসে মণ্ডিত বৌদ্ধ-ভাবনার থেরী গাথা, বৈষ্ণব-ভাবনা ইত্যাদির প্রসঙ্গ মনে আনে। মূল প্রসঙ্গ থেকে ঈষৎ দূরবর্তী হলেও এখানে সেই থেরীকাব্যের কয়েকটি প্রসঙ্গ দেখা যেতে পারে। শ্রীঅরবিন্দের ধ্যান-ধারণা আমাদের ঐতিহ্যেই আশ্রিত এবং সেই সঙ্গে তাঁর নিজের দিব্য আস্পৃহার দিকটি স্বতন্ত্রভাবে বিবেচ্য।

৩১

'প্রবাসী', 'ভারত মহিলা' প্রভৃতি পত্রিকায় বিজয়চন্দ্র (মজুমদার ১৮৬১-১৯৪২) থেরীগাথার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর 'থেরীগাথা', 'থেরগাথা' ও 'গীতগোবিন্দ' অনুবাদের বিষয়ে অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক খণ্ডে লিখেছেন—"অনুবাদ যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দ রচনা"। তাঁর ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব সম্পর্কিত আগ্রহের পরিচয় আছে অন্যান্য কিছু কিছু রচনায়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর কবিতার বই 'ফুলশর' ও 'যজ্ঞভস্ম' এবং আরো বছর-দশেক পরে প্রকাশিত 'হেঁয়ালী' (১৯১৫) তাঁকে কবি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর

যখন মৃত্যু হয় তখন তিনি বিস্মৃতপ্রায় লেখক। তখন থেকে ধরলে, ইতিমধ্যে আরো পঁয়ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হোলো। বিজয়চন্দ্র মজুমদার যে এক সময়ে প্রাচীন বৌদ্ধ ও অন্যান্য কাহিনী অবলম্বনে কিছু গল্পরচনাও লেখেন, সেকথা এখনকার পাঠকরা জানেন কি? সুকুমার সেন মশাই তাঁর 'কথা ও বীথি' (১৮৯৩) ও 'কথানিবন্ধ' (১৯০৫) বই-দুখানির উল্লেখ করেছেন। 'সাহিত্য'-আকাডেমি থেকে প্রকাশিত "বিব্লিওগ্রাফি অফ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার" [১৯০১-৫৩] কোষগ্রন্থে তাঁর 'বসন্তলতিকা' (প্রকাশকালের উল্লেখ নেই), 'কবিতা' (১৮৮৯), 'যুগপূজা' (১৮৯২), 'ফুলশর' (১৯০৪,) 'যজ্ঞভস্ম' (১৯০৪), 'পঞ্চকমালা' (১৯১০), 'হেঁয়ালী' (১৯১৫),—এই ক'খানি কাব্যগ্রন্থের খবর পাওয়া যায়,—তাঁর 'কথানিবন্ধ' (১৯০৫) সম্বন্ধে মন্তব্য পাওয়া যায়—"Tales in prose and poetry"; তাছাড়া, 'তপস্যার ফল'—(১৯১২) নামে তাঁর এক 'short novelette'-এর খবর আছে ঐ বইয়ে,—১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কালিদাস' নামে সাহিত্য-সম্পর্কিত এক পুস্তিকার উল্লেখ আছে; 'প্রাচীন সভ্যতা' (১৯২৫) ও 'জীবনবাণী' (১৯৩৩) নামে দুটি প্রবন্ধ-পুস্তকেরও খবর দেওয়া হয়েছে,—এবং তাঁর আরো কয়েকখানি ইংরেজি বইয়ের—এবং প্রকাশকালের উল্লেখহীন 'ছিটে ফোঁটা' নামে 'Miscellaneous prose and poetry'-র কথা আছে।

বিজয়চন্দ্রের 'থেরীগাথা'র ভূমিকায় বলা হয়েছিল—"১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে শ্রীমতী রীস্ ডেভিড্স্-জায়া থেরীগাথার এক অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বহুস্থানে তাঁহার অনুবাদ ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হইয়াছে। সুবিজ্ঞ পাঠকেরা অনুবাদ মিলাইয়া পড়িয়া আমার দোষগুণ বিচার করিবেন আশা রাখি।"

বিজয়চন্দ্রের ঝোঁক ছিল বৌদ্ধ সাহিত্যের দিকে। তিনি কাব্যগুণের দিক থেকে এই মূল রচনাগুলির ততোটা ঐশ্বর্য অনুভব করেননি যতোটা আকৃষ্ট বোধ করেন এগুলির ধর্মপ্রবণতায়। তাই ঐ ভূমিকায় নিজেই আরো লেখেন—"থেরীগাথার কবিতাগুলি অনেক স্থলে সাধারণ পাঠকের নিকট কর্কশ মনে হইতে পারে। যে ধর্মপ্রবণতায় গাথাগুলি লিখিত, সেটুকু অনুভব করিয়া না লইলে এ কবিতাগুলির সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না।"

সংস্কৃত 'স্থবিরা' থেকে পালিতে 'থেরী' শব্দটি দেখা দেয়। জ্ঞানবৃদ্ধা রমণীরা কেউ যৌবনে, কেউ বা আরো পরে গৌতমবুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ

করেন। তাঁরাই থেরী। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের দ্বিতীয় পিটকের নাম 'সুত্তপিটক'; সুত্তপিটকের অন্তর্ভুক্ত এক 'নিকায়'-গ্রন্থে অর্থাৎ তার বিশেষ এক অংশে এবং যে অপদান-গ্রন্থে শ্রমণ-শ্রমণীদের জীবনকথা আছে, তাতেও থেরীদের ভাব-ভাবনা পাওয়া যায়।

মহাপ্রজাপতি গৌতমীও ছিলেন থেরী। শিশু গৌতমকে এই শুদ্ধোদন-মহিষীই পালন করেছিলেন। শোনা যায়, তাঁরই অনুরোধে বুদ্ধদেব বৌদ্ধ-ভিক্ষুণীদের জন্যে পৃথক এক আশ্রম স্থাপিত করেন। থেরীগাথার বিবরণ দিতে গিয়ে বিজয়চন্দ্র লেখেন—"থেরীগাথা গ্রন্থে ৭৩ জন পূতশীলা নারীর পদ্য রচনা সুরক্ষিত হইয়াছে। প্রায় সার্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে ভারত-রমণীগণ কর্তৃক যে সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তাহার সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক মূল্য কত, সে কথা সুধী পাঠকদিগকে বুঝাইতে হইবে না। ভগবান বুদ্ধদেব যখন মুক্তির নবসংবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তখন সহস্র-সহস্র নরনারী মুক্তির কামনায় তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে রমণীগণ সাক্ষাৎভাবে ভগবানের উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ৭৩ জন রমণীর রচনা এই থেরীগাথায় পাওয়া যায়।" শ্রীঅরবিন্দের 'দি মাদার' সম্পর্কিত ভাবনার কথা মনে পড়ে। পুরুষোত্তমের সচ্চিদানন্দময়ী ভাগবতী শক্তিই তো মা! একথা অরবিন্দ-ব্যাখ্যাতাদের বাংলা আলোচনাতেই পাওয়া যায় এবং উপস্থিত আলোচনার প্রথম দিকেই তা দেখানো হয়েছে। তবে পণ্ডিচেরির শ্রীমা অবশ্য থেরী সাধিকাদের সমতুল্যা নন।

যে মাতৃকাপূজা ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত, বৌদ্ধধর্মেও এক-সময়ে সেই মাতৃকাপূজার প্রভাব সঞ্চারিত হয়। বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মে যাগ-যজ্ঞ, বলি, মূর্তিপূজা ইত্যাদির কোনো জায়গাই ছিলনা। তিনি শীল বা আচরণের ওপর জোর দিয়ে আমাদের ব্যবহারিক জগতের যাবতীয় কর্মের মধ্যে শীল পালনের যেটুকু অঙ্গীভূত, সেইটুকুরই সমর্থন ক'রে গেছেন। সাধারণ ভাষায় বৌদ্ধধর্মকে মূলত নীতিপন্থী বলা যায়। বৌদ্ধ সংঘে জাতিভেদ ছিল না; সৎ কর্ম, মৈত্রী, করুণা ইত্যাদির অনুসরণেই সংঘের জীবনযাত্রা নির্বাহিত হোতো। পুরুষের জন্যে সংঘ ছিল। তারপর গৌতমবুদ্ধ তাঁর ধাত্রীজননী মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অনুরোধে থেরী বা জ্ঞানস্থবিরা রমণীদেরও প্রবেশাধিকার দেন। মৃগয়াজীবীর দুহিতা অর্থাৎ ব্যাধকন্যা, কর্মকার-দুহিতা অর্থাৎ কামারের কন্যা প্রভৃতি সমাজের অনেক

সাধারণ স্তরের মেয়েরা সেইসব সংঘে যোগ দেন ব'লে শোনা যায়। সংঘে এইভাবে নারীর প্রবেশাধিকার স্থাপিত হবার ফলে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রাচার ও যৌন যোগাচার প্রবেশ করে। বৌদ্ধধর্মে ধীরে ধীরে মিশ্রণ ঘটতে থাকে। একদিকে সর্বপ্রকার যাগযজ্ঞাদিবর্জিত অহিংসা করুণা মৈত্রীর অনুশীলন, অন্যদিকে হিন্দুর মূর্তি-পূজার ভাবরীতির অনুপ্রবেশ—এইভাবে খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতকে কণিষ্কের রাজত্বকালে হীনযান ও মহাযান নামে বৌদ্ধধর্মের দুই শাখা দাঁড়িয়ে যায়; হীনযানপন্থী বৌদ্ধেরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থ বুদ্ধবাণী ত্রিপিটকের (পালি ভাষায় রচিত সুত্ত, বিনয় ও অভিধর্ম) অনুসরণ করেন। মহাযানপন্থীরা এই রক্ষণশীলতায় যোগ দেননি। বোধ হয়, বাংলার বৌদ্ধেরাই মহাযানপন্থী হন এবং তৎসূত্রে বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রাচার প্রবেশ করাবার নেতা হ'য়ে ওঠেন। পাল-রাজাদের সময়ে এই ব্যাপারটি ঘটে বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন। বৌদ্ধদের মধ্যে তন্ত্রানুশীলন ব্যাপকভাবে চলেছে খ্রীষ্টাব্দের প্রথম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত। নাগার্জুন, বসুবন্ধু, অসঙ্গ, শান্তিদেব ও আরো অনেকেই তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা করে গেছেন।

'ধম্মপদ' যেমন ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্দনিকায়েরই একটি, থেরীগাথা তেমনি আর একটি। ধম্মপদ খুবই পরিচিত গ্রন্থ। থেরীগাথা হয়তো ততোটা নয়। ধম্মপদে বিশ্বগ্রাহ্য সকল ধর্মমতের অনুকূল গভীর মানবধর্মের কথাই বলা হয়েছে। সংযম, নীতিজ্ঞান, সদনুষ্ঠান ইত্যাদির কে-ই বা পরিপন্থী হবেন? পর পর ষোলোটি অধ্যায়ে ভাগ ক'রে বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাঁর থেরীগাথার অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর অনুবাদের এবং টীকার একটু নমুনা দেখা যাক—

প্রথম অধ্যায়ে পুন্না (পূর্ণা)-র পরিচিত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"ইনি শ্রাবস্তীর এক বণিক-দুহিতা ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তা হইবার পর মহাপজাপতী গোতমীর মুখে ধর্মকথা শুনিয়া জ্ঞান লাভ করেন এবং পরে দীক্ষা লাভ করিয়া থেরী হয়েন।" মূলে ছিল :

> পুন্নে পূরস্সু ধম্মেহি চন্দো পন্নরসেরিব !
> পরিপুন্নায় পঞ্ঞায় তমোকৃখন্ধং পদালয় ॥ ৩

অনুবাদে বিজয়চন্দ্র লেখেন—

> পূর্ণে! পূর্ণ কর প্রাণ পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র সম
> পূর্ণ প্রজ্ঞালোকে দূর কর তুমি অজ্ঞতার তমঃ ॥

টীকাতে দেখা যায়—"হে পুণ্ণে! (যথা) পন্নরসে (পঞ্চদশ অর্থাৎ পঞ্চদশ দিবসে অর্থাৎ পঞ্চদশীতে) বা পূর্ণিমার দিনে চন্দ্র যেমন (পন্নরসে+ইব= পন্নরসেরিব; ইহা হইল পালির সন্ধির একটি বিশেষ ধাঁচা) পূর্ণ হয়, তেমনি ধম্মেহি বা ধর্মে আপনাকে পূর্ণ কর; এবং (চন্দ্রের অন্ধকার দূর করিবার মত) পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা দ্বারা (মূলে করণে তৃতীয়া আছে) তমোকৃথন্ধকে দলন কর। "কৃথন্ধ" শব্দ অনেক শব্দের সহিত সমাসে যুক্ত পাওয়া যায় এবং এক এক স্থানে উহার বিশেষ এক একটা অর্থ আছে; "কৃথন্ধ" অর্থ সাধারণতঃ পিণ্ড বা রাশি। পদালয় বা প্রদালয় "প্র" উপসর্গের সহিত দলন অর্থ ধাতুর লোটের পদ।"

এইভাবে প্রত্যেকটির অনুবাদ ও টীকা দিয়ে গেছেন বিজয়চন্দ্র। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অম্বপালী, রোহিণী, চাঁপা, সুন্দরী,—চতুর্দশ অধ্যায়ের শুভা জীবককম্বনিকা, পঞ্চদশ অধ্যায়ের ইসিদাসীর কাহিনী সাহিত্য-প্রেরণার দিক থেকেও বিশেষ সম্ভাবনাময়। দশম অধ্যায়ের কিসা গোতমী নিজের সন্তানকে শৃগালভক্ষিত হতে দেখেছিলেন। এ কাহিনী অনেকেই জানেন। মৃত সন্তানের দেহ কোলে নিয়ে বুদ্ধের কাছে যান কিসা। বুদ্ধদেব বলেন, যে-বাড়িতে কেউ কখনো মরেনি, সেই বাড়ি থেকে সরষে এনে দিলে তিনি সেই ছেলেকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন! তখন কিসা বুঝেছিলেন যে, মৃত্যুর কোনো প্রতিষেধক নেই। অতএব, বিজয়চন্দ্রের অনুবাদের ভাষায়—

হেরিনু শ্মশানে, খায় পুত্রমাংস গৃধিনীরা এসে;
কুলহীনা, পতিহীনা পাইলাম্ অমৃতত্ব ভাষে।
অমৃত সে অষ্টাঙ্গিক আর্যপন্থা করিয়া ভাবনা
স্বচ্ছধর্মাদর্শে পরে হেরিলাম নির্বাণ আপনা।
হৃদয়ের শেল, ভার, অপগত; করণীয় হইল সাধিত
মুক্তচিত্তা হয়ে গাথা গাহে কিশা গোতমী আজি তো।

বুদ্ধদেবের নিজের জননী মায়াদেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী ও সপত্নী মহাপজাপতী গোতমীর কথা আছে ৫৫ সংখ্যক কাহিনীতে যেটি ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বিজয়চন্দ্র পুরোপুরি এটির মূলের অনুবাদ দেননি। তিনি-অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত ও অনূদিত করেন। শেষ দুটি ছত্রে গোতমীই বলেছেন—

লোকহিত তরে মায়া জন্ম দিল তোমারে গোতম।
হরিয়াছ দুঃখ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু শোকের রোদন।

এই আশ্রয়বোধটুকু বিজয়চন্দ্রের বঙ্গানুবাদেও অকৃত্রিম মনে হয় না কি? সংসারে জীবের যন্ত্রণার পরিসীমা নেই। কিন্তু এ-জীবনে যিনি আমাদের দুঃখ দেন, তিনিই মানুষের বিবেক জাগিয়ে তোলেন। থেরীগাথা তারই স্বীকৃতি। এই গাথাগুলিতে মানুষের জীবন-যন্ত্রণার অকৃত্রিম পরিচিতি ফুটেছে তো বটেই, তাছাড়া বেশ একটি সমর্পণের ভাব আছে। তবে প্রগাঢ় কবিত্বের চিহ্ন কম। সে স্বাদ ধম্মপদেই বেশি পাওয়া যায়।

৩২

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'দি লাইফ ডিভাইন'-এর প্রথম সম্ভাবে 'লাইফ', 'দি অ্যাসেণ্ট অফ লাইফ', 'দি প্রব্‌লেম অফ লাইফ' প্রভৃতি অধ্যায়ে জানিয়েছেন যে, জীবন ও মন সম্বন্ধে উত্তরোত্তর মানুষের দৃষ্টি বাড়ছেই। মৃত্যুই চূড়ান্ত পরিণাম নয়। মন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়জ্ঞানের যন্ত্র বা উপায় নয়। মন-জীবন-দেহ —এই ত্রিবোধের নিয়ন্তা হলেন সুপারমাইণ্ড বা অতিমানস। তাঁর নিজের ভাষায় বলা যায় যে, মূলে কাজ করছে এক Involved Supermind—যে সর্বানুস্যূত অতিমানসই সামনে এগিয়ে দিয়েছে বীক্ষা, বিবেচনা ও সংকল্পের যন্ত্র মনকে। আমরা ভাবি, বুদ্ধি-ই বুঝি-বা চূড়ান্ত শক্তি। কিন্তু আসলে তা নয়। বুদ্ধির পেছনে আছেন সেই অনির্বচনীয় তিনি! এ থেকে আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি যে, গৌতম বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব ইত্যাদি অবতার বা অবতারকল্প ব্যক্তিরাও বিশ্বসৃষ্টির শক্তিকণা-প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত দৃশ্যমান এক একটি তরঙ্গ। মৃত্যু নয়, দিব্যতাই পরমা!—"Death has no reality except as a process of life"। মৃত্যু সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মনোভঙ্গি ও বিশ্বাস বা উপলব্ধির তত্ত্বটি চেতনার এক অখণ্ড প্রবাহবোধ বললে অন্যায় হবে না। গীতার উক্তিই তিনি নিজের মতন করে লিখেছেন। বৈষ্ণব চিন্তার মধ্যে ভক্ত ও ভগবানের বিচ্ছেদহীন লীলাসম্পর্কের প্রসঙ্গ এই কারণেই মনে পড়ে!

৩৩

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদেই সংস্কৃত ভাষায় শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তকে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঈশ্বরকে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি তাঁর অবতারদের বন্দনা জানানো হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ—এঁরা যেন গৌড়দেশ-

রূপ উদয়গিরিতে একসঙ্গে চন্দ্র-সূর্য হয়ে উদিত হন। যিনি অদ্বৈতব্রহ্ম, যিনি যোগশাস্ত্র-কথিত পরমাত্মা বা অন্তর্যামী, যিনি আবার ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান—সবই তিনি—সেই চৈতন্যদেবই!

শচীমাতার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণই জন্ম নিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমের বিষয় এবং শ্রীরাধিকাকে প্রেমের আশ্রয় ধরে নিলে শ্রীচৈতন্য-জন্মের হেতু বুঝতে সুবিধা হয়। রাধিকা কৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেমময়ী। এই রাধিকাভাব শ্রীকৃষ্ণের নিজের উপলব্ধিতে যাতে পৌছোয়, সেই উদ্দেশ্যেই রাধিকার ভাব-কান্তি গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্যশরীর ধারণ করেন। নবদ্বীপে চৈতন্যরূপে তাঁর জন্ম হয়। আবার একথাও বলা হয়েছে যে—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং॥

এই পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যায় দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হলেন ভক্তরূপ; শ্রীনিত্যানন্দ হলেন ভক্তস্বরূপ; শ্রীঅদ্বৈতাচার্য হলেন ভক্তসংজ্ঞক এবং শ্রীগদাধরাদি ভক্তশক্তিক। এই ব্যাখ্যায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 'ভক্ত' শব্দটি বিদ্যমান, সেই সঙ্গে অন্যান্য সংযোজন ঘটেছে। কেউ 'রূপ', কেউ 'স্বরূপ' কেউবা 'অবতার', কেউ 'সংজ্ঞক', কেউ আবার 'শক্তিক'। শ্রীচৈতন্যদেব একটি ব্যক্তিমাত্র নন, তিনি অশেষ ও বিচিত্র ভাবের সংকেত। তিনিই শচীনন্দন হরি, তিনিই উপনিষদ-কথিত ব্রহ্ম। ভগবান ভক্তের ভাবনায় নিমগ্ন, আবার ভক্তও ভগবানের তৃষ্ণায় তৃষিত। রাধিকার চেয়ে বড়ো ভক্ত আর কেউ হয় না। শ্রীচৈতন্য রাধাভাবে ভাবিত। তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তস্বরূপ। স্ব-শক্তিতে আবিষ্ট থেকে বলদেব ভক্তিগুণেই নিতানন্দ হন—তাই তিনি ভক্তস্বরূপ। এইভাবে দেখা যায় পঞ্চতত্ত্ব আর শ্রীকৃষ্ণ আলাদা নন—পাঁচে এক, একে পাঁচ। গদাধর-পণ্ডিত প্রভৃতি তাঁরই শক্তির অভিব্যক্তি। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি,—এই ছয় রূপে করেন বিলাস॥

মন্ত্রগুরু আর শিক্ষাগুরু—এখানে শিক্ষাগুরু মানে ভজন-শ্রবণের গুরু—যিনি গুরু—যিনি তত্ত্বকথা শোনান, পরমের জন্যে মনে রুচি জাগিয়ে দেন। কবিরাজ-গোস্বামীর শিক্ষাগুরুদের মধ্যে ছিলেন—রূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ, জীবগোস্বামী, গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দাস।

ভগবদ্গীতার দশম্ অধ্যায়ে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

অর্থাৎ যাঁরা ভগবানের প্রতি সতত আগ্রহী, ভগবানকে পাবার উপায় তাদের জন্যে তিনি নিজেই উদ্ভাবিত করে দেন।

বুদ্ধিমার্গে থেকেও শ্রীচৈতন্যের লীলা যাঁরা পরম সমাদরে আস্বাদন করতে এগিয়ে যেতে চান, তাঁরা এই পথনির্দেশ পেতে পারেন! এটি যে কতো বড়ো সান্ত্বনা, যথার্থ আগ্রহী মাত্রেই তা অনুভব করেন। কবিরাজ গোস্বামীর কথায়—

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণ তিনি আমাদের অন্তরেই বিদ্যমান। শ্রীচৈতন্যের প্রদর্শিত পথে যে সাধনা, সে-সাধনাও অন্তর্মুখীনতার সাধনা। বাইরের আচারে নয়, ভেতরের রাসেই অসীম আনন্দ! ভক্তেরা সাধকও হন, পারিষদও হতে পারেন। অবতার তিন রকম—অংশ অবতার, গুণাবতার এবং শক্ত্যাবেশ অবতার। সনক, পৃথু, ব্যাস—এঁরা ছিলেন শেষোক্ত শ্রেণীর অবতার। এসব পরিভাষা শাস্ত্রকথার আবশ্যিক প্রসঙ্গ।

বুদ্ধিবিচারে দেখলে এই দ্বৈতভাবই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিশেষত্ব বটে, কিন্তু মোক্ষ না চাইলেও এই পথের সাধকরা পরমের নিত্যস্বাদনেই ব্রতী। মোক্ষবাঞ্ছা-কে 'কৈতব' বলা হয়েছে এই কারণে যে মোক্ষ ঘটে গেলে সাধকের মনে আর সেব্য-সেবক ভাব থাকে না। তাঁরা এই দ্বৈতবোধ ছাড়তে নারাজ। উপনিষদ যাঁকে 'ব্রহ্ম' বলেছেন, তাঁকে কি চর্ম্মচক্ষে দেখা যায়?—জ্ঞানমার্গেও কি তাঁকে পুরোপুরি বোঝা যায়? ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে—তিনি নিষ্কল, অশেষ! অর্থাৎ তাঁকে বুদ্ধিতে বা ইন্দ্রিয়বোধে উপলব্ধি করা যায় না। শ্রীঅরবিন্দের 'Universal Force'-ও এইরকম বুদ্ধির অতীত শক্তি! কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

"কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি,
সেই ব্রহ্ম—গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি।"

এবং—"সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্যগোসাঞী"! তিনি নারায়ণ! —'নার' মানে, সকল জীবের সমাহার এবং 'অয়ন' মানে আশ্রয়। তিনিই

সর্বজীবের আশ্রয়। কলিযুগে তিনিই শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কাজ ছিল যুগধর্মের পথে পরমের সঙ্গে জীবের যোগসাধন। সত্যযুগের যুগধর্ম ছিল ধ্যান, ত্রেতাযুগে ছিল যজ্ঞানুষ্ঠান, দ্বাপরে ছিল পরিচর্যা এবং কলিযুগে হোলো নামকীর্তন। ভারতের ঐতিহ্যে চিরকালের বরাভয় সেই একই পরম জিজ্ঞাসা। উনিশ শতকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং পরে শ্রীঅরবিন্দ এসে পুনরায় যুগোচিতভাবে আমাদের সনাতনী ভাগবতী শক্তির ধ্যানকেই জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেননি কি?

৩৪

বেদান্তের পাঁচটি প্রধান সম্প্রদায় হোলো শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ,—রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ,—নিম্বার্কের স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ,—মধ্বের দ্বৈতবাদ—এবং বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। শঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীবজগৎ মায়ামাত্র! রামানুজ অদ্বৈতবাদ মেনেও তাকে 'বিশিষ্ট' বলছেন, কারণ জীবে-ব্রহ্মে ভিন্নতা-অভিন্নতা দুইই তিনি বিদ্যমান মনে করেছেন,— অভেদের ওপরেই তাঁর বেশি ঝোঁক। নিম্বার্কও প্রায় একই মত পোষণ করে ভেদ এবং অভেদ দুয়ের ওপরেই সমান গুরুত্ব অর্পণ করেন। মধ্বাচার্য জীবজগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন বলেছেন যদিও তা ব্রহ্মের মতোই সত্য ব'লে মেনেছেন। শ্রীচৈতন্য নিজেকে সকল সম্প্রদায়ের অনুগামী বলে মনে করতেন, তবে তাঁর দার্শনিক মতে পণ্ডিতরা নিম্বার্কের মতের সামীপ্য অনুভব করেন। এই মত অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ নামে পরিচিত। নির্গুণ ব্রহ্মের চিন্তা এ মতে অবান্তর। প্রেমই পরম। কৃষ্ণ সেই প্রেমের ঠাকুর। রাধিকা তাঁর প্রেমশক্তি। অর্থাৎ কোনো দূর বৈকুণ্ঠের নারায়ণ ও লক্ষ্মীরূপে তাঁরা মানুষের শুধু পূজার ঠাকুর নন, তাঁরা মানুষের মানস-বৃন্দাবনে জীবের প্রেমলীলার আশ্রয়প্রেরণা। সেই কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে কোথাও যেতে চান না। নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য সেই বৃন্দাবনের ইশারা।

৩৫

তন্ত্রের পথেও এই একই লক্ষ্যের দিকে সচেতনতা অনুভব করা যায়। তন্ত্র-সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যেই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দেবীসূক্ত তার নিদর্শন। এই দেবীসূক্ত হোলো দেবী দুর্গার

স্তোত্র। তিনি কালী বা শক্তিরই এক অভিব্যক্তি। অথর্ববেদেও তান্ত্রিক সাধনাচারের মতন কিছু কিছু আচারের কথা আছে। উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে প্রশ্নোপনিষদে ষট্‌চক্রভেদের কথা পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে তান্ত্রিক মন্ত্রের মতো মন্ত্র বিদ্যমান। অথর্ববেদের অন্যতম সত্যদ্রষ্টা কাত্যায়ন তাঁর আশ্রমে এক বিল্ববৃক্ষতলে মহিষমর্দিনীর পূজা করেন। ঋষির সেই উপাসনায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী মহিষমর্দিনী দেবতাদের প্রতি নির্মম অত্যাচারী মহিষাসুরকে বধ করতে অবতীর্ণা হন।

শ্রীমদ্ভাগবত যখন রচিত হয়, তখনও তন্ত্রের প্রতি বিশেষ আস্থা ছিল। শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার জন্য ব্রজগোপীরা শক্তিদেবী যোগমায়ার পূজা করেন। তন্ত্রের দেব-দেবীর বহুল উল্লেখ আছে ভাগবতে। সুপ্রাচীন ঋষিদের মধ্যে দত্তাত্রেয়, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, নারদ, গৌতম, কপিল প্রভৃতি তন্ত্রজ্ঞানী ছিলেন।

অধিকারী-ভেদ অনুসারে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে যথাক্রমে বেদ, উপনিষদ্ ও স্মৃতি, পুরাণ ও সাহিত্য এবং তান্ত্রিক সাধনার প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হয়। সত্যযুগে যে দীর্ঘ আয়ু ও প্রচুর শক্তি ছিল মানুষের, উত্তরোত্তর তা কমতে থাকে। এই কলিযুগে বৈদিক আচার পালন করা দুঃসাধ্য। দ্বাপরে যখন পুরাণের ও সংহিতার যুগ গেছে, তখনও তন্ত্র ছিল পুরাণকারদের সুপরিচিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতিতে তার উদাহরণ আছে।

চণ্ডীতে তন্ত্র পরাবিদ্যা নামে অভিহিত। অর্থাৎ, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের মূল শক্তিতত্ত্বের আধার এই তন্ত্র। জন্ম-মৃত্যুর ধারায় আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক যাবতীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেয় তন্ত্র। তন্ত্রের উদ্ভব হিন্দুধর্মে নাকি বৌদ্ধধর্মে,—হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রে আদর্শ ও আচারগত ভেদ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে, সে-বিষয়ে এখানে আলোচনা বাহুল্য মাত্র। বরং এই প্রসঙ্গই বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, বিশ্ব-সৃষ্টির জ্ঞানময়ী পরমা শক্তিকে তন্ত্রে বলা হয় ব্রহ্মবিদ্যা। বেদান্তের অদ্বৈত-বাদের সঙ্গে এখানেও মূলে একের তত্ত্বই স্বীকৃত, কিন্তু তন্ত্রের কথা হোলো সেই একমাত্র শক্তিরই অন্তহীন অভিব্যক্তি এই বিশ্বজগতের যাবতীয় ব্যাপার। তিনিই মহামায়া!

৩৬

উপস্থিত আলোচনার প্রথম নিবন্ধের পঞ্চম পৃষ্ঠায় শ্রীঅরবিন্দের 'পুরুষোত্তম' উপলব্ধির প্রসঙ্গ খুবই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। শঙ্করপন্থী যাকে বলেন 'সদসদ্বিলক্ষণা মায়া, অরবিন্দ সেই মায়া-কে সৃষ্টির আদিকারণ বলেন নি,—পুরুষোত্তমের সচ্চিদানন্দময়ী শক্তিকেই আদি উৎস বলেছেন। সেই ভাগবতী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ে এই সূত্রে। তাঁর যোগ-সমন্বয় সম্পর্কিত আলোচনার বঙ্গানুবাদের (প্রথম ভাগ প্রথম মুদ্রণ, অক্টোবর ১৯৬৫ ভূমিকা বা 'অনুবাদকের নিবেদন'-এর এই কথাগুলি ভেবে দেখা দরকার —"শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ পূর্বপ্রচলিত যোগগুলির সমন্বয় বলিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন যোগপন্থার প্রায় সকল দুরূহতা এখানে একত্রিত হইয়াছে। তদুপরি সমন্বয় করিবার জন্য সে সমস্ত যোগপন্থাবলিতে যাহা নাই এমন অনেক অভিনব ভাবধারা, অভিনব তত্ত্ব তাঁহাকে যোগ করিতে হইয়াছে। তাহাতেও দুরূহতা বাড়িয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের রচনায় বাক্যের বক্তব্য বিষয় স্ফুটতর করিবার জন্য তৎসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের অবতারণা তিনি একই বাক্যের মধ্যে বিশেষণরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন বলিয়া বহুস্থানে বাক্যগুলি বেশ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। এ ব্যবস্থায় তাঁহার বক্তব্য বিষয় খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু ইহাতে তাঁহার লেখা সাধারণ পাঠকের নিকট অধিকতর দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।"

শাশ্বতের ওপর আমাদের ব্যক্তিমনের পূর্ণ অভিনিবেশ ব্যতিরেকে আত্মোৎসর্গ কখনোই সফল হয় না। বাসনার রূপান্তর চাই। এখানে বারবার সে কথা বলা হয়েছে। যোগ সেই প্রস্তুতি ও সার্থকতার দিকে গতি। সুরেন্দ্রনাথের অনুবাদে,—প্রস্তুতির প্রথম পর্বে সাধককে—"তাহার নিম্নতর প্রকৃতির যন্ত্রসকলের সাহায্যেই কর্ম করিতে হয় কিন্তু সে ক্রমবর্ধন ভাবে উপর হইতে সহায়তা পায়। কিন্তু এই গতির শেষের দিকের পরিবর্তনের স্তরে আমাদের ব্যক্তিগত এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা হ্রাস পাইতে এবং এক উচ্চতর প্রকৃতি ক্রিয়া করিতে থাকে; শাশ্বত মহাশক্তি এই সীমিত মর-আধারে অবতীর্ণ হন

এবং বর্তমানভাবে তাহাকে অধিকার ও তাহার রূপান্তর সাধন করেন।" এই সঙ্গে লক্ষণীয়—"আমাদের মধ্যের অহংব্যক্তিটি নিজের শক্তিতে, সংকল্পে, জ্ঞানে বা নিজের কোন গুণের সাহায্যে নিজেকে নিজ প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করিতে পারে না; যেটুকু সে করিতে পারে তাহা হইল নিজেকে রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত করা এবং যাহা সে হইয়া উঠিতে চায় ক্রমশ অধিকতররূপে তাহারি কাছে নিজেকে সমর্পণ করা।" যোগের প্রথম পর্বে এই অহংত্যাগ,—দ্বিতীয় পর্বে মানুষের এই প্রস্তুতি-প্রয়াসের সঙ্গে দিব্য ক্রিয়ার মধ্যবর্তী এক পরিবর্তন-ভূমি পাওয়া যায়—যাকে বঙ্গানুবাদে বলা হয়েছে—"এক ক্রমবর্ধমান বিশুদ্ধ ও জাগ্রত নৈষ্কর্ম্য"—তারপর—"উপর হইতে এক বিশাল জাগ্রত ও বর্ধিষ্ণু অলৌকিক ক্রিয়াধারা প্রবল বেগে" সাধকের সত্তায় অবতীর্ণ হয়। সুরেন্দ্রনাথের অনুবাদে—"শেষ স্তরে আর কোন চেষ্টা কোন বাঁধাধরা প্রণালী, সাধনার কোন নির্দিষ্ট পন্থা থাকিবে না।"[৭৩]

বর্তমান আলোচনার সপ্তম পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—"পূর্ণতা মানে সর্বৈব চৈতন্যবিভা।" অষ্টম পৃষ্ঠায় অরবিন্দের নিজের বাংলা উক্তি তুলে দেখানো হয়েছে—"মানুষ সমাজের নয়, মানুষ ভগবানের।" ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার 'জগন্নাথের রথ'-ভাবনাটি এসে দাঁড়িয়েছে। ধম্মপদ,—রামমোহনের কর্ম ও উপলব্ধি—বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ও রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-ধারণা,—অধ্যাপক হরিদাস চৌধুরীর ব্যাখ্যাক্রমে প্রাপ্ত মন ও অতিমানসের গুণগত পার্থক্যের দিক,—ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের উপলব্ধি,—শ্রীঅরবিন্দের 'বিশ্বনৃত্য' কবিতাটি,—গৌতম বুদ্ধের কথায়—অমৃতের আবাদ (পৃষ্ঠা ২৫),—শ্রীঅরবিন্দের 'ডিভাইন মাদার'-ভাবনা (পৃষ্ঠা ৬৫),—৬৮-৬৯ পৃষ্ঠায় তাঁর উক্তি—"অখণ্ড আসল পুরুষ" ইত্যাদি দেখা গেছে। যোগের ক্ষেত্রে তিনি যে কখনোই ব্যক্তিগত মুক্তির ওপর জোর দেননি, সেকথা বলা হয়েছে ১১৭-১৮ পৃষ্ঠায়। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের 'সানাই' কবিতাটির ঐক্যমন্ত্রের ধ্যান স্বতই এইসব ভাবনাসূত্রে দেখা দিয়েছে (১২৬ পৃষ্ঠা)—এবং অরবিন্দের সাহিত্যিক সত্তা, রাজনৈতিক কর্ম ও চিন্তাচর্চার সত্তা,—তাঁর যোগী-সত্তায় সর্ববিধ খণ্ড-পরিচিতির মধ্য দিয়ে তাঁর সত্য-সাধনারই অভিব্যক্তি ফুটেছে। এই একটি কথাই বারম্বার অনুভবে আসে। তাই একে একই বিষয়ের পুনরুচ্চারণ বা পুনরাবৃত্তিদোষ মনে করা ঠিক হবে না। {যোগের লক্ষ্য ভগবৎসামীপ্য ও

৭৩। 'যোগসমন্বয়', পৃষ্ঠা ২০-২৫ দ্রষ্টব্য।

ভগবৎসাযুজ্য। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গানুবাদে—"যোগের একমাত্র উদ্দেশ্য চিন্ময়ভাবে পূর্ণতা, স্বাধর্ম্য মুক্তি লাভ করা ; প্রকৃত আত্মাকে আবিষ্কার করা এবং দিব্য চেতনা ও প্রকৃতি গ্রহণ করিয়া ভগবানের সহিত মিলিত হওয়া।"[৭৫]

'দি সিন্থিসিস অফ যোগ' (১৯৫৫ সংস্করণ) গ্রন্থের যোগ-সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে সকল মানুষের জীবনযন্ত্রণায় সান্ত্বনা ও উপশম ঘটাতে যাঁরা আগ্রহী, সেইসব মহাসাধকের প্রশংসা দেখা যায়। যোগ হোলো মুক্ত ও নিষ্কলুষ মানবসত্তায় ঈশ্বর ও প্রকৃতির পুনর্মিলন সাধন। তিনি বলেন যে, বিজ্ঞানের মতন যোগও এক পরীক্ষিত এবং ব্যবহারিক পথ। কিন্তু যোগের শ্রেষ্ঠতা কোন্ অবস্থায়, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি লেখেন যে, যেমন প্রকৃতিতে বাহ্যত অদৃশ্য হলেও তা নিত্যসক্রিয়, তেমনি সচেতন যোগসাধনা যাতে মানুষের জীবনে স্বতঃস্ফূর্ত ও অবচেতনবৎ হয়ে ওঠে, সেই অবস্থায় পৌঁছোনো চাই। অতীন্দ্রিয় লোকে নিত্যাবস্থান, আত্মজ্ঞান ও আত্মানন্দ—সংক্ষেপে যাকে বলা হয় 'সচ্চিদানন্দ,' সেই অবস্থায় পৌঁছে যখন খুশি যেমন খুশি এই ইহসীমায় অবতরণের এবং এ থেকে উত্তরণের সামর্থ্য জন্মায় এই তপস্যায়। ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে যে, সকল জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। শারীরিক ক্ষেত্রে মানবজীবন যদি বা বংশপরম্পরা রক্ষা মাত্র হয়, মনের ক্ষেত্রে মনুষ্যত্ব কিন্তু অপরিসীম! আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বা দিব্য অস্তিত্বে অশেষ আনন্দলোকই লক্ষ্য। শরীরকে ভোগের দিকে বেশি প্রশ্রয় দিলে শ্রান্তি ও অবসাদ ঘটে। আবার, দেহমন-কে বেশি ইহবিমুখ করলে তা শুকিয়ে যাবে, সত্তার ভিৎ দুর্বল হয়ে পড়বে। ঈশ্বর বা পুরুষ, নিসর্গ বা প্রকৃতি এবং ব্যক্তিবোধময় মানবাত্মা—এই তিন পক্ষের একীকরণই যোগের পথ। সর্বসমন্বয়ী শ্রীঅরবিন্দ -যোগে মানুষের সকল বৃত্তিকে দিব্য উপলব্ধির অভিমুখে পরিচালিত করাই লক্ষ্য। যেহেতু মানুষের চিন্তা আছে, বোধ আছে, সংকল্পও আছে—সুতরাং এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার চাই। পূর্বোক্ত গ্রন্থের ৬৯৭ পৃষ্ঠায় তিনি এই কথাই জানিয়েছেন।

তাঁর ঐহিক শরীরের সমাপ্তি ঘটে ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০। শ্রীশ্রীনিবাস আয়েঙ্গার রচিত 'On the Mother' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণের (মে, ১৯৫০) ৪৯৭ পৃষ্ঠায় শ্রীমা-র ৮ই ডিসেম্বরের এই

৭৫। তদেব, পৃষ্ঠা ১৯৩ দ্রষ্টব্য।

খেদোক্তির উল্লেখ পাওয়া যে, পৃথিবীর মানুষ শ্রীঅরবিন্দের 'সুপারমাইণ্ডে'র অবতরণ গ্রহণে অসমর্থ ছিল ("the lack of receptivity of the earth") বলেই তিনি দেহরক্ষার সিদ্ধান্ত নেন। শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর 'Among the Great' (Jaico edition)-এর ৩৫৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, ১৯৪৩-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি শ্রীঅরবিন্দকে তিনি তাঁর ইহজীবনের উদ্দেশ্য কী, এই প্রশ্ন করেন ; উত্তরে অরবিন্দ সুপারমাইণ্ডের অবতরণ সম্ভব করে তোলবার কথাই বলেছিলেন। ১৯৩৮-এ শ্রীমা-ও নাকি অরবিন্দের মধ্যে সেই সুপারমাইণ্ডের প্রবেশ দেখেছিলেন। অরবিন্দের সাধনার চূড়ান্ত পরিচিতির জন্যে তাই তাঁর প্রতীক-মহাকাব্য 'সাবিত্রী'র প্রসঙ্গ অবশ্যই লক্ষণীয়।

এই আলোচনার উপস্থিত প্রথম খণ্ডের ৭৩ পৃষ্ঠায় শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারে 'ওভারমাইণ্ড', 'ইলিউমাইণ্ড মাইণ্ড' ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে। আবার ১১৬-১৯ পৃষ্ঠাতে, ১২৪-২৮ পৃষ্ঠায় এবং তারও আগে ৩১-৩৩ পৃষ্ঠাতেও যোগ, গুরু, সাধনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছে। ৬৮-৬৯ পৃষ্ঠায় 'পূর্ণতা' সাধনের কথা আছে। শ্রীঅরবিন্দের মানসিকতার সূত্রানুসন্ধানে যাঁরাই উদ্যোগী হয়েছেন এবং হবেন, সকলকেই এসব জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের দেশের পূর্ব পূর্ব সাধকদের জীবন-জিজ্ঞাসা ও সত্য-সন্ধান এই আলোচনা-প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত বটেই তো। রাজনৈতিক চিন্তা, সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্য-সমালোচনার কাজ—এবং সে সবের মধ্যেই নিত্যতাবোধের স্ফুরণ ও সাধনা সম্ভব হবেনা কেন ? মহামায়া-ই বলা যাক্ আর ব্রহ্ম-ই বলা যাক্, চৈতন্যের উৎসমূলের সন্ধানটাই অনিবার্য পরিণাম। সেজন্যে এই আমাদের পরিচিত মনেরই অনুশীলন চাই। এ. বি. পুরানির 'দি লাইফ অফ শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২-১৯২৬)' নামে ইংরেজি বইটির ২১৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, গান্ধীজী যেমন অন্তরের প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করতেন, শ্রীঅরবিন্দও তেমনি যথার্থ উচ্চতর আধ্যাত্মিক শক্তি ব্যতিরেকে মানব জগতের পুনরুজ্জীবন যে সম্ভব নয়, তা বিশ্বাস করতেন। ১৯২২-এর পয়লা জানুয়ারি পণ্ডিচেরির শ্রীমা যখন সেখানকার সকল কাজ পরিচালনার ভার নেন, সেই বছরেই জুলাই মাসের খবরে দেখা যায় যে, শ্রীঅরবিন্দ নাকি তখন থেকে আর বছর দুয়েকের বেশি ফরাসী-অধিকৃত পণ্ডিচেরিতে থাকতে চাননি। প্রবর্তক-সংঘের সঙ্গে অরবিন্দের সাধনাদর্শ সম্পর্কিত মতান্তরের কথাও সেই সময়ের। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক সম্বন্ধেও তখন কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে।

১৮ই মে ১৯২৩ মাদ্রাজের 'স্বরাজ' পত্রিকায় জি. ভি. সুব্বারাও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের তুলনাত্মক এক প্রবন্ধ লিখেছেন। বহির্জগতের সঙ্গে কখনোই ঠিক নিঃসম্পর্কিত ছিলেন না অরবিন্দ। সেই বছরেই দেশের অহিংস রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তিনি। ৫ই জুন ১৯২৩ চিত্তরঞ্জন দাস, প্রবর্তকের মতিলাল রায় প্রভৃতির সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর। চিত্তরঞ্জনকে স্বরাজ্য-দল গঠনের উৎসাহও দেন, আবার একথাও বলেন যে, চিত্তরঞ্জন যদি রাজনৈতিক কাজ ছেড়ে দেন, তাহলে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁকে তিনি সাহায্যও করতে পারেন। চিত্তরঞ্জন এই শর্তে রাজী হতে পারেননি, কিন্তু অরবিন্দ সম্বন্ধে তাতে তাঁর অনাস্থা ঘটবে কেন? ১৯২৪-এর ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের গভীর মমতাময় ব্যক্তিত্বের দর্শনানন্দে বিভোর হন পণ্ডিচেরির প্রত্যেক দর্শনার্থী। একজন শিষ্য লিখেছেন—গভীর সমর্পণের আনন্দ সেদিন সকলের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল। প্রতিদিনই তাঁকে দেখা যেতো বটে, কিন্তু ১৫ই আগষ্ট ১৯২৪-এর দর্শন কী রকম?—"not of a human being but of some supreme Divinity"! সেই শিষ্যেরই ভাষায়,—'He is usually an embodiment of knowledge. But today he is different. He is all love."

সাধনা থেকে এই তো উত্তরোত্তর সিদ্ধির অবস্থা! কিন্তু এসব অলৌকিক কিনা, সে বিষয়ে বিতর্ক অবান্তর। সাধনার উপায় ও লক্ষ্য এই দুই ব্যাপারের ভাবনা যে-কোনো সচেতন মানুষের মনেই জাগা স্বাভাবিক। অবশ্য এমন মানুষও আছেন যাঁদের এসব দুর্ভাবনা নেই। হয়তো তাঁদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু যাঁরা এই জীবনের মানে নিয়ে কিছু-না-কিছু মনস্ক, তাঁরাই ধর্মশাস্ত্র, নীতিবিজ্ঞান, শান্তি-অশান্তির সংঘর্ষ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে অবশেষে নানা বই, বিভিন্ন শিক্ষক,—স্বজনের সংঘর্ষ ও শুভেচ্ছা পেরিয়ে, পরিণামে কোনো যথার্থ গুরুর কাছে গিয়ে পৌছোন।

এরকম জিজ্ঞাসু হয়তো মুষ্টিমেয়, এবং সে ক্ষেত্রে 'গুরু'-র সংখ্যা ততোধিক স্বল্প। খাওয়া-পরার সমস্যা, শিক্ষার সংকট, স্বাস্থ্যের দৈন্য, জীবিকার সমূহ অভাব—এসব তো আছেই। সসংসারে অনেক সমস্যা। সময় যতোই এগুচ্ছে, মানুষের পৃথিবীর বড়ো বড়ো দুস্তর ভৌগোলিক ব্যবধান ততোই অপসারিত হ'য়ে এক বৃহৎ, বিশৃঙ্খল জনতার পাহাড় উঠে মানুষের অন্তর্মুখী রুচিকে ততোই বাধা দিচ্ছে। ভিড় ঠেলতে-ঠেলতে এবং ধাক্কা খেতে-খেতে হিমশিম বোধ করছেন সকলেই—মানে, অধিকাংশই।

নীট্‌শে, কার্লাইল, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি নানা মনীষী এসে 'সুপারম্যান' বা অতিমানব বা মহামানবের অভ্যুদয়-কামনা করেছেন। আমরা কি অহিংস পন্থায় মহামানব-কে পাবো, না-কি সহিংস পন্থায়? গীতা এই প্রশ্নের কি উত্তর দেন? শ্রীকৃষ্ণ সবই করে রেখেছেন, হে সব্যসাচী, তুমি নিমিত্তমাত্র হও! অবস্থাবিপাকে না পড়লে সেরকম সমর্পণ কি সহজে সম্ভব হয়? অর্জুনের অহংকার কম ছিলনা। কিন্তু কুরুক্ষেত্র তাঁকে সমর্পণে বাধ্য ক'রেছিল। সাধারণ মানুষের জীবনেও সেইরকম ঘ'টে থাকে। অনেক হাবুডুবুর আশঙ্কা ঘটে যায়— এবং কবির কথাটা সত্যি বলে বোঝা যায়— 'হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।'

তবে, গুরু-সন্ধানের ইচ্ছেটা যদি সত্যিই আত্মিক তৃষ্ণার তাড়নায় কোনো মনে ঘটে, তাহলে তিনি অবশ্যই দেখা দেন। এর অন্যথা ঘটে না। এই বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব যে তত্ত্বই হোক্ না কেন,— পথ যা-ই হোক্,—ভেতরের তৃষ্ণাটাই শক্তির বীজ।

শ্রীঅরবিন্দের নিজের লেখা থেকেই জানা যায় যে, আত্মজাগরণের বা আত্মজ্ঞানের সন্ধান গত কয়েক শতাব্দীর তুলনায় অতীতে কোনো কোনো দেশে কোনো কোনো পর্বে অনেক বেশি ঘটেছে। আমাদের দেশে বৈদিক যুগে অথবা প্রাচীন মিশরে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যেই আত্মিক কোনো প্রাপ্তি বা নিগূঢ় জ্ঞান ছিল সীমিত। মানবসাধারণ বল্‌তে যে বিপুলতা বোঝায়, তার বিবর্তন ঘটে ধীরে ধীরে— জড় থেকে প্রাণের স্তরে,—প্রাণ থেকে মনে। সেই সুবিপুলতার মধ্য থেকেই বাধা ভেদ ক'রে আত্মিক উপলব্ধির দরজা খুলতে পেরেছেন দু'পাঁচজন— যাতে মানসিক স্তর থেকে আত্মিক ও অতিমানসিক সত্তার বিবর্তন সম্ভব হয়। ইতিহাসে কখনো কখনো সেই স্বল্পসংখ্যক মানুষই তাঁদের দেশের জনসমাজে ব্যাপক প্রভাব সঞ্চার করেছেন— যেমন ঘটেছিল বৈদিক ভারতে,—মিশরে,—অথবা জনশ্রুতি অনুসারে প্রাচীন আট্‌লান্টিস্ অঞ্চলে। কখনো আবার এই জ্ঞানী সত্যদ্রষ্টারা জড়বাদে আবদ্ধ তাঁদের সমকালের সমাজের বাইরে নিজেদের গোষ্ঠীবেষ্টনীতেই আত্মরক্ষা করে গেছেন।

আমাদের জগদীশচন্দ্র বসুর কথা মনে পড়ে। তিনি লিখেছিলেন— "সেতারের তার যতই ছোট করা যায়, সুর ততই চড়া হয়।" বৈজ্ঞানিক ও সেতার-বাদকরা সকলেই একথা জানেন। কিন্তু আরো ছোটো করলে আরো যে চড়া সুর বেরোয়, সেতো মানুষের কানে পৌঁছোয় না। মানুষের

গোচরতার একটা সীমা আছে। খুব বড়ো সত্য—যাকে আমরা 'সত্য', 'ভূমা', 'আনন্দ', 'লীলা' ইত্যাদি শব্দ-সংকেতে বুঝতে চেষ্টা করি, তাকে ইন্‌টালেক্‌টের বা পরিচিত বুদ্ধির গুণে বোঝা যায় না। তাকে বোঝাবার জন্যেই সাধনা দরকার। যথার্থ তৃষ্ণা না জাগলে সাধনাও ঘটে না, গুরুও আসেন না। আমাদের শাস্ত্রে সেই কারণেই বলা হয়েছে, তিনি যাকে বরণ করেন, সে-ই তাঁকে পায়। মেধা দিয়ে নয়,—অনেক পাণ্ডিত্য দিয়েও নয়, তাঁর কৃপা না ঘটলে তিনি আসেন না। জগদীশচন্দ্রের "অব্যক্ত" বইটি যাঁরা পড়েছেন তাঁদের একথা নতুন ক'রে বলে দিতে হবে না যে, সে-বইয়ের শেষ প্রবন্ধের নাম 'হাজির'। সেই ছোটো প্রবন্ধের শেষ দুই বাক্যে তিনি লেখেন—"কোন্‌টা সুমতি আর কোন্‌টা দুর্মতি এ ধন্ধাতেই জীবন কাটিয়াছে। সাফাই করিবার কথা যখন কিছুই নাই, তখন তোমার পাদপ্রান্তে লুণ্ঠিত সে কেবল বলিবে—"আসামী হাজির!"

প্রসিদ্ধ সাধু নাগমহাশয় (দুর্গাচরণ নাগ: ১৮৫৬-১৯০৯) ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের এই রকম শিষ্য। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী রচিত তাঁর ছোটো জীবনীটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন সত্যিকার 'সমর্পণ' কাকে বলে। গুরুকে ঐহিক বাসনা জানিয়ে ব্যতিব্যস্ত করাটা ভদ্রতাও নয়, সাধনাও নয়। ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনিই আসে। ভেতরে ভেতরে এই হোক্ জপমন্ত্র। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা এটি।

৩৭

১৯২৩ এর অনেক আগে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জনের বাংলা কবিতার বই 'সাগর সংগীত' ইংরেজিতে অনুবাদ করেন অরবিন্দ এবং সেজন্যে চিত্তরঞ্জন তাঁকে এক হাজার টাকা দেন। সেই বছরেই চন্দননগরে প্রবর্তক সংঘের মতিলাল রায়কে সর্ববিধ রাজনৈতিক কাজ চালু করার নির্দেশ দিয়ে চিঠি লেখা হয় পণ্ডিচেরি থেকে। ১৯২০ র পরে মতিলাল-শ্রীঅরবিন্দের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ১৯১০-র পরে অরবিন্দ নিজে সভা, অনুষ্ঠান ইত্যাদি প্রায় পরিহার করেন। ১৯২০-র পরে অরবিন্দের নিজের ঘরের বাইরে যাওয়াও প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৯১৪-১৫-তে তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রসঙ্গে বেশি ভেবেছেন বলে জানা যায়। ১৯১৪-তে 'আর্য' আপিশের যে বাড়িতে শ্রীমা থাকতেন, সেখান থেকে 'মা' প্রতিদিন বিকেলে চারটে-সাড়েচারটে

নাগাদ অরবিন্দের বাসস্থানে কিছু মিষ্টান্ন নিয়ে আসতেন। মায়ের বাড়িতে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় আহারের নিমন্ত্রণ থাকতো। মণি, নলিনীকান্ত প্রভৃতি অন্যান্য সঙ্গীরা ফুটবল খেলার পরে এসে যোগ দিতেন। অরবিন্দ যেতেন বিকেলে চারটে-সাড়েচারটে নাগাদ। রাত প্রায় নটা-দশটা পর্যন্ত আহারান্তিক আলাপ-আলোচনা চলতো। পল রিশার্ড তখন পণ্ডিচেরিতেই থাকেন। ১৯১৫-র ২১-এ ফেব্রুয়ারি মায়ের জন্মদিন প্রথম উদ্‌যাপিত হয় পণ্ডিচেরিতে। ২২-এ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ তারিখে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মা ফ্রান্সে চলে যান। ১৯১৪-র ১৫ই আগষ্ট থেকে 'আর্য' পত্রিকা বেরুতে আরম্ভ করে এবং পল রিশার্ড ছিলেন সেই পত্রিকার উৎসাহদাতাদের অন্যতম। অবশ্য অরবিন্দের নিজের উদ্যমই সর্বাধিক। পল রিশার্ড যখন যুদ্ধে যোগ দিতে চলে যান, তখন অরবিন্দ নিজেই সেই দর্শন-বিষয়ক পত্রিকাটি চালিয়েছেন এবং সেই সূত্রে দিলীপকুমার রায়কে এক চিঠিতে লেখেন—গোপনে জানাচ্ছি, আমি কখনোই দার্শনিক নই, যোগের আগে আমি কতটুকুই বা দর্শনশাস্ত্র জানতুম! আমি ছিলুম একজন কবি একজন রাজনীতিবিদ্—দার্শনিক ছিলুম না। কিন্তু পল রিশার্ড যখন দার্শনিক নিবন্ধ-পত্রিকায় কিছু-লিখতে বলেন, তখন ভাবলুম যেহেতু আমি যোগী এবং যোগীর পক্ষে যেহেতু সকল কাজই করা সম্ভব, সেই কারণেই আমি ঐ ৬৪ পৃষ্ঠার বুদ্ধিমার্গের প্রবন্ধ-নিবন্ধ চালিয়ে যাচ্ছি—দ্বিতীয়ত যোগের অভিজ্ঞতায় যা পেয়েছি বুদ্ধিগ্রাহ্য বাহনে তা প্রকাশ করা আমার দায়িত্ব বলে মনে করি।

১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমা ও অরবিন্দের মধ্যে যেসব চিঠি লেখালেখি হয়েছে তাতে মানব-কল্যাণের সাধনায় অন্তিম সাফল্যে দু'পক্ষেরই প্রত্যয়ের লক্ষণ আছে। মানুষের সমগ্র সত্তার রূপান্তর সম্ভব—এবিষয়ে যোগশক্তির সামর্থ্যে কেউই সন্দিহান ছিলেন না। শ্রীঅরবিন্দ নিজে কৃষ্ণ ও কালীর মহিমার কথা লিখেছেন। ইতিমধ্যে ১৯১৭-র হোমরুল আন্দোলন ক্রমেই দেশে ছড়িয়ে পড়ছে; সেই সময়কার পরিস্থিতির ঈষৎ পরিচয় দেওয়া যাক পুরানির ঐ বিবরণী থেকেই। ১৯৫৯-এর ১০ই মে রবিবার 'দি হিন্দু' পত্রিকায় 'আর্লি ডেজ অফ জার্নালিজম্' নিবন্ধে বি. শিবরাও লেখেন—আমরা তখন—'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সংযোগসূত্রে একবার পণ্ডিচেরিতে যাই—১৯১০-এ বাংলা থেকে বেরিয়ে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ যেখানে স্থায়িভাবে বাস করছিলেন। সেই আদি পর্বেও তাঁর মধ্যে দেখেছি প্রগাঢ় শান্তি ও শুচিতার ভাব। খুবই নরম গলায়, প্রায় চুপি চুপি

কথা বললেন তিনি। শ্রীমতী বেসান্ট যে ভারতের জন্যে হোম-রুল দাবি করেছেন, সে বিষয়ে তিনি তাঁর পূর্ণ অনুমোদন জানান এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির প্রতি বেসান্টের সমর্থন খুবই সংগত বলেন। মনে হয়, আবার কয়েক মাস পরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তারপর বছর-পঁচিশেক তাঁর সঙ্গে আমার কোন যোগ ছিল না। ১৯৪২-এর এক সকালে সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌-এর যুদ্ধকালীন ভারত-সফরের আলাপ যখন প্রায় নিষ্ফল হচ্ছে, সেই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে গান্ধীজী ও নেহেরুর জন্যে এক বার্তা পেলুম—তিনি জানিয়েছিলেন যে ক্রিপ্‌স্‌-প্রস্তাব কংগ্রেসের পক্ষে বিনাশর্তে মেনে নেওয়া উচিত। পণ্ডিচেরি থেকে পাওয়া সেই নির্দেশের মধ্য দিয়ে অরবিন্দের কৃষ্ণ-কালী-মহাশক্তি-মহামায়া ধ্যানের সঙ্গে বহির্জগতের চূড়ান্ত কোনরকম বিচ্ছেদ যে ঘটেনি, তার ইশারা কি সুস্পষ্ট নয়?

১৯১৮-তে অরবিন্দজায়া মৃণালিনীর মৃত্যু হয় এবং সেই বছরেই ব্রিটিশ সরকারের ঘোষিত মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কারকে তিনি 'এক ভারতীয় জাতীয়তাবাদী' এই স্বাক্ষরে 'চীনা ধাঁধা' নামে অভিহিত করেন।

পুরানি লিখেছেন, অরবিন্দ তখন চুরুট খেতেন,—১৯১৯-২০ তে তাঁর ডান চোখ লাল হয়, জ্বালা করে। তাঁর অনুচরেরা বলেন,—চুরুটের জন্যেই এরকম ঘটেছে, কিন্তু একদিন সকালে তিনি নিজে বললেন, দু'ঘণ্টার মধ্যেই চোখ ঠিক হয়ে যাবে—এবং হোলোও সেই রকম। আর একটি বিশেষ কথা পুরানির ভাষাতেই দেওয়া যাক—"From 1924 even the occasional taking of wine was given up and in 1926 he gave up at one effortless stroke his habit of smoking"।[৭৬]

এসব তথ্যও জানা দরকার। মহামায়া মাটি থেকেই প্রাণ এনেছেন, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে দিব্য-চেতনায় উদ্ভাসিত হচ্ছে সেই মাটি!

৩৮

১৯২০তে বোম্বাইয়ের সুপরিচিত ব্যারিস্টার জোসেফ ব্যাপটিস্টা—যিনি তিলকের জাতীয় দলের অন্যতম নেতা ছিলেন, ১৯০৭ থেকেই তিলকের সঙ্গে অরবিন্দের ভাবগত মিলের ওপর নির্ভর ক'রে,—তিলকের পরামর্শেই বোম্বাইয়ের

৭৬। 'The life of Sri Aurobindo (1872-1926) ২য় সংস্করণ ১৯৬০ পৃষ্ঠা ১৯৩ দ্রষ্টব্য।

সোশ্যালিষ্ট ডেমোক্র্যাটিক দলের এক মুখপত্র সম্পাদনায় আমন্ত্রণ জানান তিনি। কিন্তু ১৯২০-র ৫ই জানুয়ারি তারিখে ব্যাপটিস্টা-কে লেখা চিঠিতে অরবিন্দ জানিয়ে দেন যে, পণ্ডিচেরি ছেড়ে ব্রিটিশ ভারতে গেলে তাঁর আবার অন্তরীণ বা বন্দী হবার সম্ভাবনা তো আছেই, তাছাড়া—পণ্ডিচেরিতে তিনি বিশেষ স্থৈর্য ও তপস্যার জন্মেই গেছেন—"I do not at all look down on politics or political action or consider I have got above them. I have always laid a dominant stress and I now lay an entire stress on the spiritual life, but my idea of spirituality has nothing to do with ascetic withdrawal or contempt or disgust of secular things. There is to me nothing secular, all human activity is for me a thing to be included in a complete spiritual life, and the importance of politics at the present time is very great।"[৭৭]

সাহিত্য সমালোচনা ও কাব্যতত্ত্ব ব্যাখ্যায় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর জীবনের অনেক সময় অর্পণ করে গেছেন। সে-প্রসঙ্গ এর আগেও এই আলোচনার উপস্থিত প্রথম খণ্ডেই দেখা গেছে। 'আর্য' পত্রিকায় তিনি ভূরিপরিমাণে লিখেছেন এসব প্রসঙ্গে। যে শুধু সাহিত্যরচনার কাজ নয়। তাঁর উপলব্ধির কথাই তিনি লিখে গেছেন। তাঁর চিঠিপত্রের তৃতীয় পর্যায়, সাবিত্রী-সম্পর্কিত পত্রাবলী ইত্যাদি স্মরণীয়। যোগ ও সাহিত্য তাঁর দৃষ্টিতে পৃথক ব্যাপার নয়। মগধ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যক্ষ এস. কে. প্রসাদ তাঁর 'The literary Criticism of Sri Aurobindo (with special reference to poetry: ভারতী ভবন, ১৯৪৪) বইয়ে শ্রীঅরবিন্দের কবিতা ও সাহিত্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে কবিতায় 'Mantra of the Real'-এর ওপর অরবিন্দের বিশেষ জোরের দিকটি দেখিয়েছেন। আত্মিকতার আনন্দ থেকেই কবিতার জন্ম, প্লেটোর উক্তিতে ('possessed by the Muses') অধ্যাপক এই বোধের স্বাদ পেয়েছেন। অন্যান্য লেখকের প্লেটো-আলোচনার প্রসঙ্গও ওঠে। অধ্যাপক প্রসাদের কথায়—"The poet was a possessed creature, not using

৭৭। অন্যেষ, পৃষ্ঠা ১৯৪-৯৬ দ্রষ্টব্য।

language in the way that normal human beings do, but speaking in a divinely inspired frenzy." It was at any rate, in this frame of mind or consciousness that the prophetic poets delivered the word of God"—অর্থাৎ যথার্থ কবি তো সাধারণ মানুষের মতন কথার ব্যবহার করেন না—অন্তত যাঁরা ভবিষ্যৎ-বাণী করতে পারেন কবিতায়, তাঁরা দিব্যভাবের প্রেরণাতেই তা সম্ভব করে তোলেন। অধ্যাপক প্রসাদ লেখেন যে, সভ্যতার আদিপর্বে এটাই ছিল কবিতা সম্বন্ধে সাধারণ প্রচলিত ধারণা এবং প্লেটো প্রথমে তাঁর Phaedrus-এ—পরে আরো বিস্তৃতভাবে তাঁর Ion-এ এই দুই ধারণা ব্যাখ্যা করেন,—শেষোক্ত গ্রন্থে "where the poet is presented as the inspired rhapsodist through whom God Himself speaks"। সক্রেটিস আয়ন-কে বলেন—তোমার যে বিশেষ গুণ (gift), সে তো শিল্পকলা (art) নয়,—সে এক প্রেরণা (inspiration)—যেমন এক ধরনের পাথরে থাকে চুম্বকের গুণ। আদিযুগের অ্যারিষ্টটল,—উনিশ শতকের কোল্‌রিজ,—আরো আধুনিক কালের I. A. Richards ও F. R. Leavis-এর সঙ্গে এদিকে তাঁর নিষ্ঠার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন অধ্যাপক প্রসাদ।[৭৮]

আধুনিক কালে ইংরেজ কাব্য-সমালোচকদের মধ্যে Abercrombie, C. Day Lewis প্রভৃতির ব্যাখ্যায় কবিতার মন্ত্রগুণের প্রশস্তির নিকটি অনুবিস্তর দেখা গেছে। তবে অধ্যাপক প্রসাদের কথায়—"When we now turn to Sri Aurobindo's interpretation of poetry as *mantra,* we find that in his large spiritual utterance, the whole thing takes on a new intensity and depth of meaning. The English word 'incantation', particularly as interpreted by Abercrombie and C. Day Lewis, falls quite short of the potencies and depths and complexities of meaning which lie packed in the Sanskrit word *mantra*"।

অরবিন্দের 'ফিউচার পোয়েট্রি' উল্লেখ করে তিনি লেখেন—"He takes the *mantra* "as the highest, intensest revealing form of poetic thought and expression"—and in this he has the sanction of the Vedic poets themselves"।

৭৮। তদেব, পৃ. ৫৫৮ দ্রষ্টব্য।

প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ও আনুষঙ্গিক অনিবার্য বিশের ছন্দের বাহনেই সে উপলব্ধি উচ্চারিত হয়েছে। গভীরতম সত্যের উপলব্ধি—সেই উপলব্ধির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের অভিব্যক্তি—এবং সেই সঙ্গে অনিবার্য আনুষঙ্গিক ছন্দ—এই তিনের সম্যক্ একাগ্রতাই আবশ্যিক শর্ত।

মন্ত্র-সৃষ্টি বুদ্ধির দান নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন 'মন্ত্র' আসে 'ওভারমাইণ্ড' থেকে। 'সাবিত্রী' চতুর্থ সর্গ থেকে ২৮-এর পংক্তিটি উদ্ধৃত করে শ্রী কে. ডি. শেঠনা দেখিয়েছেন—'Sight's sound-waves breaking from the soul's great deeps'! শ্রীযুক্ত প্রসাদ তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ের ১৫৩ পৃষ্ঠায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কবি শ্রীঅরবিন্দের হাতে দেবতার দীপ জ্বলেছিল 'সাবিত্রী' মহাকাব্যে।

৩৯

১৩৬৩ সালের মাসে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মশায়ের 'কি লিখি' বইখানি বেরিয়েছিল। সে-বইয়ের মোট এগারোটি প্রবন্ধের মধ্যে প্রকাশ-কালের দিক থেকে প্রথমটির নাম 'প্রাচীন পুঁথির সংস্করণ'। ১৩২৪-এর বৈশাখ সংখ্যার 'প্রতিভা' পত্রিকায় সেটি ছাপা হয়। ১৩৫৭ সালের তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যার 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'বাংলা-বিরামাদি চিহ্ন' রচনাকালের দিক থেকে সে-বইয়ের শেষ প্রবন্ধ। বাংলার প্রাচীন পুঁথি, বানানের বিশেষত্ব, বিরামাদি চিহ্ন, 'বাংলা ভাষার লিখন পঠন' ইত্যাদি বিষয়ই তাঁর নিজস্ব বিষয়। 'বাংলা ভাষার প্রসার চিন্তা' নামে প্রবন্ধটি তার অন্তর্ভুক্ত; ১৩৫৬-র আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে সেটি প্রথম ছাপা হয়। তাঁর মন ব্যাকরণ-ঘেঁষা এবং তাঁর স্বভাব পণ্ডিতজনোচিত। বাংলা ভাষারীতির দুটি প্রসিদ্ধ রূপভেদ বোঝাতে গিয়ে সাধারণত 'সাধুভাষা' আর 'চলিতভাষা' বলা হয়ে থাকে; কিন্তু যোগেশচন্দ্র তাঁর 'কি লিখি' প্রবন্ধে এই দুটি শ্রেণীর নাম দেন 'লৈখিক' ও 'মৌখিক'। সাহিত্যের অভিপ্রায়গত শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে তিনি 'জ্ঞান-সাহিত্য', 'ক্রিয়া-সাহিত্য' এবং 'ইচ্ছা-সাহিত্য' এই তিনটি অদ্ভুত ধরনের নাম ব্যবহার করেন। ব্যাখ্যা-সূত্রে এই বিভাগের জের ধরে তিনি লেখেন, 'যে রচনায় পাঠকের অন্তর্জ্ঞানবৃদ্ধি মুখ্য উদ্দেশ্য, সেটা জ্ঞান-সাহিত্য। যেমন দর্শন। কর্ম শিখাইবার অভিপ্রায়ে যে উপদেশ, সে-উপদেশ ক্রিয়া-

সাহিত্য। যেমন ইতিহাস, বিদ্যা ও কলা। যাহাতে মিথ্যা সৃষ্টির দ্বারা পাঠকের চিত্তবিনোদন হয়, সেটা ইচ্ছা-সাহিত্য।'

এই 'জ্ঞান', 'ক্রিয়া', 'ইচ্ছা'র বিভাগ যথার্থ সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগের পক্ষে কতদূর উপযোগী সে বিচার সময়-সাপেক্ষ। উপন্যাস প্রভৃতিতে মিথ্যা সৃষ্টির দ্বারা পাঠকের চিত্তবিনোদন হয় বটে, অতএব উপন্যাস 'ইচ্ছা-সাহিত্যে'র শ্রেণীভুক্ত! 'ক্রিয়া-সাহিত্য' ব্যাপারটি একটু অস্পষ্ট। কবিতাকেই বা কি বলা যাবে? ইতিহাসই কী সত্যি সত্যি 'কর্ম শিখাইবার অভিপ্রায়ে' লেখা হয়? শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' পড়তে পড়তে এসব কথা মনে আসে। ভক্তের দল এবং অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতরাও বইখানির প্রশংসা করেছেন। এতে গভীর কথা বলা হয়েছে কিন্তু সে সব যাই হোক, এ-কাব্যের কাব্যমূল্য কী?

এ-কালের মন থেকেই এ-কালের মহাকাব্য দেখা দিতে পারে। শ্রীঅরবিন্দের যোগী-সত্তা এই 'সাবিত্রী'-কাব্যে পুরানো বিষয়বস্তু অবলম্বনে আধুনিক অথচ চিরন্তন জীবন-প্রত্যয়েরই কাব্যরূপ রেখে গেছেন।

কবিতা আমাদের অন্তর্জ্ঞান বাড়াতে পারে। যাঁরা কর্মী অথবা দার্শনিক, স্বভাবের দিক থেকে তাঁরাও কবি হতে পারেন। যেমন, জগদীশচন্দ্র বসু—যাঁর প্রসঙ্গ আগেই দেখা গেছে। ১৯১৭-র ৩০-এ নভেম্বর সার্কুলার রোডের বিজ্ঞান-মন্দির জাতির কল্যাণার্থে সমর্পণ করবার সময়ে তিনি তাঁর বত্রিশ বছরের বিজ্ঞান-চর্চার কথাসূত্রে জগতের অন্তর্নিহিত ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথা থেকেই জানা গেছে যে, সেই অনুষ্ঠানের তেইশ বছর আগে নিজের গভীর মনে তিনি এই সংকল্প গ্রহণ করেন যে, একজন মানুষের পক্ষে যতটা আগ্রহ, আন্তরিকতা এবং বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞান চর্চায় উন্নত হওয়া যায়, তাঁর দিক থেকে সে-রকম আত্মনিয়োগে কার্পণ্য ঘটবে না! তারপর, কাজে নেমে, নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি একদিকে পদার্থ-বিজ্ঞান এবং অন্যদিকে শারীরবৃত্ত,—ক্রমশ এই দুই শাস্ত্রের সঙ্গম-সন্ধিতে এসে পৌছোন। তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিতে প্রাণী এবং অ-প্রাণী,—এই দুই পৃথক জগতের প্রভেদ মুছে গিয়েছিল। ইংলণ্ডের 'রয়্যাল সোসাইটি'র প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীদের কাছে তিনি যখন তাঁর সে আবিষ্কারের কথা জানান, তখন সেই পণ্ডিতসমাজের মধ্যে যাঁরা ছিলেন শারীরবৃত্তবিদ্, তাঁরা

তাঁকে স্ব-ক্ষেত্রেই একনিষ্ঠ থাকবার পরামর্শ দেন—অর্থাৎ পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষক শারীরবৃত্তের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ না করলেই সমীচীন হয়,—এই ছিল তাঁদের অভিমত।

পরম সহিষ্ণুতার সঙ্গে জগদীশচন্দ্র সে-পরামর্শ শুনেওছিলেন, এবং তা ভেবে দেখতেও তিনি আপত্তি করেননি। কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনায় নেমে জ্ঞানের গণ্ডি অত্যন্ত সীমিত করে রাখবার সংকীর্ণতা তাঁর পছন্দ হয়নি। মানুষের সব রকম জিজ্ঞাসার পরম সমাহার এবং অখণ্ড সমাবেশের মধ্যেই সত্যসন্ধানীর যথার্থ অবস্থান। পৃথক পৃথক বিজ্ঞানশাখার পারস্পরিকতা তো বটেই, এমন কি বিজ্ঞানের সঙ্গে ললিতকলার ঘনিষ্ঠ সংযোগের আবশ্যিকতাও তিনি বিশেষ আবেগের সঙ্গে অনুভব করেছিলেন। ১৯১৭-র সেই বক্তৃতার মধ্যে বসু-বিজ্ঞানমন্দিরের কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন: 'In this Institute, this Study and Garden of Life, the claim of art has not been forgotten, for the artist has been working with us from foundation to pinnacle, and from floor to ceiling, in this very Hall. And beyond that arch, the Laboratory merges imperceptibly into the garden, which is the true laboratory for the study of life'।

পরীক্ষাগারের ইঁট, কাঠ, যন্ত্র-সমাবেশের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির এই আশ্চর্য সংযোগের উপলব্ধি তাঁর কবিমনের পরিচায়ক। কেবল পৃথকের সমাবেশবোধ মাত্র নয়,—বিচিত্রের অন্তর্লীন গভীর ঐক্যের অনুভূতি ছিল তাঁর মনে। শেষ জীবনে নিজের প্রথম জীবনের স্মৃতিকথা ভাবতে ভাবতে তাঁর 'অব্যক্ত' [প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩২৮] বইখানির শেষ প্রবন্ধ 'হাজির'-এর শেষ দিকে তিনি জানান—'কলে কেন ক্লান্তি হয়? এই প্রশ্ন কিছুতেই এড়াইতে পারিলাম না। অনেকগুলি আবিষ্কার কেবল লিখিবার অপেক্ষায় ছিল। সে-সব ছাড়িয়া দিয়া নূতন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতে হইল। ক্রমে দেখিতে পাইলাম, জীবন-হীন ধাতুও উত্তেজিত এবং অবসাদগ্রস্ত হয়। উত্তেজনা স্থগিত রাখিলে স্বল্লাধিক-কালে ক্লান্তি দূর হয়। উদ্ভিদে এই সব প্রক্রিয়া অধিকতররূপে পরিস্ফুট দেখিলাম। এইরূপে বহুর মধ্যে একত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম।'

পাশ্চাত্ত্য জগতের আধুনিক বিজ্ঞান সাধনার কথাসূত্রে তিনি ১৯১৭-র সেই ইংরেজি রচনার মধ্যেই লেখেন: 'Excessive specialisation in the

West has led to the danger of losing sight of the fundamental fact that there can be but one truth, one science which includes all the branches of knowledge'।

এই সত্যবোধই তাঁর মনে আর এক প্রশ্ন জাগিয়েছিল : 'How chaotic appear the happenings in Nature! Is Nature a cosmos in which the human mind is some day to realise the uniform march of sequence, order and law?'

শুধু বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেই নয়, এ-কালের শিক্ষিত মনমাত্রেই কিছু-না-কিছু পরিমাণে এ-অনুভূতির অংশীদার। কবিদের মধ্যেও বিশ্ব ও আত্মচিন্তার অন্বয় ক্রমেই ব্যাপক ও আবশ্যিক হয়ে উঠছে। সত্যকে অখণ্ড রূপে অনুভব করতে আর যে বাধাই থাক, কাব্যের আদর্শগত কোনো বাধা নেই। তবে পাঠকের পক্ষে এককালের ধারণা থেকে অন্যকালের ধারণায় প্রবেশের পথে কিছু বিচার-বিতর্ক দেখা দেওয়া,—এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনান্তর ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। কবিতার রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ইচ্ছা, কর্ম, জ্ঞান সবকিছুই জাগিয়ে দিয়ে গেছেন। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি বড়ো বড়ো কবিদের নাম আমরা এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করে থাকি। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের জগৎ স্বতন্ত্র! তাঁদের রচনার মাধুর্য কি একই রকম? পৃথিবীতে এক মাধুর্যের সঙ্গে অন্য মাধুর্যের কি পুরোপুরি মিল খুঁজে পাওয়া যায়? তবে, কথাটা এই যে—কবিতায় বিষয়বস্তুর মাধুর্য, রীতি ও আঙ্গিকের মাধুর্য থেকে আলাদা করে দেখবার জিনিস নয়।

পাটের ব্যবসাদারের সঙ্গে গানের সমজদারের তুলনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : 'যে লোক পাটের অভিজ্ঞ যাচনদার সে রসসিক্ত পাট চায় না; সে বলে, আমাকে শুকনো পাট দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটা বুঝিব। গানের উপযুক্ত সমজদার বলে, বাজে রস দিয়া গানের বাজে গৌরব বাড়াইয়ো না, আমাকে শুকনো মাল দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটি পাইব, আমি খুশি হইয়া দামটি চুকাইয়া দিব। বাহিরের বাজে মিষ্টতায় আসল জিনিসের মূল্য নামাইয়া দেয়।'

প্রসিদ্ধ 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধে এক জাতের মিষ্টতাকে তিনি বলেছিলেন 'নিঃসংশয় মিষ্ট, নিতান্তই মিষ্ট'; আর, অন্য শ্রেণীর মিষ্টতাকে বলেছিলেন

'মনের নিজের আবিষ্কার'। প্রথম শ্রেণীর স্বীকৃতি 'ইন্দ্রিয়ের অসন্দিগ্ধ সাক্ষ্যের' গুণে। জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা' এই জাতের সৌন্দর্য। কিন্তু কালিদাসের কুমারসম্ভব-কাব্যের 'পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা'র ধ্বনিমাধুর্য সত্যিই ভিন্ন জাতের আবেদন! রবীন্দ্রনাথের মতে 'ইহার মধ্যে লয়ের যে উত্থান আছে, কঠোরে কোমলে যথাযথরূপে মিশ্রিত হইয়া ছন্দকে যে দোলা দিয়াছে, তাহা জয়দেবী লয়ের মতো অতি প্রত্যক্ষ নহে; তাহা নিগূঢ়; মন তাহা আলস্যভরে পড়িয়া পায়না, নিজে আবিষ্কার করিয়া লইয়া খুশি হয়।'

কালিদাস, জয়দেব প্রভৃতি কবিদের প্রসঙ্গ 'রবীন্দ্রনাথের কেকাধ্বনি' প্রবন্ধের আনুষঙ্গিক মনন মাত্র। উদাহরণ দিতে তাঁর জুড়ি খুঁজে মেলে না। রূপক, প্রতীক, সাদৃশ্য ইত্যাদির সাহায্যে কবি-মন আপনার গূঢ় ধারণাগুলি কতোভাবেই যে ব্যক্ত করেছে! মানুষের মানসিক ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে এক রকম আত্মাদর নিহিত। 'কেকাধ্বনি'-র মাধুর্য সেই মননের গুণেই অধিগম্য। কথাসূত্রে তিনি লেখেন: 'আমাদের এই মায়াবী মনটিকে সৃজনের অবকাশ না দিলে সে কোনো মিষ্টতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিয়া গণ্য করে না। সে উপযুক্ত উপকরণ পাইলে কঠোর ছন্দকে ললিত, কঠিন শব্দকে কোমল করিয়া তুলিতে পারে। সেই শক্তি খাটাইবার জন্য সে কবিদের কাছে অনুরোধ প্রেরণ করিতেছে।' কবিমানসের এই বিশেষত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের পাশাপাশি শ্রীঅরবিন্দের ধারণাটি মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। বর্তমান খণ্ডের ৭৪ পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত সেই উক্তিটি এই সূত্রে পুনরায় ভেবে দেখা দরকার।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার জগৎ থেকেই কবিমন বিশেষ বিশেষ চিত্র বা প্রতীক আবিষ্কার করে থাকে; কবির সৃষ্টি তো কেবলমাত্র চোখে দেখা রূপের প্রতিলিপি নয়,—কবি শুধু নকলনবীস নন,—তিনি গূঢ় সত্যের উদ্ঘাটন-পটু,—তিনি স্রষ্টা, তিনি গুহাহিত রহস্যের অভিব্যক্তা! অন্তরের ভাবকে রূপায়িত করে তিনি রসিকের সঙ্গে সত্যের যোগ ঘটিয়ে দেন। এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের ধারণা। জেমস্ কাজিন্স্-এর 'New ways in English Literature' বইখানির প্রশংসাসূত্রে সাহিত্যে আদর্শবাদ এবং বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে তিনি আধুনিক-কালে কবিমনের প্রতিক্রিয়ার কথা তুলেছিলেন। কথায়-কথায় একদিকে সাহিত্যের বর্ণনাপ্রধান রীতি, অন্যদিকে নাটকীয় রীতি, এই দুই রূপ-রীতির প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছিল। মেটারলিঙ্ক, ইয়েটস্, রবীন্দ্রনাথ —এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন গীতিধর্মী কবিতায় সিদ্ধহস্ত, তবু এঁদের কলমেও

কোনো-কোনো সময়ে নাট্যরূপের চর্চা আবশ্যিকভাবেই দেখা দিয়েছিল। যেমন আদর্শ এবং বাস্তবের বিপরীত অভিমুখিতা, তেমনি বর্ণনামুখ্য ভঙ্গি এবং নাটকীয় ভঙ্গির মধ্যেও একরকম বৈপরীত্য বিদ্যমান। তবু কবির সাধনায় কিছুই বর্জনীয় নয়। 'The Future Poetry' বইখানির মুখবন্ধে ঐ মেটারলিঙ্ক, ইয়েটস্ আর রবীন্দ্রনাথের কথাসূত্রে শ্রীঅরবিন্দ এই কথাই স্পষ্টভাবে জানিয়ে গেছেন: 'Who shall lay down rules for creative genius or say what it shall or shall not attempt? It follows its own course and makes its own shaping experiments'।

এই উদ্ধৃতির পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামলী'র প্রসিদ্ধ 'আমি' কবিতাটি মনে পড়ে:

ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'।
সেই আমির গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সংগম
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস।

কবিদের এই বিশেষ 'আমি'ত্বই তো কাব্যের নিয়ন্তা। কিন্তু এই গহন, গোপন, রহস্যময়, অন্তর্লীন 'আমি'-কেও সমুচিত লগ্নের জন্যে কার ওপর যেন নির্ভর করতে হয়,—প্রতীক্ষা করতে হয়! ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা রবীন্দ্রনাথেরই আর একটি কবিতা মনে পড়ে। ফুর্তির ঝোঁকে কয়েকজন বন্ধু চলেছিলেন পাহাড়ে পিক্‌নিক করতে। সেই দলেরই একজনের কথা:

শিখরে গিয়ে পৌঁছলেম অবারিত আকাশে,
সূর্য নেমেছে অস্তদিগন্তে
নদীজালের রেখাঙ্কিত
বহুদূরবিস্তীর্ণ উপত্যকায়।
পশ্চিমের দিগ্‌বলয়ে
সুরবালকের খেলার অঙ্গনে
স্বর্ণসুধার পাত্রখানা বিপর্যস্ত
পৃথিবী বিহ্বল তার প্লাবনে।

দার্জিলিঙে সিঞ্চল পাহাড়ে এই সূর্যাস্ত-শোভার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হয়েছে :

মন্ত্র রচনার যুগে জন্ম হয়নি
মন্ত্রিত হয়ে উঠল না মন্ত্র
উদাত্তে অনুদাত্তে।

এবং এই বেদনাবোধের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিছন ফিরে তাকিয়েছেন। কি দেখেছেন তিনি অতঃপর?

এমন সময় পিছন ফিরে দেখি
সামনে পূর্ণচন্দ্র,
বন্ধুর অকস্মাৎ হাস্যধ্বনির মতো।
যেন সুরলোকের সভাকবির
সদ্যোবিরচিত কাব্যপ্রহেলিকা
রহস্যে রসময়।

কবিমনের এই যে অভিজ্ঞতা,—সিঞ্চল পাহাড়ে উঠে কতকটা অপ্রত্যাশিত-ভাবে এই যে নিস্তব্ধ পৃথিবীর উন্মুখ ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা,—এবং সেই দৃশ্য দেখে মন্ত্র রচনার প্রেরণাবোধ,—তারপর সহসা পূর্ণচন্দ্রের 'রহস্যে রসময়' বিস্ময়রাগ,—সেই বিশেষ লগ্নের অভ্যুদয়ের জন্যে তাঁকে তো অপেক্ষা করতে হয়েছে! এ-কবিতার পরের স্তবকে সেই কথারই ইশারা আছে :

গুণী বীণায় আলাপ করে প্রতিদিন।
একদিন যখন কেউ কোথাও নেই
এমন সময় সোনার তারে রুপোর তারে
হঠাৎ সুরে সুরে এমন একটা মিল হোলো
যা আর কোনোদিন হয়নি।

বিস্ময়ের অভিব্যক্তি সব ক্ষেত্রে ঠিক যে একই রকম হতে হবে, সেকথা মনে করা ঠিক নয়। বিস্ময়ের প্রকৃতি অনুসারে প্রকাশেও পার্থক্য ঘটে থাকে। অনির্বচনীয়, বৃহৎ কোনো ব্যাপ্তির কিংবা সুবিপুল কোনো গভীরতার আস্বাদন থেকে লেখকের মনে যে প্রকাশ-রীতির তাগিদ জেগে ওঠে, রবীন্দ্রনাথ এখানে সেই রীতি সম্বন্ধে ইশারা দিয়ে 'মন্ত্র' কথাটির ওপরে জোর দিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যচিন্তা-সম্পর্কিত লেখাগুলির মধ্যেও মন্ত্র-রীতির উল্লেখ দেখা যায়। এই বইয়ের ৮৩ থেকে ৮৭ পৃষ্ঠার মধ্যে, ১০০-১০২ পৃষ্ঠায়—এবং

অন্যত্রও সেসব দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যেও 'মন্ত্র' কথাটির ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। সে সব তাঁর নিজস্ব ধারণার কথা। তাঁর ১৩২০ সালের ১৫ই মাঘের প্রবন্ধ 'একটি মন্ত্র' কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাকক্ষে পড়া হয়েছিল। তাতে তিনি বলেছিলেন :

'যদি জানতে চাই মানুষের বুদ্ধিশক্তিটা কী তবে কোন্‌খানে তার সন্ধান করব? যেখানে মানুষের গণনাশক্তি চিরদিন ধরে পাঁচের বেশি আর এগোতে পারল না, যদি জানতে চাই মানুষের ধর্ম কী তবে কোথায় যাব? যেখানে সে ভূতপ্রেতের পূজা করে, কাষ্ঠলোষ্ট্রের কাছে নরবলি দেয়, সেইখানে? না, সেখানে নয়। কেননা, সেখানে মানুষ বাঁধা পড়ে আছে। সেখানে তার বিশ্বাসে, তার আচরণে সম্মুখীন গতি নেই। চলার দ্বারাই মানুষ আপনাকে জানতে থাকে, কেননা চলাই সত্যের ধর্ম। যেখানে মানুষ চলার মুখে সেইখানেই আমরা মানুষকে স্পষ্ট করে দেখতে পাই; কেন না, মানুষ সেখানে আপনাকে বড়ো করে দেখায়—যেখানে আজও সে পৌঁছোয়নি সেখানটিকেও সে আপনার গতিবেগের দ্বারা নির্দেশ করে দেয়।'

মন্ত্রের রীতি বা প্রকৃতি সম্বন্ধে এখানে স্পষ্ট কোনো বিশ্লেষণ নেই বটে, তবু এই ক'লাইনের মধ্যে এমন এক অনুভূতি বা ভাবলোকের কথা আছে যেখানে না পৌঁছোলে উপলব্ধির নিগূঢ়, সংহত, রূপকধন্য প্রকাশ সম্ভব হয় না। আধুনিক কালে বিচিত্র বিজ্ঞান, জটিল রাষ্ট্রচিন্তা—ব্যক্তি, সমাজ এবং বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে কবি-মনের বিশেষ অনুভূতির ফলে, একাধিক দেশে মহাকাব্যের নতুনতর যে-সব প্রয়াস দেখা গেছে, সেইসব প্রকাশের মূলে এই রকম অনুভূতিরই সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এ তত্ত্ব পুরোপুরি বিশ্লেষণ করে দেখতে হলে বেশ কিছু ধৈর্য, কিছু সমবেদনা এবং বিশেষ অনুসন্ধানের পরিশ্রম স্বীকার করে নিতে হয়। এই সূত্রে শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'র কথা পুনরায় মনে আসে।

৪০

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত তিনজন অধ্যাপকের ভূমিকা-সংবলিত একখানি শিল্প-শাস্ত্রের বইয়ের কথা মনে পড়ে। বইখানির নাম

History of World Art। অধ্যাপকত্রয়ী যথাক্রমে—প্রথম Everard M. Upjohn, দ্বিতীয় Paul S. Wingert, তৃতীয় Jane Gaston Mahler। তাঁরা ভূমিকায় বইখানির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দু'কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন যে, ঐতিহাসিক ধারা অনুসারে বিভিন্ন শিল্পকলা ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য মনে রেখেই সে-বই সম্পাদিত হয়েছে। চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য,—এই তিন দিকেই তাঁরা মনোযোগী - এবং য়ুরোপ, উত্তর-আমেরিকা, এশিয়া, মিশর আর মেসোপোটেমিয়া, এই ক'টি দেশের শিল্প সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

অনেক দেশের, অনেক কালের, নানান শিল্পপরিচিতির ছবিতে ছবিতে বইটির প্রথম এবং বেশ বড়ো একটি অংশ ভরিয়ে দিয়ে [মোট ৬৫৪ খানি ছবি আছে] সাধারণভাবে শিল্পসৃষ্টির বিষয়ে ব্যাখ্যা শুরু হয়েছে। আর্ট কাকে বলে,—কী তার উপকরণ, কী-ই বা তার উদ্দেশ্য,—এই ধরনের প্রশ্ন দেখা দিলে এঁদের এই বইখানির একটি অতি সহজ কথা প্রথমেই মনে পড়ে —'A work of art is like a triangle whose sides are content expression, and decoration. These three factors are interdependent, but not necessarily equal.'—আর্ট-ত্রিভুজের এই তিন বাহুর প্রথমটিকে বাংলায় বলা যেতে পারে বিষয়বস্তু, দ্বিতীয়টিকে প্রকাশ বা অভিব্যক্তি—তৃতীয়টি অলংকরণ। ত্রিভুজ-রূপকটি ব্যবহার করছেন বলেই এঁদের একথা বিশেষ ভাবে বলে দিতে হয়েছে যে, এই তিনটি বাহু পরস্পর সমান নয়। 'In any given example the artist may choose, or circumstances may compel him, to develop one phase beyond another.' কোথাও বিষয়বস্তু, কোথাও অভিব্যক্তি, কোথাও বা অলংকরণ প্রাধান্য পেতে পারে। 'সাবিত্রী'তে প্রথমটিরই প্রাধান্য নয়, তিনের সমন্বয় সন্দেহাতীত।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলীর তৃতীয় খণ্ডে [Letters of Sri Aurobindo : Third series] কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণভাবে জ্ঞাতব্য কতকগুলি তথ্য সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতামত ছাপা হয়। আগেই বলা হয়েছে, ১৯১৪ থেকে ১৯২১-এর 'আর্য' পত্রিকায় তিনি 'The Future Poetry' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁর চিঠিপত্রের তৃতীয় খণ্ডে সে-প্রবন্ধের উদ্ধৃতি নেই বটে, কিন্তু তাতে কবিতার সত্য সম্বন্ধে

তাঁর ধারণার আরো অনেক নজীর সংকলিত হয়েছে। এই পত্রগুচ্ছ সম্পাদনায় ন'টি আলাদা বিভাগের বৈচিত্র্য দেখানো হয়েছে। উপস্থিত আলোচনার ৭৪-৭৫ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এখানে যথাসাধ্য পুনরাবৃত্তি পরিহার ক'রে ৭৫ পৃষ্ঠার ৩৩ সংখ্যক পাদটীকায় যে-রচনার উল্লেখ আছে, সেটিই সংক্ষেপিত হোলো। ব্যাসদেবকেও তিনি প্রথম শ্রেণীতে জায়গা দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু শেলি, কীট্স, ওয়ার্ডস্বার্থকে তিনি যথার্থ বড়ো কবি বলতে রাজী হননি।

শেক্স্পীয়র, শেলি ইত্যাদি প্রসঙ্গে এক মন্তব্যের মধ্যে তিনি কবিদের বিশেষ সামর্থ্য সম্বন্ধে এই ইশারা দিয়েছিলেন যে, একদিকে ভাষার ওপর দখল, অন্যদিকে অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির অকৃত্রিমতা—যুগপৎ এই দু'টি ক্ষমতাই তাঁদের পক্ষে আবশ্যিক বলে বিবেচ্য। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বা বেদনা আছে, অথচ ভাষার জোর নেই—কবিতার এরকম দৃষ্টান্তও তাঁর নজর এড়াতে পারেনি। এই চিন্তাসূত্রেই কবি ব্লেকের কথা উঠেছিল। তিনি ব্লেকের বিষয়ে বলেছিলেন যে, য়ুরোপের মিষ্টিক্‌দের মধ্যে ব্লেকের প্রতিষ্ঠা আছে। তাঁর কবিতার মধ্যে সারল্য বা স্বচ্ছতার নমুনা নিশ্চয় আছে, তবু যে-সব ক্ষেত্রে তিনি দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছিলেন, সে-সব ব্যাপারের মূলে ছিল তাঁর বিশেষ ভাবনারই বিশেষত্ব: 'His occasional obscurity is due to his writing of things that are not familiar to the physical mind and writing them with fidelity instead of accomodating them to the latter.'—অর্থাৎ অসাধারণ মনোধর্ম বা অ-সাধারণ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একান্ত নিষ্ঠা ছিল ব্লেকের।

শুধু মাধুর্য বা বিস্ময়ের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রের পক্ষেই এ-কথা মেনে নেওয়া যায় যে, এই পরিবর্তনশীল দুনিয়ার কোনো স্তরে কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়। পশ্চিমের কাব্যক্ষেত্রে মহাকাব্যও একটিমাত্র আদর্শের মধ্যে নিশ্চল হয়ে নেই। হোমার সেই কাব্যাদর্শের স্বরূপ দেখিয়ে গেছেন, ভার্জিল তাকে আরো পরিণতি দিয়েছেন,—মিল্টন তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পরিস্ফুট করে গেছেন। এদেশেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে। বাল্মীকি এবং বেদব্যাসের মূল গ্রন্থের নানা অনুবাদের কথাই শুধু নয়,—বাংলার উনিশ শতকের মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের কথাও স্মরণীয়। তাঁরা প্রাচ্য মহাকাব্যের আধুনিক

পরিবর্তন দেখিয়ে গেছেন। উনিশ শতকে পশ্চিমের ভাব লেগেছিল আমাদের কবিদের মনে। 'মেঘনাদবধ-কাব্য' প্রভৃতি উনিশ শতকের রচনা তারই অভিব্যক্তি। এই সূত্রে মধুসূদন সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের একটি উক্তি বর্তমান আলোচনার ৭৯ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে। এখানে 'সাবিত্রী'র কথাতেই ফেরা যাক। পুরানি [A. B. Purani] প্রণীত 'Sri Aurobindo's Savitri: An Approach and Study' বইখানির সাহায্যে মূলগ্রন্থের মর্মার্থ সন্ধান করলে উপকার হয়। কারণ, মূল বইয়ের প্রথম সর্গের প্রথম দশ লাইনের মধ্যেই একে একে 'The huge foreboding mind of Night', 'unlit temple of eternity', 'eyeless muse' এবং 'A fathomless zero occupied the world'—এই চারটি রূপধ্যানের দ্রুত সমাগমকে ঠিক কবিতার মধুর এবং মিহি লহরী-লাবণ্য মনে করা, বা তা থেকে কবিতার সাধারণ অভ্যস্ত আবেদন লাভ করা, এমন কি তাকে অসাধারণ তীব্র কোনো কাব্যাঘাত বলে বিবেচনা করাও সহজ নয়। পুরানি তাঁর সহায়িকা-গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠাতেই উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'The Future Poetry' গ্রন্থে লেখেন, 'The work of poet depends not only on himself and his age, but on the mentality of the nation to which he belongs and the spiritual, intellectual, aesthetic tradition and environment which it creates for him'। অর্থাৎ কবির কাজ তো শুধু তাঁর আপন ব্যক্তিসত্তার অথবা নিজের কালধর্মের প্রতিফলন ঘটানো নয়,—তাঁর স্বজাতির আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক, সৌন্দর্যরুচিগত ঐতিহ্য,—এবং এই সবের ফলে তাঁর বিশিষ্ট যে পরিবেশ-প্রকৃতি গড়ে ওঠে, তারও প্রভাবের স্মারক!

সে যাই হোক্, 'সাবিত্রী' এক স্মরণীয় আখ্যানের রূপায়ণ—এ এক বিশেষ রূপক কাব্য। —ইংরেজিতে বলা হয়েছে—'a legend and a symbol'। আবার একজন মার্কিন সাংবাদিক এই কাব্য সম্বন্ধে বলেছেন—'One of the longest and worst epic poems of all time.'। পুরানি আমাদের সে-কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভালোই করেছেন। কারণ, শুধু সূক্ষ্ম বা গভীর, দীর্ঘকালের অথবা দীর্ঘতর কালের পক্ষে সমাদরণীয় কোনো বিষয়বস্তুর গুণেই কোনো রচনাকে মহৎ কাব্য বলতে হবে, এমন ধারণা

আমাদের অভ্যস্ত কাব্য-বিশ্বাসের পরিপন্থী! প্রথম দর্শনে একে গভীর সমাদর-যোগ্য কাব্য বলতে আপত্তি জাগলে মার্জনাশীল অনুরাগী ব্যক্তি অপরাধ নেবেন না। এ রচনা সুদীর্ঘ তো বটেই, তা'ছাড়া এটি ইংরেজিতে লেখা। পূর্বোক্ত ইংরেজিভাষী আলোচক একে 'worst' বিশেষণ দিয়েছেন কোন্ বিশিষ্টতার কথা ভেবে, তা নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হবার প্রয়োজন নেই! বস্তুত পুরানির কথাই প্রাসঙ্গিক। তিনি 'সাবিত্রী' কাব্যের নিন্দা ও প্রশংসা, দুয়েরই নমুনা তুলে দিয়ে জানিয়েছেন যে, এরকম ক্ষেত্রে এ-কাব্যের মূল্য নির্ণয় করা কঠিন কাজ।. তিনি আরো বলেছেন,—'Savitri has an Indian legendary backgroud. But this background is merely the starting point of the poet's inspiration and the reader is not expected to know all the details of the original legend.' 'সাবিত্রী' শব্দের ব্যুৎপত্তি স্মরণ করে তিনি বলেছেন যে, 'সু' ধাতুর অর্থ প্রসব করা; আবার 'সোম' বা স্বর্গীয় আসব বাচক শব্দটির মূলেও এই একই ধাতুর প্রভাব স্বীকার্য। অতএব 'সাবিত্রী' শব্দের মধ্যে সৃজন এবং সৃষ্টির আনন্দ, দুটি ভাবই বিদ্যমান। সবিতা একদিকে যেমন দ্যুতির দেবতা, অন্যদিকে তেমনি সৃষ্টিরও দেবতা। সাধারণত সূর্যকেই তাঁর প্রতীক ধরা হয়। তাই 'সাবিত্রী' মানে সবিতা-সম্ভূত অর্থাৎ সূর্যাগত কোনো সত্তাশক্তি।' আলোচ্য কাব্যে সাবিত্রী হলেন মানবের যাত্রা-সহচরী ভগবৎ-মমতা। মানুষকে তিনি সার্থকতার ঘাটে পৌঁছে দিতে চলেছেন! সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী আছে মহাভারতের বনপর্বে। সেই কাহিনী মনে রেখে তিনি তাঁর অন্তরানুভূতির প্রসাদ পরিবেশন করেছেন। কিন্তু পুরোনো কাহিনীর নতুন পরিবেশন কেন? ভাবনার স্রোতে ভাসতে-ভাসতে ভাবুক তাঁর নিজেরই অভিজ্ঞতার সমাহার থেকে কিছু কিছু উপকরণ বেছে নেন। সেই বাছাইয়ের মূলে অনেক রকম উদ্দেশ্যবোধ থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির ছবি তুলে-তুলে সেই সব ছবির সাহায্য জীবন-প্রবাহের ধারণা সঞ্চার করেছেন। শেক্‌স্‌পীয়র নাট্যাভিনয়ের প্রকৃতি মনে করিয়ে দিয়ে, তারই সাহায্যে জীবনের নশ্বর সমারোহবোধ জাগিয়ে দিয়েছিলেন! তেমনি 'সাবিত্রী'-উপাখ্যান অবলম্বন করে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আত্মানুভূতি এবং বিশ্বানুভূতির রস সঞ্চারের কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেই সংকল্পের ফল এই রচনা। তিনি নিজে বলে গেছেন যে, এই সংকল্পের সঙ্গে তিনি তাঁর

প্রেরণাকে যুক্ত হতে দেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের একখানি চিঠিতে এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে : 'I do not work at the poem once a week; I have other things to do. Once a month perhaps, I look at the new form of the first Book and make such changes as inspiration points out to me—so that nothing shall fall below the minimum height which I have fixed for it'।

প্রেরণা ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব নয়। 'সাবিত্রী'ও কবি-মনের প্রেরণার দান। কিন্তু পরমা ঐশী শক্তির সম্পূর্ণ অধিকারই বা কোন্ কবির অন্তরাধীন? সৃষ্টির ব্যাপারে স্রষ্টার সত্তাই মুখ্য। লেখক তাঁর নিজের মনের সাহায্যে লোক-মনের আবেদন-গ্রাহিকা শক্তির সীমা বুঝতে পারেন। তাই মনে হয়, কবির সংকল্পের সঙ্গে প্রেরণার যোগ থাকাটা যেমন আবশ্যিক এবং অনিবার্য শর্ত তেমনি প্রেরণাকেও শিল্পিমনের বশীভূত রাখা দরকার। 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের লেখক কিন্তু বিপরীত মার্গের সাধক। তিনি দু'রকম প্রেরণার কথা তুলেছেন—এক হোলো ওপর থেকে পাওয়া প্রসাদ—'Without any initiation by myself or labour of the brain,'—আর এক হোলো সাধারণ কবিসমাজের পরিচিত কাব্যপ্রেরণা,—যাকে তিনি বলেছেন, 'insufficient inspiration'! ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের একখানি চিঠিতে তিনি প্রেরণার এই জাতিভেদের কথা জানান। পণ্ডিচেরি থেকে প্রকাশিত তাঁর বইখানির পরিশিষ্ট হিশেবে এইসব চিঠি ছাপা হয়েছে।

এই সূত্রে 'সাবিত্রী-সত্যবান' কাহিনীর জনপ্রিয়তা,—এবং একেবারে আধুনিক কালেও এ-কাহিনী সম্বন্ধে নব্যতন্ত্রের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যেও বিশেষ আগ্রহের একটি নজীর উল্লেখযোগ্য। 'মণিবজ্র ভারতী'র 'পত্র' [১৩৩৪ সালের ১০ই কার্তিক] বেরিয়েছিল ঐ বছরের কার্তিক সংখ্যার 'কালি-কলম' পত্রিকায়। সে-সময়কার বাংলা সাহিত্যের নব্য লেখকদল যে বিশেষ ধরনের বস্তুনিষ্ঠা চর্চা করছিলেন, তারই সমর্থন-সূত্রে মণিবজ্র ভারতী সাবিত্রী-সত্যবানের গল্প স্মরণ করেছিলেন। সে গল্পের মধ্যে তিনি সাহিত্যের সেই 'বড় দিক' প্রকাশিত হতে দেখেছিলেন যাতে দেখা দেয়, 'শান্ত অবহিত হয়ে মানুষের বিচার, তাকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দানের বাস্তবিক চেষ্টা'। সেকালের বাংলা সাহিত্যের সেই

বস্তুতন্ত্রবাদের স্বরূপ ব্যাখ্যান তাতে কতোদূর সমর্থিত হয়েছিল, সে-কথা এখানে আলোচ্য নয়। শুধু সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী সম্বন্ধে সেকালের 'আধুনিক' বাংলা সাহিত্য-চিন্তারও আগ্রহের কথাই স্মরণীয়। সেই পৌরাণিক আখ্যানের সারসংক্ষেপ ছিল মণিবজ্রের লেখাটির মধ্যে। তিনি কেবল এইটুকু জানিয়েছিলেন যে—'রাজ-কন্যা সাবিত্রী কাঠুরে সত্যবানের প্রেমে পড়লেন। অবশ্য সেটা তাঁর পিতার ভাল লাগেনি; আজ পর্যন্ত, কোন পিতার তা ভাল লাগে না।' অতঃপর সত্যবান সম্বন্ধে সাবিত্রীর অনুরাগের নজীর তুলে পুত্র-কন্যার প্রেম সম্বন্ধে পিতামাতার বিরোধিতার দিকটিকে আরো তীব্র ভাবে তিরস্কৃত করবার সুযোগ নিয়েছিলেন মণিবজ্র ভারতী। তারপর আবার গল্পের খেই ধরে তিনি লেখেন: 'সবিত্রীর বিপদের উপর বিপদ হল, ত্রিকালজ্ঞ দেবর্ষি নারদ এসে বললেন, সর্বনাশ! সত্যবান? আরে ও-তো বিয়ের বছর পার না হতেই মারা যাবে। নারদ সাবিত্রীকে ডেকে বললেন, ছি ছি মা, এ কাজ তুমি কিছুতেই করতে পাবে না·· জেনে শুনে বৈধব্যকে কে বরণ করে নেয়? সাবিত্রী কিন্তু অচল-অটল। বললেন, সে কেমন করে হয়? আমি যে সত্যবানকে প্রাণ-মন সমর্পণ করে বসেছি। এখন অন্য পুরুষের কথা মনে স্থান দেওয়া যে পাপ!'

সংঘর্ষ এবং প্রত্যয়ের এই নাট্য-সন্ধিতে টেনে এনে, লেখক অতঃপর তাঁর পাঠকদের তাড়াতাড়ি জানিয়েছিলেন:

'অবশেষে প্রেমের জয়-জয়কার! মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে উঠলো।'

এবং পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেন:

'সাবিত্রী-ব্রত হিন্দু-ঘরের মেয়েরা নিষ্ঠার সঙ্গে আজও করে থাকেন। আসল বস্তুটি বাদ দিয়ে অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি হয় না!

সাবিত্রীর উপাখ্যানের আসল মর্মটি আমরা হারিয়ে বসেছি।'

শ্রীঅরবিন্দের কাব্যে সেই বিশেষ মর্মকথা উপলব্ধিরই অন্য একরকম প্রকাশ দেখা গেছে। 'কালি-কলম' গোষ্ঠীর লেখক মণিবজ্র সে-আখ্যান স্মরণ করেছিলেন এক প্রয়োজনে,—শ্রীঅরবিন্দ অন্য প্রয়োজনে! সেই বিশেষ প্রয়োজনের কথাই বিবেচ্য।

৪১

এ-যুগে মহাকাব্য লেখা অসম্ভব,—কিংবা মহাকাব্যের প্রেরণা নিতান্তই অতীতের ব্যাপার ইত্যাদি ধারণা যাঁরা পোষণ করেন, তাঁরা জোরের সঙ্গে এই কথাটাই জানিয়ে থাকেন যে, বর্তমান যুগ প্রধানত যুক্তিরই অনুরাগী। যুক্তিবাদ এবং মহাকাব্য কেন যে পরস্পরের বিরোধী বলে মানতে হবে, সে কথা ধীরে সুস্থে ভেবে দেখা দরকার। পুরানির বইয়ে এ-বিষয়ে যা বলা হয়েছে, সেটুকু অবশ্যই স্মরণীয়। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, এদেশে পশ্চিমের সাহিত্যাদর্শ দিয়েই আমরা অনেকদিন চালিত হয়ে এসেছি। য়ুরোপের সাহিত্য-সমালোচকরা রাষ্ট্র আর অর্থনীতি-ক্ষেত্রের মতন সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও য়ুরোপের প্রাধান্যের কথা ধরে নিয়ে আলোচনায় নেমে থাকেন। পুরানি সেটাকে ভ্রান্ত ধারণা বলতে কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর অভিপ্রায় হোলো য়ুরোপের সঙ্গে এদেশের সংস্কৃতিগত সম্পর্ক আরো গভীরভাবে তলিয়ে দেখবার অনুকূলে। সেভাবে দেখলে, এটা অবশ্যই চোখে পড়ে যে, উনিশ শতকে য়ুরোপের সংযোগ লাভের ফলে ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে সাহিত্য-বৈচিত্র্যের অপূর্ব জোয়ার এসেছিল। সেই সঙ্গে ইংরেজি আমাদের সর্বভারতীয় ভাষা বলেও গণ্য হয়েছে। পৃথিবীর সংস্কৃতি-সচেতন মানবজাতির মধ্যে অখণ্ড কোনো রকম ঐক্য সম্ভব কি-না, সেটা যদিও বিচারসাপেক্ষ, তবু পুরানি বলেছেন যে, ইংরেজি শিক্ষার ফলে ভারতবর্ষে যে Indo English সাহিত্য দেখা দিয়েছে, সেটি নাকি মানবজাতির সাংস্কৃতিক ঐক্যের আশাপ্রদ ভূমিকা বা সূচনা—'a very hopeful prelude to the cultural unification of mankind'। ইংরেজি সংস্পর্শের এবং য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের যুগে এদেশের সাহিত্যে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই! যাঁরা মহাকাব্যের অনুকূল সমাজ-পরিবেশ হিশেবে আদিকালের কথা উল্লেখ করেন এবং সে তুলনায় বর্তমানের অনুপযোগিতার কথা বলে থাকেন, পুরানি তাঁদের এই বলেছেন যে, এ-কালের এই নব্য ভারত-ইঙ্গ সংকর-সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' দ্রষ্টব্য। এবং 'It was therefore a phenomenon of very great significance when Sri Aurobindo turned his remarkable poetical capacity to the creation of

an epic in English to embody his grand vision of the spirit'। সাহিত্য-রাজ্যে য়ুরোপের সৃজনীশক্তিতে আজ হয়তো ভাঁটা দেখা দিয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে সেই ইংরেজির মাধ্যমেই ভারতীয় ঐতিহ্যের কথা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো—প্রথমে, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'-তে,—তারপর বিবেকানন্দের বিভিন্ন ভাষণে,—শ্রীঅরবিন্দের নানান্ রচনায়!

'গীতাঞ্জলি' গীতিকবিতা; কিন্তু 'সাবিত্রী' মহাকাব্য। য়ুরোপীয় সংস্কৃতির যাঁরা গুণমুগ্ধ, অথচ নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সজাগ, সে-রকম আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষে গীতিকবিতা এবং মহাকাব্য দুই-ই যোগ্য বাহন হতে পারে। 'Life Divine'-এ শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সত্যোপলব্ধি প্রকাশের যে বিপুল আয়োজন দেখিয়েছেন, 'সাবিত্রী'তে তারই রূপভেদ! K. D. Sethna-র কথায়—'To create a poetic mould equally massive and multiform as the 'Life Divine' for transmitting the living Reality to the farthest bound of speeeh—such a task is incumbent on one who stands as a maker of a new spiritual epoch'। এই মন্তব্য উল্লেখ করে পুরানি জানিয়েছেন—'Savitri fulfils that task'।

ধর্মচিন্তায় বা দার্শনিক মননে যাঁদের ঐকান্তিক আগ্রহ নেই, অথচ বহু-প্রশংসিত বা আলোচিত কোনো কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে যাঁদের অনুসন্ধিৎসা অকৃত্রিম, সেরকম পাঠক-সমাজে 'সাবিত্রী' বইখানি প্রথমে কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তা এবং অশান্তির কারণ বলে মনে হবে। প্রথম সর্গের শুরুতেই দেখা যায় বৈদিক উষার ভাবনা,—অনন্ত কালের নিরালোক শুব্ধতার বর্ণনা! সে অংশের শব্দে, রূপে এবং রূপকে—সৃষ্টির আদিপ্রান্তের প্রলয়ান্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে! প্রাণহীন, আকৃতিহীন, অবয়বহীন সেই সুবিপুল বিস্তারের কোনো দূর প্রান্তেও কোনোরকম মননের সম্ভাবনা ছিল কি? প্রলয়ের শূন্য গহ্বরে পৃথিবী যেন আত্মবোধহীন সুষুপ্তির মধ্যে লীন ছিল! আদিকালের সেই কায়াহীন নিশ্চেতনার মধ্যে হঠাৎ কোন্ এক নবজন্মের যন্ত্রণা দেখা দিলো! সে এক নামহারা অভিব্যক্তি,—মনঃসম্পর্কহারা ধারণা,—লক্ষ্যহীন ব্যাকুলতা!

Then something in the inscrutable darkness stirred;
A nameless movement, an unthought Idea

Insistent, dissatisfied, without an aim,
Something that wished but knew not how to be,
Teased the Inconscient to wake Ignorance.

সেদিন অন্ধকারের মধ্যে জেগে উঠেছিল আলোর পিপাসা। ঘুমন্ত মায়ের গালে যেন শিশুর আঙুলের ছোঁওয়া লাগলো! সেই জননী-রূপের কল্পনা শ্রীঅরবিন্দের কবিমনের দান! এই অবস্থায় সৃষ্টির আদি-জননীর স্বরূপ কি ছিল, তৎসূত্রে কবি অরবিন্দ লিখে গেছেন :

The heedless Mother of the universe,
An infant longing clutched the somber Vast.

আদি-অন্তহীন সেই অন্ধকারের মধ্যেই দেখা দিলো মন, জেগে উঠলো বোধ! তার্কিক যদি জিগেস করেন, 'কোন্ উপায়ে ?'—তাহলে কবির কথা দিয়েই সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া যাবে :

'All can be done if the god-touch is there'.

সময়ের অশেষ ধারার ধারণাটি ফুটিয়ে তোলবার অভিপ্রায়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এই 'সাবিত্রী' কাব্যের সূচনাতেই 'ঊষা'-প্রতীকের সদ্‌ব্যবহার করেছেন। এইসব ছবির সাহায্য নিতে-নিতে পাঠকের মন ক্রমশ তাঁর গভীর উপলব্ধির স্বাদ পেতে থাকে। সাধারণত যে বুদ্ধি-বিবেচনার স্তরে আমরা আবদ্ধ থাকি, সে-লোক থেকে অন্যলোকে এগিয়ে যাওয়া এইভাবেই সহজ হয়ে যায়। কবিতা সম্বন্ধে সাধারণ একটি সত্যের কথা এই সূত্রে মনে আসে। কবিতার রাজ্যে এমন লেখাও আছে বৈকি, যার ছন্দের দোলাটা আশ্চর্য মনে হয়, যা পড়তে ভালো লাগে, শুনতে ভালো লাগে,—মনের মধ্যে যার প্রতিধ্বনি অনেকক্ষণ ধরে ঘুরতেই থাকে,—তবু সুনির্দিষ্ট মানে তলিয়ে দেখতে সত্যিই অসুবিধা হয়! যেমন :

Sing a song of six pence
A pocket full of rye
Four and twenty blackbirds
Baked in a pie.
When the pie was opened
The birds began to sing :
Was n't that a dainty dish
To set before a king ?

এই ইংরেজি লেখাটির সমধর্মী বাংলা নমুনাও দুর্লভ নয়। বোধ হয়, পৃথিবীর যতো ভাষাতে কবিতা লেখা হয়েছে, সে-রকম প্রত্যেক ভাষা থেকেই এ-রকম কিছু কিছু উদাহরণ তুলে দেখানো যেতে পারে। এবং সেইসব নমুনা পড়বার সময়ে সমালোচকের ব্যাপক এবং অকাট্য মন্তব্যই স্বীকার্য—"Even the stoutest enthusiast for the symbolical interpretation of poetry would be hard put to it to discover any important 'message' here :—but the enchanting lilt of these lines !" অর্থাৎ, এর ভেতর থেকে কোনো-রকম 'বাণী' খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য ; যাঁরা প্রতীক ব্যাখ্যানে অত্যন্ত উৎসাহী, তেমন ব্যাখ্যাতার দলও হার মানবেন ; কিন্তু তবু এই লাইনগুলির দোলা কী আশ্চর্য !

অনুবাদের কাজে এই রকম অংশ যে কী সরল ও দুরূহ মনে হয়, সেকথা যিনি কখনো এ-কাজে হাত দিয়েছেন, তিনিই জানেন। বাস্তবিক সব শব্দের প্রতিশব্দ হয় না ; এক ভাষায় যে-সব শব্দ খুবই পরিচিত, অন্য ভাষায় চেষ্টা করলেই যে তাদের প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যাবে সে-ধারণা ঠিক নয়। প্রত্যেক ভাষাতেই শব্দের সঙ্গে নানা স্বাদ জড়িয়ে যায়। সেই অনুষঙ্গ থেকে শব্দকে আলাদা করে দেখা যায় না। 'The Problem of Translation' নামে এক প্রবন্ধের লেখক বলেছেন—"It is an illusion to suppose that every word, has an exact equivalent in other languages"—অর্থাৎ এক ভাষার প্রত্যেক শব্দের হুবহু প্রতিশব্দ আছে অন্য ভাষাতে,—এ ধারণা মোহ মাত্র ! এই সূত্রে আরো একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। Alexander Haddow-র লেখা 'On the Teaching of Poetry' নামে একখানি বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবিতার অধ্যাপকের পক্ষে কী কী গুণ থাকা দরকার সে-বিষয়ে কয়েকটি নির্দেশের প্রধান কথাটা এই যে, কবিতার শিক্ষককে কবিতা ভালোবাসতে হবে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি লেখেন—এই অনুরাগ-মন্ত্রই যখন আসল মন্ত্র, তখন অধ্যাপক-মশাইকে তাঁর নিজস্ব প্রিয় কবিতার একখানি সংকলন তৈরি করে নিতে হবে। চতুর্থ অধ্যায়ে হ্যাডো লেখেন, কবিতা পড়াতে গিয়ে কবির জীবনী নিয়ে বড়োবাড়ি করাটা ঠিক নয় ; ব্যাখ্যার বাড়াবাড়িও পরিত্যাজ্য। তার পরের অধ্যায়ে তিনি বেশ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, কবিতা কানে শোনবার শিল্প-সৃষ্টি, তা চোখে দেখবার আড়ম্বর নয় মোটেই। এবং তারও পরের অধ্যায়ে

জানান,—কে যে কোন্ রীতি ধরে কবিতার আলোচনা করবেন, সে-বিষয়ে সর্বজনস্বীকার্য কোনো নির্দিষ্ট পথ নেই। এ হোলো ভালবাসার খেলা—যাঁর যেমন রুচি, যেমন প্রেরণা, তিনি সেইভাবেই এগুবেন।—'It is like love-making, each must do it in his own way'।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর স্বক্ষেত্রে সেই তাড়না থেকেই এই রকম প্রতীক প্রয়োগের পথ বেছে নিয়েছেন। 'রাত্রি'-প্রতীক থেকে 'উষা'-প্রতীক এসেছে, সেই ভূমিকায় দেখা গেছে সাবিত্রীর অবস্থান। সাবিত্রী মানবিকও বটে, ঐশ্বরিকও বটে। পৃথিবী, প্রেম এবং মৃত্যু,—এই তিনের সমন্বিত সত্যেরই সে সম্মুখীন! আমাদের এই মর্তের মধ্যেই ঊর্ধ্বায়নী আকাঙ্ক্ষা জেগে আছে। সাবিত্রী সেই আকাঙ্ক্ষায় রূপায়ণ। এ-কাব্যের গল্পবস্তু অপ্রধান। অতি সামান্য পৌরাণিক কাহিনীর অবলম্বন এখানে এ-যুগের নিখিল-মানবসমাজের গভীর আত্মাভি-ব্যক্তির পথ খুলে দিয়েছে। পৃথিবীর যাবতীয় নশ্বরতার মধ্যে আত্মার আত্মা-বিষ্কারই তাঁর এই মহাকাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। নানা উদ্ধৃতি তুলে কাব্যের বিভিন্ন অংশের বিচিত্র অনুষঙ্গের পরিচয় দিয়ে ব্যাখ্যাতা পুরানি লিখেছেন: "A cosmos of multiple worlds acting and reacting upon the growing consciousness of the earth is seen moving towards planes of consciousness unattained by man and the future destiny of man, the whole life of man with all his multifarious activities is seen in the light of this grand vision··· The most ultramodern elements find their proper place in tbis complex and integral vision"।

'পৃথিবী' বা 'পার্থিব' বলতে বুঝতে হবে আদিম অজ্ঞানের অবস্থা; 'প্রেম' এখানে ঐশ্বরিক সেই লক্ষণ, যার ফলে পরম নেমে আসেন সীমিত প্রাণি-জগতের মধ্যে—মানুষকে চরিতার্থতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার আগ্রহে! মৃত্যু বা 'তম' হোলো প্রকৃতির বশ্যতাবোধ—মানুষকে যা নিরন্তর বাধা দিচ্ছে —জড়ের রাজ্যে তাকে কেবলই টেনে নামিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। এই তিন সত্যই মানব-জীবনের সত্য। এরাই মানুষের সুখ-দুঃখের হেতু। কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে সাবিত্রীর নবোন্মেষিত ব্যক্তিত্ব এসে দাঁড়িয়েছে জগতের দুরতিক্রম্য অবরোধের মুখোমুখি। দুনিবার বাধা-বন্ধনের মধ্যে মানুষ তার

আপন স্বাধীনতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। সমস্ত মুক্তি-সাধনার মধ্যেই এ অভিজ্ঞতা বিদ্যমান। একে অস্বীকার করা চলে না। 'সাবিত্রী' কাব্যের প্রথম দিকে সেই বাধার চেতনা সুস্পষ্ট। তবু তারই মধ্যে মুক্তির পথ প্রচ্ছন্ন ছিল। ধীরে ধীরে সেই সম্ভাবনার দিকে কবি তাঁর পাঠককে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মর্তের নশ্বরতা উত্তীর্ণ হয়ে অন্তরের অবিনশ্বর সত্যের প্রতিষ্ঠা চাই। এই সব ভাবনা-সূত্রেই রাজযোগের প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছে—এবং তা খুবই সংগতভাবে।

আমাদের অভ্যস্ত ধারণা অনুসারে কবিতার পক্ষে যোগের প্রসঙ্গ কেউ কেউ কতকটা অবান্তর, এমন কি প্রতিকূল বলেও মনে করতে পারেন। কিন্তু 'কবিতা' কি কবির যোগ নয়? তবে, 'সাবিত্রী' মহাকাব্যে কবিতার পক্ষে অনভিপ্রেত কিছুই হয়নি। বইখানির আয়তন বেশ বড়ো,-এর ভাষা ইংরেজি এবং বিষয়বস্তু বড়োই অন্তর্বোধ-প্রধান। ফলে, যে-পাঠক অল্প মাত্রায় কাব্যরসে অভ্যস্ত, তাঁর পক্ষে ধৈর্য বজায় রেখে সবটা পড়ে দেখা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে, এর কাব্যগুণে কোনো পক্ষেরই সন্দেহ হবার কথা নয়। প্রথম আবির্ভাবের লগ্নে সাবিত্রীকে দেখা গেছে—

> Akin to the eternity whence she came,
> No part she took in this small happiness;
> A mighty stranger in the human field,
> The embodied Guest within made no response.
> The call that wakes the leap of human mind,
> Its chequered eager motion of pursuit,
> Its fluttering-hued illusion of desire,
> Visited her heart like a sweet alien note.

নানা খণ্ডে, বিভিন্ন সর্গে অজস্র রূপকে প্রবাহিত এই সুদীর্ঘ রচনার শেষ পর্যন্ত এগিয়েও তার সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত হয় না। বর্তমান কালের যন্ত্র, বিজ্ঞান, অশেষ সমস্যা ও জটিলতার মধ্যে মানুষের মনে পরমের আকাঙ্ক্ষা ক্ষণে ক্ষণে অবশ্যই জাগছে। একালের ভাবুক মনের সেই সব যাবতীয় আত্মজিজ্ঞাসার বিস্ময় এবং বেদনা আছে শ্রীঅরবিন্দের এই ইংরেজি মহাকাব্যে!

সাবিত্রীর সত্তা বা প্রকৃতির বিশেষত্ব সম্বন্ধে 'সাবিত্রী' কাব্যের প্রথম সর্গের মধ্যেই কয়েকটি কথা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। মানব-শরীরের স্থূল বস্তু-পরিসীমা অস্বীকার করা অবান্তর। কিন্তু সেই সীমার মধ্যেই অসীম যিনি, তিনি অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছেন :

In he there was the anguish of the gods
Imprisoned in our transient human mould,
The deathless conqured by the death of things.

আত্মার অনন্ত ব্যপ্তি, বৈচিত্র্য ও বিস্ময় ঐক্যবোধের বাহন আমাদের এই মর্ত্য শরীর। অথচ জড় থেকে উৎপন্ন এই শরীরের নিজস্ব বাধাও তো কম নয়। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের পার্থিব-প্রকৃতির সেই বিশেষত্বের কথা-প্রসঙ্গেই বার বার 'earth-nature', 'earth-scene' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। রোগ, শোক, অভাব, মৃত্যু—এদেরই আমরা সঙ্গী হিসেবে পাই। এই জগৎ-সত্যের মধ্যেই সাবিত্রীর অভ্যুদয় ঘটেছিল। সেই অবস্থা থেকেই সাবিত্রীর জীবন-যাত্রা শুরু হয়েছিল :

A solitary mind, a world-wide heart,
To the lone Immortal's unshared work she rose.

কিন্তু নিঃসঙ্গ, দুঃখ-সমাকীর্ণ এই যে পথ-পরিক্রমার চেতনা, সে তো সহসা দেখা দেয়নি! প্রথমে জড়ের মতন নিশ্চেতন ছিলেন সাবিত্রী। তাঁর জন্মের অব্যবহিত পর-মুহূর্তগুলি ছিল বিস্মৃতির সুখাবেশে নিশ্চিন্ত। কবি বলেছেন—'Inert, released into forgetfulness'! তারপর ধীরে ধীরে দেখা দিয়েছে দেহ-চৈতন্যের স্ফুরণ; এসেছে সীমিত সময়ের বোধ, নিরুদ্ধ আকাশ বা Space-এর ধারণা! এলো স্মৃতি, এলো ভাবনা! এলো পার্থিব আয়ুর,—পার্থিব অস্তিত্বের বন্ধনবোধ। সেই সঙ্গে প্রেমও তাঁর চৈতন্যে প্রবেশ করেছে,—ছায়া ফেলেছে মৃত্যুর ধারণা। বহির্জগতের নানান অনিবার্য প্রাকার এবং অন্তর্জগতের নিগূঢ় দুঃখ, নৈরাশ্য, বিবেক—এ সবই সাবিত্রীর মধ্যে সত্য হয়ে উঠেছে। সাবিত্রী তখন মর্তে নবজাগ্রতা!

Awake she endured the moment's serried march
And looked on this green smiling dangerous world,
And heard the ignorant cry of living things.

'সাবিত্রী' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের

গূঢ় উপলব্ধির এই বিশেষ সত্যটি পাঠকের গোচরে আসে যে, মানুষের জীবনে যথার্থ সত্য-স্বীকৃতির লগ্ন বড়োই আশ্চর্য-রকম অন্ধকার! অন্ধকার,—কারণ, জীবনে যে মায়া বা অজ্ঞানের আলো ধরে আমরা প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ পেতে-পেতে জন্মকাল থেকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাই, সত্যের অনুভূতি যখন দেখা দেয়, তখন আমাদের চারদিকের সেই অভ্যস্ত মায়ারশ্মি হঠাৎ নিভে যায়!

An absolute Supernatural darkness falls
On man sometimes when he draws near to God:
An hour comes when fail all Nature's means;
Forced out from the protecting ignorance
And flung back on his naked primal need
He at length must cast from his surface soul
And be the ungarbed entity within.

ক্রমে সাবিত্রীর বোধে দেখা দেয় সেই আত্মাবিষ্কারের পরম লগ্ন। প্রশ্ন এই যে, সে অবস্থায় সে কী ভাবে সেই বোধের আনুগত্য করবে? শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—'Her will must cancel her body's destiny।'

এই কঠোর সত্যটি কবিমাত্রেই একবাক্যে জানিয়ে থাকেন যে, এই মর্ত্য জীবনে আমরা যাকে মনোরম বা প্রিয় সামগ্রী বলে মানতে চাই, তার আয়ু বড়োই সীমিত। মর্তের সুখ নশ্বর। নশ্বরতার তাড়না থেকেই ভাবুক মনের অন্তর্মুখিতা উৎসাহিত হয়ে থাকে! 'সাবিত্রী'র জীবনেও তাই ঘটেছিল।

A glowing orbit was her early term,
Years like gold raiment of the gods that pass;
Her youth sat throned in calm felicity.
But joy cannot endure until the end;
There is a darkness in terrestrial things.
That will not suffer long too glad a note.

সাবিত্রীর আত্মানুভূতির প্রথম স্ফুরণের মধ্যেই দেখা গেছে তার বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বাতিশায়ী প্রেম!

Love in her was wider than the universe.
The whole world could take refuge in her single heart.

প্রেমের এই বিশ্ববরণী শক্তিই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। অজ্ঞানের এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে তার অভিযান। এই সূত্রে সাধারণ প্রাণী বা জীবযান্ত্রের অবস্থা সম্বন্ধে এই কবির কথা এই যে, তারা কোনো অদৃষ্টের পর্দার ওপর চকিতে ভেসে-ওঠা ক্ষণস্থায়ী ছায়ামাত্র;—কামনার সমুদ্রে ভাসমান তুচ্ছ বস্তু,—নশ্বর দৃশ্য-প্রবাহের মধ্যে অর্ধ-সঞ্জীবিত সত্তা। পরিদৃশ্যমান জড় জগৎকে তিনি কারাগার বলে অভিহিত করেছেন। এই কারাগারের পথে পথে আছে কঠোর আইনের প্রহরী। প্রাণ (Life) চলেছে তার অন্তহীন আবিষ্কারের ব্রত উদ্‌যাপনে। মৃত্যু দাঁড়িয়েছে তার গতিরোধ করবার সংকল্প নিয়ে। তবু শত বাধা উত্তীর্ণ হয়ে এগিয়ে যাওয়াই প্রাণের স্বধর্ম। সাবিত্রীর মধ্যে প্রাণধর্মের এই বিশিষ্টতার কথা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের কলমে দেখা দিয়েছিল আমাদের বৈষয়িক ও আত্মিক বিরোধিতার সর্ববোধ্য একটি চিত্রানুষঙ্গ :

> Writing the unfinished story of her soul
> In thoughts and actions graved in Nature's book,
> She accepted not close the luminous page
> Cancel her commerce with eternity,
> Or set a signature of weak assent
> To the brute balance of the world's exchange.

বইখানির প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সর্গে রাজযোগের কথা বলা হয়েছে। অন্যত্র,—'The Ideal of the Karmayogin'-এর মধ্যে যোগের সরল অর্থটি বোঝাতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন—'Yoga is communion with God for knowledge, for love or for work'। বিরাট বিশ্বাত্মার সঙ্গে প্রত্যেকটি ব্যক্তি-প্রাণের অনিবার্য, অনস্বীকার্য যোগের কথা তিনি বার-বার নানাভাবে বলেছেন। অনন্তের মধ্যে মানবচিত্তের গভীর গাহনের জন্যেই যথোচিত অবস্থা সৃষ্টি করে দেন বিধাতা—

> The cosmic worker set his secret hand
>
> To turn this frail mud-engine to heaven-use.

মানুষের অন্তর্নিহিত যে আত্মদৃষ্টির শক্তি অব্যবহৃত থেকে যায়, সেই নিগূঢ় শক্তিরই বিকাশ ঘটিয়ে তোলা চাই। জগতের অজস্র রূপ এবং অন্তহীন প্রাণ, অশেষ ভাবনা এবং সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যেতে-যেতে সাধকের সত্তা অনাস্বাদিতপূর্ব যে গভীরে গিয়ে পৌঁছোয়, সেই স্তরেরই বর্ণনাসূত্রে বলা হয়েছে :

Where world was into a single being rapt
And all was known by the light of identity
And spirit was its own self-evidence.

সমস্ত ভেদাভেদ সেখানে পরম ঐক্যে লীন হয়ে আছে! জ্ঞান সেখানে ভাষা ব্যতিরেকেই সুসার্থক, স্বয়ংসম্পূর্ণ!

এই আত্মদৃষ্টি সার্থক করে তোলবার জন্যেই দুটি ব্যাপারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য,—ওপর থেকে নেমে আসা চাই পরা-জ্ঞান (God-knowledge), —আর মনের ভেতর থেকে কালক্রমে বিশাল মর্ত্য-জ্ঞানের (world-knowledge) অধিকার জেগে ওঠা চাই। জড় এবং আত্মা—দুই-ই সত্য, দুই-ই স্বীকার্য। শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক বিচারে এবং তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে এই দুই সত্যের যৌগপদ্য-বোধ একটি বিশেষ উপস্থাপনা! তিনি শক্তির ক্রমাভিব্যক্তি সম্বন্ধে অন্যত্র যথাক্রমে এই স্তরগুলির কথা বলেছেন—জড় (matter), প্রাণ (life), 'সাইকি' বা লিঙ্গশরীর বা চৈত্যপুরুষ (psyche), মন (mind), অতি-মন (supermind), আনন্দ (bliss), চিৎ (consciousness-force) এবং সৎ (existence)। এদের মধ্যে প্রথম চারটি হোলো নিম্নার্ধ; শেষের চারটি উচ্চার্ধ। নিম্নার্ধের স্তরগুলিরই সূক্ষ্মতর অভিব্যক্তি ঘটেছে ওপরের চার স্তরে। উপস্থিত আলোচনার ১৪৩ পৃষ্ঠায় এবং অন্যত্রও এ প্রসঙ্গ দেখা গেছে। মন এবং অতি-মনের সন্ধিতে তিনি এক গ্রন্থি কল্পনা করে সেই গ্রন্থি মোচনের ঈশ্বর-প্রদত্ত সামর্থ্যের কথা জানিয়ে গেছেন। 'সাবিত্রী' কাব্যের রাজযোগ-প্রসঙ্গ সেই বিশেষ উপলব্ধির স্মারক।

দর্শন-শাস্ত্রের বইয়ে কিংবা নিগূঢ় আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বর্ণনায় এই রকম তর্ক-বিতর্ক অথবা মনোভাব বা উক্তি অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু কাব্যের রাজ্যে এইসব গূঢ় বিশ্বাসের অতিবিস্তার অনুচিত। লেখক যে কবি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উপমার বৈচিত্র্যে, অনুভূতির মৌলিকতায় এ কাব্য খুবই সমৃদ্ধ। তবু সাধারণ কাব্যামোদীর পক্ষে এ-রচনা কতকটা দুস্তরও বটে। শ্রীঅরবিন্দ নিজে যা জানিয়েছেন, সে-কথা খুবই প্রয়োজনীয় এবং উপস্থিত খণ্ডের ৮৮ পৃষ্ঠায় তা ছাপা হয়েছে।

ব্যাপক অর্থে এ রচনাকে মিষ্টিক বলা বোধ হয় অসংগত নয়। ধর্ম-সম্পর্কিত মরমীয়াবাদের সংজ্ঞাসূত্রে W. R. Inge লিখেছিলেন যে, মানুষের

ভাবনা আর অনুভূতির সাহায্যে অনিত্যের মধ্যে নিত্যের এবং নিত্যের মধ্যে অনিত্যের ব্যাপ্তি বা অস্তিত্ব উপলব্ধির প্রয়াস থেকেই মিষ্টিসিজম্ বা গূঢ়ৈষণার উদ্ভব ঘটে থাকে—'the attempt to realise, in thought and feeling the immanence of the temporal in the eternal and of the eternal in the temporal'।

স্থূল, ইন্দ্রিয়-জগতের অতিশায়ী গূঢ় কল্পনা বা অনুভূতির কথা বলতে গেলেই বিশেষ বিশেষ প্রতীক, সংকেত বা রূপকের সাহায্য নিতে হয়। কবি-মনের আইডিয়া বা ভাবের অত্যাবশ্যক শরীর বা বাহন হোলো এই জাতীয় নানাবিধ সংকেত। ইন্‌জ্ এই সূত্রে বলেছিলেন যে, প্রতীক মাত্রেরই (symbols সাধারণ স্বভাবটা এই যে, হয় সেগুলি তাদের নমনীয়তা এবং অর্থব্যঞ্জনা হারিয়ে ক্রমশ বিশেষ কোনো প্রয়োগের স্মৃতিচিহ্নমাত্র হয়ে দাঁড়ায়, নয়তো তারা সেই বিশেষ প্রয়োগের উদ্দেশ্য বা স্বাদ পুরোপুরিই হারিয়ে ফেলে। তখন আবার নতুন পর্ব শুরু হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে গূঢ়ৈষণার মূলে আছে এই ক'টি বিশেষ বিশ্বাস : প্রথমত—আমাদের যেমন শরীরের দৃষ্টি, আত্মারও তেমনি দেহ-নিরপেক্ষ নিজস্ব দৃষ্টিক্ষমতা আছে ; দ্বিতীয়ত—মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্যে সমধর্মিতা না থাকলে ঈশ্বরের উপলব্ধিই যেহেতু অসম্ভব হোতো, অতএব মানুষ ঈশ্বরেরই অংশ ; এবং তৃতীয়ত—মানুষের অন্তঃকরণ শুচি না হলে ঈশ্বরোপলব্ধি সম্ভব হয় না। Sermon on the Mount-এর প্রসিদ্ধ উক্তিটি এই সূত্রে স্মরণ করা হয়েছিল—'Blessed are the pure in heart : for they shall see god।' চতুর্থত মিষ্টিকরা বিশ্বাস করেন যে, ভগবৎ-দর্শনের উপায় বা পথ হোলো প্রেমের সাধনা। বৈষ্ণবেরা এই প্রেমেরই ব্যাখ্যা করে গেছেন :

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।

শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' কাব্যে আধুনিক জগৎ-পরিবেশের অনেক কথাই জায়গা পেয়েছে। কিন্তু সে-সবই আনুষঙ্গিক এবং বহির্জাগতিক ব্যাপার। অন্তর্জগতের পথ-সন্ধান প্রসঙ্গটাই এ-কাব্যের আসল কথা। বর্তমান কালের অন্যতর কল্পনা ভাবনায় আসক্ত অধিকাংশ পাঠকেরই তা যে ভালো লাগবে না, সেকথা তিনি নিজেই বলেছিলেন। কিন্তু রসিক পাঠকের জন্যেই তো দুস্তর পথ!

—প্রথম খণ্ড সমাপ্ত—